সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা ২০০২

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা ২০০২

সম্পাদক
আসাদ বিন হাফিজ

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
১৭১, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি
সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা ২০০২

কভার ডিজাইন
মোবাশ্বির মজুমদার
মুদ্রণ
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
প্রকাশ কাল
রমজানুল মোবারক ১৪২৩
কার্তিক ১৪০৯
নভেম্বর ২০০২
প্রকাশক
ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
১৭১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩২৪১০

মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ

আসাদ বিন হাফিজ
নাসির হেলাল
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
হাসান আলীম
শরীফ আবদুল গোফরান
কামরুল ইসলাম হুমায়ুন
জাকির আবু জাফর
রফিক মোহাম্মদ

www.pathagar.com

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

পরিচালনা পরিষদ–২০০২

উপদেষ্টা	:	ডা. রেদওয়ান উল্লাহ শাহেদী
সভাপতি	:	সাইফুল্লাহ মানছুর
সেক্রেটারী	:	আসাদ বিন হাফিজ
গবেষণা সম্পাদক	:	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
সহকারী	:	সালমান আল আযামী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	শাহ আলম নূর
সহকারী	:	হাসান আখতার
অফিস ও পাঠাগার সম্পাদক	:	নাসির হেলাল
সহকারী	:	তৌহিদুর রহমান
অর্থ সম্পাদক	:	শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সহকারী	:	মশিউর রহমান
প্রচার সম্পাদক	:	আবেদুর রহমান
সহকারী	:	ইয়াকুব বিশ্বাস
প্রকাশনা সম্পাদক	:	মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
দাওয়াতী কার্যক্রম	:	মুহাম্মদ আবদুর রহীম খান

বিভাগীয় দায়িত্বশীল

শিশু কল্যাণ	:	হাসান মুর্তাজা
প্রশিক্ষণ	:	তফাজ্জল হোসেন খান
শিল্পকলা	:	ইব্রাহীম মণ্ডল
শিশু সাহিত্য	:	শরীফ আবদুল গোফরান
যোগাযোগ	:	জাকির আবু জাফর
তথ্য	:	শাহীন হাসনাত

www.pathagar.com

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন কমিটি ২০০২

আহবায়ক

সাইফুল্লাহ মানছুর

সচিব

আসাদ বিন হাফিজ

সদস্য

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

শাহ আলম নূর

নাসির হেলাল

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

আবেদুর রহমান

মো: আবদুর রহীম খান

হাসান আলীম

হাসান মুর্তাজা

গোলাম মোহাম্মদ

ইব্রাহীম মণ্ডল

শরীফ আবদুল গোফরান

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরদার

হাসান আখতার

জাকির আবু জাফর

সালমান আল আযামী

তৌহিদুর রহমান

ইয়াকুব আলী বিশ্বাস

শাহীন হাসনাত

www.pathagar.com

বিভাগীয় কমিটি

অফিস বিভাগ :

আহবায়ক : নাসির হেলাল
সচিব : আবদুর রহীম খান
সদস্য : আহসান হাবীব খান

অর্থ বিভাগ :

আহবায়ক : মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
সচিব : মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরদার
সদস্য : শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
: আবদুর রহীম খান
: হাসান মুর্তাজা
: আবেদুর রহমান
: সালমান আল আযামী
: জাকির আবু জাফর

প্রচার বিভাগ :

আহবায়ক : আবেদুর রহমান
সচিব : শাহীন হাসনাত
সদস্য : শরীফ আবদুল গোফরান
: আবেদুর রহমান
: রফিক মোহাম্মদ
: সিরাজ মুহাম্মদ

অভ্যর্থনা ও শৃংখলা বিভাগ :

আহবায়ক : হাসান মুর্তাজা
সচিব : হাসান আখতার
সদস্য : মশিউর রহমান
: আবেদুর রহমান
: আবদুর রাজ্জাক
: মাহবুব হোসেন

www.pathagar.com

মেহমান বিভাগ :

আহবায়ক : জাকির আবু জাফর
সচিব : আবেদুর রহমান
সদস্য : রফিক মোহাম্মদ
: আবদুল লতিফ
: মমিনুর রহমান

কবিতা পাঠের আসর বিভাগ :

আহবায়ক : গোলাম মোহাম্মদ
সচিব : জাকির আবু জাফর
সদস্য : রফিক মোহাম্মদ
: শাহীন হাসনাত
: ওমর বিশ্বাস

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভাগ :

আহবায়ক : শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সচিব : আবদুর রহীম খান
সদস্য : সালমান আল আযামী
: মশিউর রহমান
: আবদুল্লাহ আল মাসুদ
: সালাহউদ্দীন সুমন
: যুবাইর হোসাইন
: আহসান হাবীব খান

স্মারক বিভাগ :

আহবায়ক : আসাদ বিন হাফিজ
সচিব : নাসির হেলাল
সদস্য : মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
: শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
: গোলাম মোহাম্মদ
: হাসান আলীম
: শরীফ আবদুল গোফরান
: কামরুল ইসলাম হুমায়ুন
: জাকির আবু জাফর
: রফিক মোহাম্মদ

www.pathagar.com

ডেকোরেশন বিভাগ :

আহবায়ক : শরীফ আবদুল গোফরান
সচিব : ইব্রাহীম মণ্ডল
সদস্য : গোলাম মোহাম্মদ
: জাকির আবু জাফর

আপ্যায়ন বিভাগ :

আহবায়ক : তৌহিদুর রহমান
সচিব : ইয়াকুব আলী বিশ্বাস
সদস্য : শওকত আলী
: কামরুজ্জামান
: আবদুল করীম
: রমজান আলী

ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী বিভাগ :

আহবায়ক : ইব্রাহীম মণ্ডল
সচিব : শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
সদস্য : মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
: শরীফ আবদুল গোফরান
: হাসান আখতার
: জাকির আবু জাফর
: ইয়াকুব আলী বিশ্বাস

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

শিল্প-সাহিত্যের চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা সুন্নত

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে যারা ভালবাসেন, কোরান ও সুন্নাহর অনুসরণের কোন বিকল্প তাদের কাছে নেই। আমরা আমাদের জীবনকে আল্লাহর হুকুমের অধীন করে দিয়েছি এবং সুন্নাতের পথ ধরেই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করতে চাই। শিল্প সাহিত্যের ব্যাপারে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের হুকুম কি তা জানা এবং সেই অনুযায়ী আমল করাও আমরা ইসলামের অন্যান্য হুকুম আহকামের মতই প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য বিবেচনা করি। আমরা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ইসলাম কোন একটি বিষয়কে তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রথমে তার নেতিবাচক এবং পরে তার সাথে সঙ্গতি রেখে ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরে। যেমন ইসলাম বলে, 'লা-ইলাহা'– 'কোন ইলাহ নেই', 'ইল্লাল্লাহ'– 'আল্লাহ ছাড়া'। এখানে মূল আলোচ্য বিষয় আল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। এ বাক্যের প্রথম অংশের কোন মূল্য নেই দ্বিতীয় অংশ ছাড়া। দ্বিতীয় অংশটির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রথম অংশটির অবতারণা করা হয়েছে। সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও কোরআন একই বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করেছে। সূরা আশ্‌শোয়ারায় আল্লাহ বলেন, 'এবং কবিদের অনুসরণ করে যারা তারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখ না, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং এমন কথা বলে যা তারা করে না। তবে তাদের কথা আলাদা, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে আর নিপীড়িত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।' (সূরা আশ্‌শোয়ারা, আয়াত ২২৫-২২৭)। এখানে ঈমানদার কবিদের মর্যাদা ও গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য প্রথমে মুশরিক কবিদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পরে বলা হয়েছে যে, তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে আল্লাহর পছন্দনীয় কবি, মানবতার কল্যাণের জন্য যারা কলম ধরে। কোরানিক এ বৈশিষ্ট উপলব্ধি করতে পারলে ইসলাম সাহিত্য চর্চাকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে এবং কবিদের কত উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে তা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো।

আমরা জানি, কবি ও কবিতার জন্য ভূবনখ্যাত এক জনপদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাসূল (সা.)। তাঁর আম্মা আমেনা বিনতে ওয়াহাব ছিলেন যুগধর্মের দাবীতে একজন স্বভাব কবি। রাসূল (সা.)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি যে শোকগাঁথা গেয়ে রোনাজারি করেছিলেন তা ইতিহাসখ্যাত। রাসূল (সা.)-এর জন্মের আগে বিবি আমেনা জগৎখ্যাত এক শিশুর জন্মের বিষয়ে প্রায়ই স্বপ্নাদিষ্ট হতেন। এ ভাবাবেগেও তিনি বেশ কিছু খন্ড কবিতা রচনা করেন। তাঁর পিতৃব্য আবু তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিবেরও কবিখ্যাতি ছিল সুবিদিত। অর্থাৎ তাঁর জন্ম হয়েছিল এক কবি পরিবারে। তাঁর জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি কেবল কবিতা পছন্দ করতেন, কবিদেরকে ভালবাসতেন তাই নয়, কাব্যচর্চার জন্যও ছিল তার কঠোর নির্দেশ ও নসীহত।

সাহাবী শরীদ রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে কোন বাহনের পিঠে সওয়ার ছিলাম। এমন সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'উমাইয়া ইবনে আবী সাল্‌তের কোন কবিতা কি তোমার মনে আছে?' রাসূল (সা.)-এর প্রশ্নের জবাবে শরীদ (রা.) জবাব দেন, 'হ্যাঁ মনে আছে।' তিনি বললেন, 'পড়ো।' আমি একটি কবিতা পড়ে থামলে তিনি বলেন 'আরো পড়ো।' এভাবে আমি তার একশ'টি কবিতা পড়লাম।'

হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, রাসূল (সা.) প্রখ্যাত মহিলা কবি খানসা (রা.)-এর কবিতা বেশ পছন্দ করতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল শ্রুতিমধুর এবং তিনি চার শহীদের জননী ছিলেন। মাঝে মাঝে রাসূল (সা.) তাঁর কবিতা শুনতে চাইতেন এবং হাত ইশারা করে বলতেন, 'খান্‌সা, আরও শোনাও।'

অন্য একটি ঘটনা। রাসূল (সা.) দীর্ঘ সফরে বের হয়েছেন। মরুপথে উটের পিঠে। রাতও হয়েছে বেশ। বললেন, 'হাস্‌সান কোথায়?' হযরত হাস্‌সান (রা.) এগিয়ে এলেন। বললেন, 'ইয়া

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্, (সা.) এই তো আমি।' মহানবী (সা.) বললেন, 'আমাদের কিছু 'হুদা' শুনাও তো।' শুরু করলেন কবি। কবিতা শুনতে শুনতে মহানবী (সা.) মন্তব্য করলেন, 'কবিতাকে এ জন্যই বলা হয় বিদ্যুতের চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং এর আঘাত শেলের আঘাতের চেয়েও ক্ষিপ্র ও ভয়ানক।' এসব ঘটনা প্রমাণ করে কবিতা শোনা সুন্নাত।

রাসূলে করীম (সা.) নিজে সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন এবং কবিতা শুনতে ভালবাসতেন এতটুকুতেই তাঁর কাব্যপ্রেম সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্যদেরও তিনি কবিতার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'যে দুটো মনোরম আভরণে বিশ্বাসীকে আল্লাহ সাজিয়ে থাকেন, কবিতা তার একটি।' আরো বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে কোন কোন কবিতায় রয়েছে প্রকৃত জ্ঞানে কথা।' হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, তিনি সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের কবিতা শেখাও, তাহলে তাদের কথা মিষ্টি ও সুরেলা হবে।' রাসূল (সা.)-এর এ উৎসাহের কারণেই তাঁর ঘনিষ্ট সাহাবী, যাদের কাব্যচর্চার যোগ্যতা ছিল তারা প্রায় সকলেই কাব্যচর্চা করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি হাসসান বিন সাবিত (রা.), লবীদ বিন রাবিয়াহ (রা.), কা'ব ইবনে যোহায়র (রা.), আবদুল্লা বিন রাওয়াহা (রা.), কা'ব বিন মালিক (রা.), আব্বাস বিন মিরদাস (রা.), যুহায়র বিন জুনাব (রা.), সুহায়ম (রা.), আননাবিগা ওরফে আবু লায়লা (রা.) প্রমূখ। মহিলা কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নবীনন্দিনী ফাতেমাতুয যোহরা (রা.), হযরত খানসা (রা.), কবি নাবিখাজাদী (রা.) প্রমূখ। এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজন খলিফার তিনজনই তৎকালীন আরবের প্রসিদ্ধ কবি হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন। এরা হলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.) ও হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)। তৎকালীন আরবে তখনো গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব হয়নি, তাই কবিতাই ছিল সাহিত্যের একমাত্র বাহন। স্বাভাবিকভাবেই কাব্যচর্চায় উৎসাহ দেয়া মানে– সাহিত্য চর্চার জন্য অনুপ্রাণিত করা।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'মহানবী (সা.) বললেন, তোমরা কাফির মুশরিকদের নিন্দা করে কাব্য লড়াইয়ে নেমে পড়। তীরের ফলার চেয়ে তা আরো বেশী আহত করবে তাদের।' মুহাম্মদ ইবনে সীরীন বলেন, 'রাসূলের নির্দেশ পেয়েই তিনজন ইসলামী কবি হাস্সান বিন সাবিত, কা'আব বিন মালিক এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহ্ কাফিরদের বিরুদ্ধে কবিতার লড়াইয়ে নেমে পড়েন।' হাদীসের বর্ণনা থেকে আরো জানা যায়, মহানবী (সা.) আনসারদের সমবেত করে উচ্ছ্বসিত আবেগে বললেন, 'এতো অনস্বীকার্য, আল্লাহর রাসূলকে হেফাযত করার জন্যে অস্ত্র হাতে নিয়ে তোমরা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে কাজ করছো, কলমের ভাষা দিয়ে তাঁকে আজ হেফাযত করার সময় এসে গেছে। কে আছো তীক্ষ্ণ মসীর আঁচড় নিয়ে এগিয়ে আসবে?'

অন্য হাদীসে এসেছে, 'যারা হাতিয়ারের দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে, কথার দ্বারা (অর্থাৎ কবিতার দ্বারা) আল্লাহর সাহায্য করতে কে তাদের বাঁধা দিয়েছে?'

কা'আব ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, 'রাসূল (সা.) আমাদের নির্দেশ দিলেন, যাও, তোমরা মুশরিকদের প্রতিপক্ষে কবিতার লড়াইয়ে লেগে যাও। কারণ মুমিন জিহাদ করে জান দিয়ে, মাল দিয়ে। মুহাম্মদের আত্মা যাঁর হাতের মুঠোয় তাঁর শপথ! তোমাদের কবিতা, তীরের ফলা হয়ে তাদের কল্জে ঝাঁঝরা করে দেবে।'

এভাবে রাসূল (সা.) কাব্যকলাকে শিল্পকলার সীমাবদ্ধ গণ্ডি থেকে বের করে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন, হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন যুদ্ধ ও জিহাদের। আর এভাবেই তাঁর নেতৃত্বে নব উত্থিত সমাজ বিপ্লবে সাহাবী কবিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাঁদের মধ্যে এক নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন মহানবী (সা.)।

রাসূলে করীম (সা.) শুধু কবি ও কবিতার পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, তিনি কবি ও কবিতাকে উৎসাহিত করার জন্যে বিভিন্ন সময় কবিতার ওপর আলোকপাত করেছেন, মন্তব্য রেখেছেন।

www.pathagar.com

কবি সুহায়ম-এর একটি কবিতা শুনে মহানবী (সা.) বললেন, 'বেশ তো! ঠিক কথাই বলেছে কবি। এ ধরনের কথায় আল্লাহতা'লা খুশী হন। আর যাকে আল্লাহ্ সোজা পথে রেখেছেন এবং নৈকট্য দিয়েছেন সে জান্নাত পাবে।'

একবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) রাসূল করীম (সা.)-এর সামনে যুহায়র বিন জুনাব-এর একটি কবিতা পড়ে শোনালে রাসূল (সা.) বললেন, 'আয়েশা, কবির কথা কিন্তু ঠিক। যে মানুষের সুকৃতি সইতে পারে না, আল্লাহর সুকৃতি গাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।' সমসাময়িক ঈমানদার কবিদের কবিতা নিয়ে রাসূল (সা.)-এর ঔৎসুক্য ছিল অতুলনীয়। একবার মহানবী (সা.) হযরত হাস্সান (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আবু বকরকে নিয়ে কোন কবিতা কি এ পর্যন্ত লিখেছো?' হযরত হাস্সান (রাঃ) জবাব দিলেন, হাঁ লিখেছি।' রাসূল (সা.) বক্তৃতা দেবার সময় সাহাবী কবিদের কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন। সাবা মুয়াল্লাকার কবি লবীদ ইবনে রাবিআহ্'র কবিতার দু'টি চরণ এভাবেই হাদীস শাস্ত্রের অংশ হিসেবে অমর হয়ে আছেঃ

'আলা কুল্লু শাইয়্যিন মা খালাল্লাহ্ বাতেনু, / অকুল্লু নায়িমিন লা মহালাতা যাইলু।' অর্থাৎ

'সাবধান হও, আল্লাহ্ ছাড়া আর সবই মিথ্যা এবং / সব নিয়ামতই একদিন অবলুপ্ত হবে, / শুধু অবলুপ্ত হবে না জান্নাতের অমূল্য সম্ভার।

হাদীস শরীফের বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, কবিদেরকে তিনি খেতাব প্রদান করতেন। কবি হাসসান বিন সাবিত (রা.)কে সভাকবির মর্যাদা দিয়ে তাঁকে 'শায়েরুর রাসূল' বা 'রাসূলের কবি' খেতাবে ভূষিত করেছিলেন।

ঈমানদার কবিরা যেন উত্তম কবিতা রচনা করতে পারেন সেজন্য মহানবী (সা.) কবিদের নাম ধরে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন। তিনি এ দোয়া করতেন উচ্চস্বরে, যেন অন্যান্য সাহাবীরাও শুনতে পান। অধিকাংশ সময় তিনি এ দোয়া করতেন কবিদের সম্মুখে, যেন কবিরা অধিক আস্থাশীল, দায়িত্ববান এবং সৃজনশীলতায় আরো যত্নবান হওয়ার প্রেরণা পায়। কবি হাস্সান বিন সাবিত কবিতা আবৃত্তি শুরু করলে রাসূলে খোদা (সা.) তাঁর জন্যে এ বলে দোয়া করতেন: 'হে আল্লাহ, রুহুল কুদ্দুসকে দিয়ে তুমি তাকে সাহায্য করো।' তিনি কবিদের উপহার এবং উপঢৌকন দিতেন। একবার মিশরের রোমক সম্রাট রাসূলের শানে দুই অপরূপাকে উপঢৌকন পাঠালো তৎকালীন রেওয়াজ অনুসারে। রাসূল (সা.) শিরী নামে তাদের একজনকে উপহার দিয়েছিলেন কবি হাস্সান বিন সাবিতকে। কবি কা'ব ইবনে যুহায়র-এর বিখ্যাত কবিতা 'বা'নাত সুআদ' শুনে মহানবী (সা.) খুশি হয়ে গায়ের চাদর খুলে কবিকে তা পরিয়ে দিয়েছিলেন নিজ হাতে।

হুনায়নের যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমত ভাগ করার সময় আব্বাস বিন মিরদাস (রা.) কবিতার মাধ্যমে রাসূলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মহানবী (সা.) বললেন, 'ওরে, কেউ কি কবির মুখ বন্ধ করতে পার?' এ কথা শুনে হযরত আবুবকর (রা.) তাকে বেছে বেছে একশটি উট তুলে দিলেন তাঁর হাতে।

ভাবের রাজ্যে বিচরণের কারণে স্বাভাবিকভাবেই লেখক ও কবিরা বিষয়বুদ্ধিতে থাকে অপটু। আবার আত্মসম্মানবোধ টনটনে থাকার কারণে কারো কাছে কিছু চাইতেও পারে না। ফলে দেখা যায় সভ্যতার বাগান বানায় যে কবিরা, মানুষের মনে সুখের প্লাবন আনে যে কবিরা, তাদের ভাগ্যে জোটে দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণাকাতর জীবন। এ দুর্দশা লাঘবে মহানবী (সা.) যেভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন তা অতুলনীয়। তিনি বলেছেন, 'কবিদের আর্থিক সহায়তা করা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সমতুল্য।' সন্তানের কাছে পিতা-মাতার যে মূল্য, সভ্যতার কাছে কবির মূল্য তেমনি। পিতা-মাতার কাছে ঋণী সন্তান, কবির কাছে ঋণী জাতি। এ বাণীর মাধ্যমে মহানবী চেয়েছেন জাতি যেন সে ঋণ পরিশোধ করে।

তিনি কবিদের যে অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন তা ছিল উপমা-রহিত। বিস্ময়কর হলেও সত্য, মসজিদে নববীর ভেতরে শুধুমাত্র কবিতা পাঠ করার জন্য মহানবী (সা.) একটি আলাদা

www.pathagar.com

স্থায়ী মিম্বার (মঞ্চ) তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে কবি হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.) নিয়মিত কবিতা পাঠ করে শোনাতেন সাহাবীদের।

কবিদেরকে এভাবে সম্মানিত করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। কেবলমাত্র মহানবীই পেরেছিলেন মসজিদে নববীতে নিয়মিত কবিতার আসর বসাতে, খোদ নবীর ঘরে কবিতা পাঠের জন্য আলাদা মঞ্চ তৈরী করে দিতে। নবীর ঘর মসজিদে-নববীতে খোদ মহানবী (সা.) কর্তৃক কেবলমাত্র কবিতা পাঠের জন্য নির্ধারিত একটি একক ও আলাদা মঞ্চ স্থাপন কবিদের জন্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও পুরস্কার। পৃথিবীর মানুষের পক্ষে কবিদের জন্য এরচে অধিক কোন সম্মান প্রদর্শন কোন কালেই সম্ভব নয়।

কাব্যচর্চাই কবিদের জন্য জিহাদ। জিহাদে জয় লাভের পর মুজাহিদগণের মধ্যে মালে গনীমত ভাগ করে দেয়া হতো। মুজাহিদগণ ছাড়া এ মালে গনীমত আর কেউ পেতেন না। যুদ্ধে অংশ না নিলে যদি গণীমতের মালের অংশ পাওয়া না যায় তবে কবিরা মালে-গনীমত পাবেন কেমন করে? আবার কাব্যচর্চা যদি জিহাদ হয় তবে কবিরা মালে-গনীমত পাবেন না কেন? সাহাবীদের মধ্যে এ প্রশ্ন দেখা দিলে মহানবী (সা.) কবিদেরকে মালে গনীমতের হিস্যা প্রদানের নির্দেশ দেন। এভাবেই কাব্যচর্চা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে কবিরা যুদ্ধে অংশ না নিয়েও রাসূলের (সা.) নির্দেশে গণীমতের মালের অংশ পেতেন।

মহানবী (সা.) অনেককেই জীবিতাবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। কবিতা লেখার পুরস্কার হিসাবে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন হাসসান বিন সাবিত (রা.)। হাসসান বিন সাবিতের কবিতা শুনে রাসূল (সা.) ঘোষণা দিয়েছিলেনঃ 'হে হাস্‌সান, আল্লাহর কাছ থেকে তোমার জন্য পুরস্কার রয়েছে জান্নাত।'

আজকে যারা ইসলামী সাহিত্যের চর্চা করছেন তাদের এ কথা গভীরভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, সাহিত্য চর্চা কোন তুচ্ছ কাজ নয়, বরং সভ্যতা বিনির্মানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ তাদের ওপর ন্যস্ত করেছেন। এ কাজের জন্য যে মেধা ও যোগ্যতা দরকার আল্লাহই তা তাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া এ বিশেষ নেয়ামতের সদ্ব্যবহার না হলে তার জন্য তাকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। যেখানে আল্লাহ পবিত্র কোরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ সূরার নামকরণ আশ্‌শোয়ারা 'কবিরা' রেখে কবিদেরকে চূড়ান্ত সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন আর রাসূল কাব্যচর্চার কারণে কবিকে দিয়েছেন বেহেশতের সুসংবাদ, সেখানে কাব্যচর্চা তথা সাহিত্য সাধনাকে গৌণ ভাবার কোন অবকাশ নেই।

মহানবী (সা.)ই আমাদের জীবনাদর্শ। তিনি যা করেছেন, করতে বলেছেন বা করার জন্য সম্মতি দিয়েছেন তা-ই সুন্নাহ। সাহিত্যের ব্যাপারেও একই কথা। তিনি এ ব্যাপারে যা করেছেন বা করতে বলেছেন তার যথাযথ অনুসরণ করার মধ্যেই আমাদের সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত। আমরা যারা আজ কাব্যচর্চা করছি, রাসূলের এসব কথা ও নির্দেশই আমাদের পথ প্রদর্শক। মিল্লাতে ইসলামিয়া তথা সকল মুসলমানের কাছে আমাদের অনুরোধ, আসুন, সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় রাসূল (সা.) যে গুরুত্বারোপ করেছেন, আমরা তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করি। কবি ও কবিতাকে ভালবাসার এবং পৃষ্ঠপোষকতা করার যে সুন্নাত তিনি রেখে গেছেন আসুন তার অনুসরণ করি। খণ্ডিত ইসলাম নয়, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মধ্যেই মানবতার ইহ ও পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ নির্ভরশীল, এ কথা আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝবো, ততই সৌভাগ্য নিকটবর্তী হবে আমাদের। আল্লাহ সবাইকে এ বুঝ ও সমঝ দান করুন, আমীন।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

চয়ন ও অনুবাদ কবিতা	**১৪-১৯**
সুরা কদর / কাজী নজরুল ইসলাম	১৫
শবে-বরাত প্রসঙ্গে / ফররুখ আহমদ	১৬
কোরান কাব্য / মুহম্মদ নূরুল হুদা	১৭
অপ্রকাশিত রচনা	**২০-৩৫**
ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ : ঈমানই মুসলমানের বিজয়ের জামিন মুনিরউদ্দীন ইউসুফ	২১
প্রবন্ধ	**৩৬-৮১**
নবীপ্রেম ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ / মাওলানা মুহিউদ্দীন খান	৩৭
হাদীসে রাসূল (সা.)-এর আলোকে বিজ্ঞান / ড: এম. শমশের আলী	৪৩
ইসলামের দারিদ্র বিমোচন ও জনগণের আস্থা / শাহ আবদুল হান্নান	৪৭
ইসলামী শিল্পকলা ও বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা / ড. আবদুস সাত্তার	৫৫
অমুসলিমদের দৃষ্টিতে হযরত মোহাম্মদ (সা.) / সৈয়দ আশরাফ আলী	৬২
বিশ্বনবী (সা.) প্রসঙ্গ কাব্য সাহিত্য / এম. এ, রশীদ চৌধুরী	৬৯
কবিতা	**৮২-৯৭**
তুমি যেই এলে / সৈয়দ শামসুল হুদা	৮৩
তারা কি কেউ বন্ধু স্বজন / আবদুল মুকীত চৌধুরী	৮৪
শুভাশিস নেবো / মসউদ-উশ-শহীদ	৮৫
সোনালী শাহজাদা / আব্দুল হালীম খাঁ	৮৬
জাবালে নূরে দাঁড়িয়ে / মাহবুবুল হক	৮৭
শতাব্দীর এ কেমন অভিযাত্রা / জয়নুল আবেদীন আজাদ	৮৯
নবীকে সালাম / জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ	৯০
শাশ্বত কথা ও বাণী / সুজাউদ্দিন কায়সার	৯১
জগতের সব উজ্জ্বলতার সমষ্টি / দেলওয়ার বিন রশিদ	৯২
আমার ভালবাসা / আশরাফ আল দীন	৯৩
নবীর দুলালী তিনি / সোলায়মান আহসান	৯৪
রাসূলের (সা.) কাছে পত্র / মোশাররফ হোসেন খান	৯৫
কাওসার তাঁর হাতে / গোলাম মোহাম্মদ	৯৭
গল্প	**৯৮-১০২**
একটি হারের বিনিময়ে / হাসান আলীম	৯৯
প্রবন্ধ	**১০৩-১৭১**
মহানবীর আদর্শ ও নন্দিত জীবনের অপরিহার্য দিক নির্দেশনা মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন	১০৪
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অর্থনৈতিক আদর্শ / মোহাম্মদ আবদুল মান্নান	১১৭

www.pathagar.com

রাসূলে খোদার মিশন, আমাদের বিশ্বাস ও বিজ্ঞাননির্ভর আজকের প্রেক্ষিত
মাসুদ মজুমদার ১২৩
ইসলামী সমাজ গঠন : প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন
আবু তাহের মোহাম্মদ সালেহ ১২৭
আদর্শ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) / ইকবাল কবীর মোহন ১৩২
ঢাকার স্থান নামে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রভাব
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ১৪৪
সীরাত চর্চায় ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র / নাসির হেলাল ১৬০
কবিতা **১৭৫-১৯৫**
এক যে তারার ফুল / আহমদ মতিউর রহমান ১৭৫
তোমায় সালাম / শরীফ আবদুল গোফরান ১৭৬
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ / আবদুল কুদ্দুস ফরিদী ১৭৭
ওয়েনিকা বিশ্বের জন্য / জামাল উদ্দিন বারী ১৭৮
হে রসূল (সা.) / আহমদ সাকী ১৭৯
একজন মুহম্মদই পারেন / রেজা রহমান ১৮০
তোমার জন্যেই / আবুল হোসাইন মাহমুদ ১৮১
দরখাস্ত / আমিন আল আসাদ ১৮২
আমারও তৃষ্ণা অনেক / ওমর বিশ্বাস ১৮৪
গ্লানির গজল / শাহীন হাসনাত ১৮৫
হকের সুরভি / জাকির আবু জাফর ১৮৬
দরূদ সালাম / রফিক মুহাম্মদ ১৮৭
তোমার দেখানো পথে / নূরুজ্জামান ফিরোজ ১৮৮
উঠলো যখন হেসে / জামান সৈয়দী ১৮৮
বরফ বিক্রেতার ডাক / নাঈম মাহমুদ ১৯০
একটি দরোজা খুল্লেই / সৈয়দ সাইফুল্লাহ্ শিহাব ১৯০
কি উপমায় ডাকবো তোমায় / মাহফুজুর রহমান চৌধুরী ১৯১
আঁধারে আলো / সিরাজ মুহাম্মদ ১৯২
প্রিয়তম রাসূল / মুহাম্মদ ইসমাঈল ১৯২
হেরার পথের সন্ধান / মনসুর আজিজ ১৯৩
সুরভি দুপুর / মঈন বিন শফীউদ্দিন ১৯৩
স্বপ্নের খোঁজে / গোলাম মোস্তফা খান ১৯৪
চৌদ্দশ বছর / আফসার নিজাম উদ্দিন ১৯৫
নাত-এ-রাসূল (সা.) / ইয়াকুব বিশ্বাস ১৯৬
হে সুগন্ধি গোলাপ / স্নিগ্ধা বিশ্বাস ১৯৬
তুমি এলে / শাহীদা আলম নূর ১৯৭
প্রতিবেদন **১৯৮-২২৪**
ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের বার্ষিক প্রতিবেদন / শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ১৯৮
৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর রিপোর্ট / মোহাম্মদ আবদুর রহীম ২১৮

www.pathagar.com

শুরু করি

কাজী নজরুল ইসলাম

শুরু করি নাম আল্লাহর
আদি অন্তহীন যিনি দয়া করুণার।

করিয়াছি অবতীর্ণ কোরান পুণ্য 'শবে কদরে',
জানবে কিসে শবে কদর কার কারে? ধরা 'পরে
হাজার মাসের চেয়েও বেশী কদর এই যে নিশীথের,
এই সে রাতে ফেরেশতা আর জিবরাইল আলমের
করতে সরঞ্জাম সকলি নেমে আসে ধরণী
উষার উদয় তক্ থাকে এই শান্ত পূত রজনী।

www.pathagar.com

শবে-বরাত প্রসঙ্গে

ফররুখ আহমদ

বরাতের এই রাতে (যে নিশীথে ভাগ্য নির্ধারণ
সূক্ষ্মতম অণু হ'তে সুবিশাল গ্রহ-নক্ষত্রের)
খুলিতে চেয়েছি আমি, খোলেনি যে গ্রন্থি রহস্যের;
আরো জটিলতা এসে ঘিরেছে সে অটুট বন্ধন।
পৌত্তলিক অন্ধকারে কত বার কত ভ্রান্ত মন
বুঝিতে চেয়েছে জানি একভাবে রহস্য কালের,
বোঝেনি,– নোঙ্গরহীন কিশতী সেই অবাধ্য হালের
হয়েছে তমিস্রায় লক্ষ্যহীন পাখীর মতন।

সুদৃঢ় প্রত্যয়ে শুধু জেগে আছে সে মর্দে মোমিন
–বিশ্বাসের বৃন্তে মন দীপ্যমান, কর্মস্রষ্টা,– যার
চিরন্তন ঊর্ধ্বগতি আলোকের পথে অন্তহীন
(খুলে যায় যে সহজে সৌভাগ্যের, আকাশের দ্বার,
দূর্ভাগ্যের অন্ধকার ছিঁড়ে আনে প্রভাত রংগিন)
কামিল ইনসান সেই পৃথিবীতে খলিফা আল্লাহর।

www.pathagar.com

কোরান কাব্য

মুহম্মদ নূরুল হুদা

বিসমিল্লাহ

দূর হও যত শয়তান আর অরি
দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করি।

কলেমা-১

উপাস্য নাই আল্লাহ ছাড়া, নাইরে কোনো কূল
মুহাম্মদ আল্লাহতালার প্রেরিত রাসূল।

কলেমা-২

মাবুদ নাই আল্লাহ ছাড়া, সাক্ষ্য দিলাম
শরীক নাই আল্লাহতালার, সাক্ষ্য দিলাম
আল্লাহ ছাড়া উপায় নাই, নাইরে কোনো কূল
মুহাম্মদ আল্লাহতালার প্রেরিত রাসূল।

কলেমা-৩

হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া আর উপাস্য নাই
তুমি এক ও অদ্বিতীয়, তোমার সমকক্ষ নাই
মুহাম্মদ ইমাম সকল মুত্তাকীর
রাসূল তিনি দু'জাহানের পালনকারীর।

কলেমা-৪

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই
হে জ্যোতির্ময়, অশেষ তোমার রোশনাই
যাকে খুশি তাকে দেখাও আলোর পথ
আমার নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, শেষ নবী মুহাম্মদ।

www.pathagar.com

কলেমা-৫

আমার ঈমান তোমার প্রতি– হে আল্লাহ
নামে-গুণে সবখানেই বিরাজমান– হে আল্লাহ
তোমার হুকুম তোমার আহকাম– হে আল্লাহ
মেনে নিলাম তোমার বিধান– হে আল্লাহ।

কলেমা-৬

আমার ঈমান তোমার প্রতি– হে আল্লাহ
তোমার রাসূল, তোমার কিতাব, ফেরেশতায়
কেয়ামত আর তকদীরের মালিক তুমি– হে আল্লাহ
মৃত্যু শেষে সৃষ্টি তোমার জাগবে আবার– হে আল্লাহ
স্রষ্টা তুমি সৃষ্টি তোমার ঈমান আমার– হে আল্লাহ।

সুরা কাওসার

নিশ্চয়ই দিয়েছি আমি তোমাকে মঙ্গল ও প্রাচুর্যময় কাওসার;
বিনিময়ে নামাজ পড়ো, কুরবানী করো, নামে এক আল্লাহর
মনে রেখো, লেজকাটা তোমার শত্রুর নাই কোন উত্তরাধিকার।

সুরা মাউন

তুমি কি দেখেছো তাকে, যে মানে না কর্ম ধর্ম দ্বীন?
রুঢ়ভাবে যে তাড়ায় অনাথ এতীম?
উৎসাহ নাই যার আপ্যায়নে– আত্মীয় মিসকীন?

আফসোস তাদের জন্য, যারা মনোযোগ দেয় না নামাজে,
যারা লোক দেখানোর জন্য থাকে সৎ কাজে;
এবং বিরত যারা ধার দিতে, যে সামগ্রী লাগে গৃহ কাজে।

www.pathagar.com

সুরা কুরায়িশ

শীতে-গ্রীষ্মে কোরেশরা করে থাকে বিদেশ সফর,
ভ্রমণে আসক্ত তারা, ঘরদোর সম্পর্কে প্রায় বেখবর;
অনন্তর তারা যেন উপাসনা করে এই ঘরের প্রভুর,
যাঁর দান পেয়ে তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা করে থাকে দূর;
তিনিই অভয়দাতা, দমন করেন তিনি সব সুরাসুর।

সুরা ফীল

তুমি কি দেখোনি হস্তীবাহিনীর কী দশা করেছেন মাবুদ?
তাদের কৌশল সব তিনিই কি করেননি নাস্তানাবুদ?
তাদের বিরুদ্ধে তিনি পাঠালেন ঝাঁক ঝাঁক পাখি আবাবীল
পাখির কঙ্করে ভক্ষিত তৃণ-ভূষি হয়ে যায় হাতির মিছিল।

সুরা আছর

নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত সকল মানুষ, এই জানি কালের শপথ
তবে তারা নয়, যাঁরা আনে ঈমান, কর্ম করে সৎ-মহৎ।
চলে সত্যের পথে আর ধৈর্য ধারনের রাখে হিম্মত।

www.pathagar.com

অপ্রকাশিত রচনা

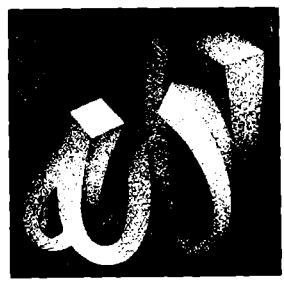

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ :
ঈমানই মুসলমানের বিজয়ের জামিন

মুনিরউদ্দীন ইউসুফ

[মরহুম কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফ (১৯১৯-১৯৮৭) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একখানি জীবনীগ্রন্থ ষাটের দশকের গোড়ার দিকে রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। সে কাজে অনেকটা অগ্রসর হলে 'ফেরদৌসীর শাহনামা' মহাকাব্যের অনুবাদসহ অন্যান্য নানাধর্মী কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণে আলোচ্য জীবনী লেখায় দীর্ঘদিনের বিরতি ঘটে। যদিও আশির দশকে তিনি সহজ ভাষায় 'ছোটদের ইসলাম পরিচয়' ও 'ছোটদের রসূল চরিত' দু'টো কিশোর পাঠ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কাজ সমাপ্ত করেন। যথারীতি গ্রন্থ দু'টো প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশনার একাধিক সংস্করণ ইতোমধ্যেই বাজারজাত হয়েছে।
তবে কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফ রচিত আলোচ্য 'ইসলাম ও মুহম্মদ (সা.)' নামক জীবনী গ্রন্থটি তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। 'আবু সুফিয়ানের মদীনা যাত্রা' উপশিরোনাম পর্যন্ত কবি ইউসুফ লিখে রেখে গেছেন। সেখান থেকে '**ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ : ঈমানই মুসলমানের বিজয়ের জামিন**' অংশটি সংকলিত হলো। লেখাটি আমরা পেয়েছি কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফের পুত্র সাঈদ আহমদ আনীসের সৌজন্যে। – সম্পাদক]

মানব-চরিত্রের নিগূঢ় প্রবণতার সঙ্গে সমন্বিত করে মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদায় উন্নীত করে নেয়াই কোরআনের আসল লক্ষ্য এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন কোরআনের নির্দেশকে জড়িয়ে ধরেই চিরন্তন হয়ে উঠেছে। এই জীবন হয়ে উঠেছে সকল যুগের সকল দেশের সকল মানুষের অনুসরণীয় সুন্দর আদর্শ। কোরআনের নির্দেশ ও মুহম্মদ (সা.)-এর জীবন আল্লাহরই প্রকৃতির মতো বিকাশশীল। বিশ্ব-প্রকৃতি, কোরআন ও মুহম্মদ (সা.)-এর জীবন যেন একই সূত্রে গ্রথিত। বিশ্ব-প্রকৃতি ও মুহম্মদ (সা.)-এর জীবন বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা যত বেশি সম্ভব আয়ত্ত করা যায় এবং কোরআন মানুষকে বিজ্ঞানের সীমার বাইরেও এমন কিছু দেয়, যা তাকে আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা দান করতে পারে। এই কোরআনই মানুষকে ক্রমে ক্রমে পশুর স্তর থেকে টেনে এনে উপরে তুলতে থাকে, যার সর্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ মুহম্মদ (সা.)-কে আশ্রয় করে বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

যে সমাজ তৈরির কাজ রাসূল (সা.) শুরু করেছেন, তার ভিত্তি রচনার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন, এমন সুশৃঙ্খল সামাজিক বিধি, যা সমাজকে পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে ধরে রাখে। সকল ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও তখন তার সম্পূর্ণতা কিংবা অংশবিশেষ যেন অটুট থেকে যেতে পারে।

তাই, প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরীতেই নামাজ, রোজা ও জাকাত এবং নর-নারীর সম্পর্কে মৌল বিধানগুলো অবতীর্ণ হয়ে যায়। সমাজ জানতে পারে, পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন হলেও, দু'য়ে মিলেই সমাজ। উভয়েরই অধিকার সমান। এই সমান অধিকারের মনোভাবের উপরই শান্তিপূর্ণ মানব-সংগঠন তৈরি হতে পারে। বৈষম্যের সমর্থক দাস প্রথা ও সুদ, শক্তি ও মেধায় মননে সমান না হওয়ার অসুবিধা, উচ্ছৃঙ্খলতা রোধ করতে হলে ব্যভিচার ও স্বার্থপরতা, মদ ও জুয়া প্রভৃতি বিষয়গুলো মানুষের সমাজে এত দীর্ঘদিনের এবং এদের শিকড় মানব-মনের এত গভীরে প্রোথিত যে, সেগুলো উৎপাটিত করে সহনশীলতার স্তর পর্যন্ত উন্নীত করা সহজ কাজ নয়। অথচ সেগুলো উচ্ছেদের প্রচেষ্টা শান্তিপূর্ণ সমাজ তৈরির প্রথম শর্ত। কোরআন তাই এসবগুলোর ব্যাপারে বিকাশের রীতিকেই গ্রহণ করেছে।

দাস-প্রথা উচ্ছেদের প্রথম স্তর হিসাবে বলা হয়েছে, তোমরা তাদের (দাস-দাসীদের) সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান চাও। (সূরা আন-নূর, আয়াত নং-৩৩)।

সুদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ এবং সুদকে অবৈধ করেছেন। (সূরা বাকারা, আয়াত নং-২৭৫)।

জাকাতের বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে, তোমরা সালাত কায়েম কর এবং জাকাত দাও। (সূরা বাকারা, ৪৩ আয়াত)।

ব্যভিচার সম্পর্কে বলা হয়েছে, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত নং-৩২)।

মদ ও জুয়া সম্পর্কেও প্রথম তাদের দোষ-গুণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও এ উভয়টির মধ্যে রয়েছে মহাবিপদ এবং উপকারিতাও রয়েছে। তবে এগুলোর পাপ উপকার থেকে অধিক গুরুতর। (সূরা বাকারা, আয়াত-২১৯)।

মদীনায় সমাজ তৈরির শুরুতেই এসব মৌলিক নির্দেশের সূত্রপাত হয়ে গেছে এবং এসব সামাজিক বিধি-বিধানের প্রসঙ্গ ধরেই মদীনার ইহুদী ও পৌত্তলিকদের সঙ্গে রাসূল (সা.)-এর বিরোধেরও শুরু হয়। এমন কি মুনাফেক বা কপট-বিশ্বাসীরাও বুঝতে পারে যে, মুহম্মদ (সা.) এসব বিষয়ে কখনও কোন আপোষ করবেন না। সুতরাং, কোরআনের 'এসিড-টেস্টের' মাধ্যমেই সত্য ও অসত্য আলো ও অন্ধকার পরস্পর পৃথক হয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। কোরআনের 'ফুরকান' নামও এ

www.pathagar.com

কারণেই। ফুরকান অর্থ সদসৎ ও আলো-আঁধারের পৃথককারী। কোরআনের এ গুণ চিরন্তন।

ওদিকে মক্কার কুরাইশরা মদীনা আক্রমণে উদ্যত আর এদিকে ইহুদী-পৌত্তলিক ও মুনাফিকরা তাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত, এমন অবস্থায় মুসলমানদের সতর্ক থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

প্রথমত, কুরাইশরা যাতে কুর্জের মতো অতর্কিতে মুসলমানদেরকে আবার আক্রমণ করে না বসতে পারে, তজ্জন্য কুরাইশদের সন্দেহজনক চলাফেরা কিংবা অস্ত্র সংগ্রহের আয়োজনের উপর নজর রাখতে হবে। সে জন্যে রাসূলুল্লাহ আবদুল্লাহ বিন জওশের নেতৃত্বে এক ভ্রাম্যমান গুপ্তচর দল গঠন করে তাঁদেরকে মক্কার পথে যাত্রা করতে বলেন। এই দলে ছিলেন আটজন মুসলমান ও চারটি মাত্র উট।

রাসূল (সা.) আবদুল্লাহকে একখানা পত্র দিয়ে বললেন, দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর এই পত্র খুলে দেখো ও তাতে যে নির্দেশ রয়েছে, সে অনুযায়ী কাজ করো। তবে মনে রেখো, সে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার জন্য সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে বাধ্য করবে না।

রাসূল (সা.)-এর উপদেশ মতো মক্কার পথে দু'দিন চলার পর আবদুল্লাহ পত্র খুলে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে, 'পত্র পাঠের পর মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হবে এবং গোপনে কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করে আমাকে সে সংবাদ জানাতে থাকবে।'

নাখলা মক্কার সন্নিকটে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এক প্রান্তর। মদীনা থেকে দূরে শত্রু কেন্দ্রের এতো নিকটবর্তী এক স্থানে উপস্থিত হয়ে শত্রুর গতিবিধির উপর নজর রাখা ও তার সংবাদ রাসূল (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করা যে কতো কঠিন এক দায়িত্ব, তা অনুমান করা দু:সাধ্য নয়। কিন্তু কঠিন দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা নিয়েই রাসূল (সা.)-এর অনুসারীদের তৈরি হতে হবে। সম্মিলিতভাবে সমাজ গঠন করে শত্রুর মোকাবেলার দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে তাই ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব পালনের ঝুঁকিও মুসলমানকে নিতে হবে। সমাজ তো ব্যক্তিরই দায়িত্বপূর্ণ আচরণের কেন্দ্র। আল্লাহর রাসূল আবদুল্লাহ বিন জাহাশকে সেই দায়িত্ব পালনের পরীক্ষা দেয়ার জন্যই নিয়োজিত করলেন।

আবদুল্লাহ পত্র পড়ে সঙ্গীদের বললেন, 'ভাইসব, জোর নেই, জবরদস্তি নেই, রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ এই। ইসলামের জন্যে, স্বজাতির কল্যাণের জন্যে এই-ই আমাদের কর্তব্য। আমি এই কর্তব্য পালনের জন্য এগিয়ে চললাম। তোমাদের যদি ইচ্ছা হয়, দেশে ফিরে যাও। আর যদি শহীদের গৌরবজনক মৃত্যু কাম্য হয় তবে আমার সঙ্গে এসো।' বলা বাহুল্য, সঙ্গীগণও উৎসাহিত হয়ে আবদুল্লাহর

www.pathagar.com

অনুসরণ করলেন। পথে সা'আদ বিন আবি ওক্কাস ও ওৎবার উট হারিয়ে গেলে তাঁরা উটের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। আবদুল্লাহ অবশিষ্ট ছয় সঙ্গীকে নিয়ে এগিয়ে চললেন নাখলার দিকে।

নাখলায় পৌঁছে ওঁরা দেখতে পেলেন, কুরাইশের এক ক্ষুদ্র বণিকদল এগিয়ে আসছে। এই দলে রয়েছে আমার বিন হাজরামী, হাকাম বিন কাইসান, ওসমান বিন আবদুল্লাহ প্রভৃতি কুরাইশ। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই সময় আবদুল্লাহর সঙ্গী ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ নামক একজন মুসলমান হাজরামীকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লেন। এতে হাজরামী নিহত হলে অপর দু'জন কুরাইশ বণিককে বন্ধী করে কাফেলার সমস্ত বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে তাঁরা মদীনায় ফিরে এলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'জন বন্দী ও বাণিজ্য সম্ভার দেখে ও ঘটনার সব কথা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি আবদুল্লাহকে ভর্ৎসনা করে বললেন, আমি তো তোমাদেরকে যুদ্ধ অথবা লুণ্ঠন করতে পাঠাইনি। তোমরা এ অন্যায় আচরণ কেন করলে? উপস্থিত সাহাবাগণও তাদেরকে তিরস্কার করতে লাগলেন। সব শুনে আবদুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীগণের অনুতাপের অবধি রইলো না। তাঁদের মনে হতে লাগলো যে, এ পাপের জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবেন।

উট অন্বেষণরত দু'জন মুসলমানকে কুরাইশরা বন্দী করে থাকবে, এই আশংকায় বন্দী দু'জনকে তখনই মুক্তি দেয়া হয়নি। যে দু'জন কুরাইশকে বন্দী করে মদীনায় আনা হয়েছে, পারস্পরিক বন্দী বিনিময়ের ভিত্তিতেই তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। কিন্তু উট সন্ধানরত দু'জন মুসলমান নির্বিঘ্নে মদীনায় ফিরে আসার পর কুরাইশ বন্দী দু'জনকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। ওসমান মুক্তি লাভ করে মক্কায় ফিরে গেলেন। কিন্তু হাকাম গেলেন না। তিনি বললেন, অনিচ্ছাসত্ত্বে একদিন রাসূল (সা.)-এর সংসর্গ থেকে আমি মুক্তি লাভ করেছি। দুনিয়ার রাজমুকুটের বিনিময়েও এ দাসত্ব গৌরব বিক্রি করতে আমি সম্মত নই। পরবর্তীতে বির মাউনার যুদ্ধে হাকাম ইসলামের জন্য যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

বদরের যুদ্ধ

দ্বিতীয় হিজরীর রমজান মাসের শুরুতেই রাসূলুল্লাহ (সা.) খবর পেলেন যে, কুরাইশের এক বাণিজ্য কাফেলা বহু মালসামান ও অস্ত্রশস্ত্রসহ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই বাণিজ্যলব্ধ অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র যে মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধেই নিয়োজিত হবে, এ সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কুরাইশের যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ তো আগে থেকেই তাঁর জানা ছিল। কুরাইশের যে বাণিজ্য কাফেলা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে,

www.pathagar.com

তাতেও কমবেশী ৪০ জন লোক রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মুহাজির ও আনসারদের ডেকে আবু সুফিয়ানের কাফেলার কথা বললেন এবং সেই কাফেলার প্রতিরোধের অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করলেন। ওদিকে আবু সুফিয়ান রাসূল (সা.)-এর প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে দ্রুত লোক পাঠিয়ে মক্কাবাসীদের জানিয়ে দিলো যে, কাফেলা মুহাম্মদের (সা.) অনুসারীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। সুতরাং, তোমরা সসৈন্যে মদীনার দিকে অগ্রসর হও।

এ অবস্থায় রমজান মাসের ৮ তারিখ রাসূলুল্লাহ (সা.) মুহাজির ও আনসারদের নিয়ে আবু সুফিয়ানের কাফেলার গতিরোধের জন্য মদীনা থেকে নির্গত হলেন। কোন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ছিল না। সুতরাং প্রস্তুতিও ছিল গতানুগতিক। সত্তুরটি উট ও তিনশো বারো জন মুহাজির ও আনসার ছিল তাঁর সঙ্গে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনা পেছনে রেখে জুল হানিফার দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর বিরূহা হয়ে সাধারণ চলাচলের পথ ডাইনে রেখে সাফরা এসে উপস্থিত হলেন এবং এখান থেকেই আবু সুফিয়ানের অনুসন্ধানের জন্য কতিপয় সাহাবাকে রওয়ানা করিয়ে দিলেন বদর অভিমুখে এবং তিনি স্বয়ং কিছু সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে সাফরার ডান দিকে ওয়াদিয়ে ফারানে এসে যাত্রা বিরতি করলেন। এখানেই সংবাদ পাওয়া গেলো যে, কুরাইশরা মদীনা আক্রমণের জন্য দ্রুত এগিয়ে আসছে।

রাসূল (সা.) এইবার মুহাজির ও আনসারদের এক সভা ডেকে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন, যুদ্ধে তাদের মতামত কি? মুহাজিরগণ জানালেন যে, রাসূলের যে কোন আদেশ আনন্দের সঙ্গে তাঁরা পালন করতে আগ্রহী। তারপর আল্লাহর রাসূল আনসারদের কাছে তাঁদের মত জিজ্ঞাসা করলেন।

সা'দ ইবনে মা'আজ আনসারদের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো আপনার হাতে 'বায়অত' (আত্মবিক্রয়) করেছি। আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে যেতে বলেন, তবে আমরা আপনার নির্দেশে সমুদ্রে ঝাঁপ দিবো। আল্লাহর নামে আমাদেরকে আপনি চালিত করুন। আমরা আপনার সঙ্গ ছাড়বার পাত্র নই।' রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'পরম শক্তিমান আল্লাহ আমাকে বিজয়ের সংবাদ দিয়েছেন।'

অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) ওয়াদিয়ে ফারান থেকে বদর এলাকায় পৌঁছে আলী ইবনে আবু তালিব, জুবাইর ও সা'দ-এর সঙ্গে কতিপয় সাহাবাকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠালেন। তাঁরা দু'টি বালককে সঙ্গে নিয়ে নিজ ঘাটিতে ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন নামাজ পড়ছিলেন। বালক দু'টি জানালো যে, তারা কুরাইশের জন্য পানি সংগ্রহে নিয়োজিত। বালক দু'টির কথা অবিশ্বাস করে রাসূল নিয়োজিত সাহাবাগণ তাদেরকে প্রহার করতে লাগলেন। রাসূল (সা.) নামাজ শেষ করে

www.pathagar.com

তাদের প্রহার করতে নিষেধ করে বালক দু'টিকে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্য বল, কুরাইশরা কোথায়? বালক দু'টি বললো, ওই পাহাড়ের ওধারে। তারা রোজ একদিন দশটি ও পরদিন নয়টি উট জবাই করে ভোজন করে। ওরা সংখ্যায় নয়শো থেকে হাজার হবে।

বসীস ও উদী নামক দু'জন সাহাবাকে সাফরা পৌছার আগেই সংবাদ আনার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা একটু আগে পৌছে বললেন, আমরা এক কূপের কাছে উটকে পানি পান করাতে গিয়ে দু'টি নারীকে শুনলাম, পরস্পর বলাবলি করছে যে, আজ-কালের মধ্যেই সিরিয়ার কাফেলা এসে যাবে, তাদের জন্য খাদ্য রান্না করে রাখতে হয়। আমরা আবু সুফিয়ান সম্পর্কে এতটুকু জেনে এসেছি, সে এখানেই আসবে। সংবাদ সংগ্রহকারী সাহাবাগণ চলে আসার একটু পরেই সেখানে আবু সুফিয়ান তার কাফেলা নিয়ে এসে উপস্থিত হলো এবং উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করলো, কাউকে তারা এখানে আসতে যেতে দেখেছে কি না?

তারা দু'জন উষ্ট্রারোহীর কথা বললো। ইতিমধ্যে মক্কার কুরাইশ বাহিনীর লোকজনও সেখানে এসে গেছে। আবু সুফিয়ান বললো, কেন, আমি তো অক্ষত রয়েছি। আমি এখন দেখে আসি। আবু জেহেল বললো, আমরা কিন্তু যাবো না। বদরে তিনদিন অবস্থান করে হেসে-খেলে, খেয়ে-দেয়ে তারপর ফিরবো। আবু সুফিয়ানের সঙ্গে কুরাইশের বনু উদী ও বনু জোহরার লোকজনও মক্কায় ফিরে গেলো।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কিন্তু আগেই বদরে এসে এক কূপের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। একজন সাহাবী বললেন, আল্লাহর অসীম করুণা। যুদ্ধ হলে এই কূপ আমাদের খুব কাজে আসবে। একটি গর্ত খুঁড়ে এখুনি পানি সংগ্রহ করে রাখা যাক। রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্তুষ্ট চিত্তে সাহাবীর কথা সমর্থন করলেন। যথাসময়ে গর্ত খোড়া হলে তাতে পানি ভর্তি করে রাখা হলো। কলসী-কুজোগুলোও জলে পরিপূর্ণ করে রাখা হলো।

ততক্ষণে আবু জেহেল মুসলমান পক্ষে কতজন লোক আছে তা দেখার জন্য সংবাদ সংগ্রাহক পাঠালেন। সংবাদ সংগ্রাহক কুরাইশ দলে গিয়ে বললো, ওরা তিনশোর সামান্য কিছু বেশী হবে এবং ওদের মধ্যে দু'জন মাত্র ঘোড় সওয়ার। মক্কার কুরাইশরা এই খবর পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলো।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর লোকদেরকে কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিহত করে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। এইভাবে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তিনি তাঁর জন্য তৈরি এক তাঁবু প্রবেশ করলেন এবং বিশ্ব জগতের সার্বভৌম প্রভুর সামনে প্রণত হলেন।

www.pathagar.com

অস্ত্র সজ্জিত তিন গুণ কুরাইশের সঙ্গে নিরস্ত্র মুসলমানদের যুদ্ধ। আকুল হয়ে প্রার্থনায় নিমগ্ন হলে রাসূলুল্লাহ (সা.)। বললেন, 'হে আল্লাহ! বিশ্বাসীদের এই দলটিকে যদি তুমি ধ্বংস করে দাও, তাহলে পৃথিবীতে তোমার সামনে প্রণত (অনুগত) হওয়ার কেউ থাকবে না।'

রাসূল (সা.)-এর প্রার্থনা ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর এবং গম্ভীর হতে গম্ভীরতর হতে লাগলো। তার কাঁধ হতে খসে পড়লো তাঁর উত্তরীয়। মহাত্মা আবুবকর (রা.) রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে তাঁবুতে রয়েছেন। তিনি অধীর হয়ে বললেন, 'হে রাসূল, ক্ষান্ত হোন, প্রার্থনা আপনার ব্যর্থ যাবে না।'

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই প্রর্থনা কেন? রাসূল (সা.) কি জানেন না যে, আল্লাহ সব দেখছেন সব তিনি জানেন? জানেন বলেই প্রার্থনা। ক্ষমতা আল্লাহর হাতে বলেই প্রার্থনা। মানবাত্মা তার আকুতি প্রকাশ করছে সকল ক্ষমতার উৎস প্রভুর সমীপে। তাঁরই ইচ্ছায় আইন ও বিধি হয়ে নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্ব সংসার। আকাশ-পৃথিবীসহ সব তাঁর। সর্বময় কর্তৃত্ব ও আইন তাঁর হাতে বলেই যথেচ্ছাচার নয়। তাই রাসূল (সা.)ও বলতে পারেন না যে, আল্লাহর ইচ্ছার বিশ্ব প্রকৃতির বিধানের সকল শর্ত রাসূল (সা.) পূরণ করতে পারছেন কি না? তাই, গুটিকয় নিরস্ত্র মুসলমান আল্লাহর নীতিকে ধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ। তারা বস্তু জগতের আইনের শর্তগুলো যথাসাধ্য পূরণ করেও আধ্যাত্মিক আইনের সাহায্য প্রত্যাশী।

বস্তু জগতকে পরিবেষ্টন করে বিরাজ করছে আধ্যাত্ম জগত। বস্তু জগতের অপূর্ণতা পরিপুরিত করতে পারেন, ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী রহমানুর রহীম আল্লাহ। দয়া ও করুণা তাঁরই বিধান। রাসূল (সা.) তাঁর আত্মার আকুতি সেই ন্যায়পরায়ন সর্বময় ক্ষমতার মালিক ও করুণাময় আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করে নিবেদন করছেন।

সতর্কতার সঙ্গে জাগতিক আইনের শর্তগুলো সাধ্যমত পূরণ করেই প্রার্থনা করতে হয়। তখনই সে প্রার্থনা বস্তু জগতের স্তর ভেদ করে অধ্যাত্ম জগতের স্তর স্পর্শ করতে পারে। তখনই কেবল আল্লাহ রহমানুর রহীম তাঁর আধ্যাত্ম জগতের নিয়ম - কানুন অনুযায়ী বস্তু বিশ্বের আয়োজনের ন্যূনতম তাঁর আনুগত দাসদেরকে পূরণ করে দিতে ইচ্ছুক হন। প্রার্থনার সার্থকতা এখানেই।

মনে রাখা আবশ্যক যে, সকল প্রকার আইন ও নির্দেশের মালিক আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার উপায় সালাত বা নামাজের অব্যবহিত নীচের স্তরটিই প্রার্থনা। মানুষের অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত কর্মের সফলতার উদ্দেশ্যেই প্রার্থনা করতে হয় এবং আল্লাহ তাঁর দয়া গুণেই তা কবুল করেন।

রাসূল (সা.)-এর প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেছেন। সিজদা থেকে মাথা তুলে রাসূলুল্লাহ (সা.) আবুবকরকে (রা.) বললেন, 'শুভ সংবাদ, আনন্দিত হও, বিজয় নিশ্চিত।'

www.pathagar.com

ওদিকে কুরাইশ দলে মহা কোলাহল। কেউ আত্মপ্রশংসামূলক গান করছে। কেউ অহঙ্কারে চীৎকার করছে, কেউবা ক্রোধে মাটিতে পদাঘাত করছে। আর সকলে মিলে ইসলামের, মুসলমানের ও মুহাম্মদের কুৎসা গাইছে ও অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে।

এমন সময় কুরাইশ দলপতির আদেশে ওমের বিন আহর নামক এক ব্যক্তি মুসলমানদের সমরায়োজন নির্ণয়ের জন্য অশ্বারোহণে একটু ঘুরে এসে বললো, ওপক্ষে লোক যে মাত্র তিনশোর মতো তা আগেই জানা গেছে। এখন দেখলাম, এক তরবারি ছাড়া অপর কোন অস্ত্র তাদের সঙ্গে নেই। তবে এই তিনশো লোককেই এতো দৃঢ়চিত্ত ও অটল বলে মনে হলো যে, তিনশোকে খতম করতে হলে আমাদের অন্তত: তিনশো লোককে প্রাণ দিতে হবে। ওমেরের কথা শুনে হাকাম ইবনে হিজাম নামক একজন দূরদর্শী কুরাইশের চৈতন্যোদয় হলো। সে তখন দাঁড়িয়ে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তিনশো প্রাণ বলি দিয়ে জয়লাভের সার্থকতা কোথায়? ভাষণ শেষে তিনি কুরাইশ দলপতি ওৎবার কাছে গিয়ে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে বললেন, দেখুন ধনেজনে আপনি কুরাইশের একজন বরেণ্য ব্যক্তি। আপনি একটু দৃঢ়তা অবলম্বন করলে এই অপ্রয়োজনীয় সমস্যা থেকে স্বজাতিকে বাঁচাতে পারেন। আপনার নাম স্বজাতির কাহিনীতে অমর হয়ে থাকবে।

ওৎবা বললেন, আমি প্রস্তুত। হাজরামির শোণিত পণ, তা-ও না হয় আমিই পরিশোধ করে দেবো। কিন্তু হানজালিয়ার পুত্র (আবু জেহেল)-কে কি করে নিবৃত্ত করি? চেষ্টা করে দেখ তাঁকে রাজি করতে পার কি না?

হাকাম আবু জেহেলের কাছে গিয়ে নিজের ও ওৎবার মতামত ব্যক্ত করলো। শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো আবু জেহেল এবং বললো, ভীরু, কাপুরুষ, কুরাইশের কলঙ্ক, আজ যুদ্ধের নামে ভীত হয়ে প্রাণরক্ষার বাহানা খুঁজছো। বুঝেছি, ওৎবার পুত্র মুহাম্মদের (সা.) দলভুক্ত, সেও রণাঙ্গণে উপস্থিত তারই নিহত হওয়ার আশংকায় নরাধম ওৎবা এমন বিচলিত হয়ে পড়েছে। ধিক, শত ধিক, তাকে।

আবু জেহেলের কথা শুনে ওৎবা ক্রোধে, অভিমানে বলে উঠলো, কি! আমি পুত্রের প্রাণের আশায় বীর ধর্মে জলাঞ্জলি দিচ্ছি? আচ্ছা আরব দেখুক, কে বীর আর কে কাপুরুষ!

এমন সময় আবু জেহেলের প্ররোচনায় হাজরামীর ভাই গায়ে ধূলা মেখে আর্তনাদ শুরু করে দিলো।

কুরাইশ দলে যুদ্ধের উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়লো। হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো বীভৎস রণ-চীৎকার।

তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী কুরাইশ পক্ষ থেকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এলো

www.pathagar.com

তিনজন। অভিমান ক্ষুব্ধ ওৎবা, তার সহোদর শায়বা ও পুত্র ওলীদ। ওরা আস্ফালন করে প্রতিপক্ষকে আহ্বান করতে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার হাতে এগিয়ে গেলেন তিনজন আনসার।

ওৎবা চীৎকার করে বললো, মুহাম্মদ, মদীনার এই চাষাগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে অপমানকর। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পাঠাও।

রাসূল (সা.)-এর ইঙ্গিতে আনসারগণ স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) পরমাত্মীয়দের মধ্যে থেকে হামজা, ওবায়দা ও আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা ওদের মোকাবেলা কর।

তাঁরা এগিয়ে গেলে কুরাইশরা তাদের আক্রমণ করলো। ওলীদের সঙ্গে আলী, শায়বার সঙ্গে হামজা, ওৎবার সঙ্গে ওবায়দার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শায়বা ও ওলীদের শির ভূলুণ্ঠিত হলো। ওবায়দা সকলের মধ্যে বর্ষীয়ান। তিনি ওৎবাকে জখম করার বিনিময়ে নিজেও গুরুত্বভাবে আহত হয়ে পড়লেন ও কিছুক্ষণের মধ্যেই শাহাদতবরণ করলেন। ওদিকে হামজা ও আলী (রা.) এগিয়ে গিয়ে আহত ওৎবাকে নিহত করে দিলেন।

ওৎবা সবংশে নিহত হওয়ার পরই কুরাইশ সেনাদল সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের আক্রমণ করলো। এতক্ষণ ধৈর্যধারণ করার পর মুসলমানগণও রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে প্রচণ্ডবেগে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়লো। শুরু হয়ে গেলো দুই দলে তুমুল সংগ্রাম।

ঈমান ও বিশ্বাসের পরীক্ষা দিয়ে চললেন মুসলমানগণ। ওমর (রা.)-এর তরবারির আঘাতে তাঁর মাতুলের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়লো। পিতা ওৎবাকে সমরক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে দেখে তাঁর মোকাবেলার জন্য বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন পুত্র হুজায়ফা, যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন। এইভাবে সত্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাসী সাহাবাগণ আল্লাহর জন্য সকল মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে চললেন।

কুরাইশ দলপতিদের কাছে বদর প্রান্তরের এই সমর ছিল মুহাম্মদ (সা.)-এর ইসলামকে সমূলে উৎপাটিত করার সুবর্ণ সুযোগ। মুষ্টিমেয় ও নিরস্ত্র মুহাম্মদ অনুসারীদের বিরুদ্ধে যে তিনগুণ সশস্ত্র যোদ্ধা তারা নিয়ে এসেছে তারা যদি ওদের হটিয়ে দিতে পারে তবে মদীনা আক্রমণ তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়বে। কারণ মদীনার মুনাফিক, ইহুদী ও পৌত্তলিকরা তো তাদেরই জন্য অপেক্ষা করে আছে।

সুতরাং, জয়-পরাজয়ের কঠিন সমস্যা এখানে এক পক্ষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্ব রক্ষা ও অপর পক্ষের জন্য দীর্ঘদিনের প্রতিহিংসা চরিতার্থের প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল।

ঐতিহাসিকগণ বদর যুদ্ধের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে আছে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ক্ষুদ্র তাঁবু থেকে মুসলিম বীরদের পরিচালিত করছেন। তাঁর নির্দেশ

www.pathagar.com

ছাড়া মুসলমানগণ পিছু হটা কিংবা সীমার অধিক এগিয়ে যাওয়া দু'টির একটিও করেনি। কারণ, এ যুদ্ধ কোরআন নির্দেশিত জিহাদ। এতে ক্রোধ বা লোভের অবকাশ নেই। ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তিও এখানে কাজ করে না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জয় ও আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্যে শহীদ হওয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য জিহাদে নেই এবং আল্লাহরই সন্তুষ্টির দিকে নির্নিমেষ থেকে রাসূল (সা.) বা নেতার নির্দেশ মান্য করে চলাই তাদের কর্তব্য।

মুজাহিদ ও আনসার বীরদের তরবারির আঘাতে একটি একটি করে লুটিয়ে পড়ছে কুরাইশের দুর্ধর্ষ দলপতিদের শির। দেখতে দেখতে নিহত হলো ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈরী উমাইয়া বিন খলফ। আবু লাহাব যুদ্ধে আসেনি, তার পরিবর্তে এসেছে তার এক প্রতিনিধি, সেও নিহত হলো। আবু সুফিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নেই। আছে রাসূলকে (সা.) হত্যা করার ষড়যন্ত্রকারীরা তাদেরও এগারো জন খ্যাতনামা কুরাইশ রক্তাক্ত হয়ে ধূলায় লুটাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম প্রধান বৈরী আবু জেহেল এখনো অনাহূত রয়ে গেছে। আবদুর রহমান বিন আউফ বলেন, দু'জন তরুণ যুবককে দেখলাম, অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু হয়ে আবু জেহেল সম্পর্কে জানতে চাইছে। কে সেই আবু জেহেল? তারা জিজ্ঞাসা করছে, আবু জেহেলকে তিনি একবার দেখিয়ে দিতে পারেন কি না? আবদুর রহমান তখন যুদ্ধে ব্যাপৃত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আবু জেহেলকে খুঁজছো কেন? যুবকদ্বয় বললো, আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেছি, আবু জেহেলকে পেলে তাকে হত্যা করবো।

আবু জেহেল তখন কুরাইশ সৈন্যদের দ্বারা ব্যূহবেষ্টিত হয়ে তাদের মধ্যস্থলে অবস্থান করছে। প্রধান প্রধান কুরাইশ বীর তার দেহরক্ষী। সতর্কতার এতটুকু ত্রুটি নেই। এমন সময় সেই যুবকদ্বয় মা'আজ ও মু'আইজ নামক ভ্রাতৃযুগল মুক্ত তরবারি হাতে সেই ব্যূহের দিকে ধাবিত হলো ও নিমেষে আপতিত হলো ব্যূহের উপর। ব্যাপার কি, তা বুঝবার আগেই ওরা একেবারে আবু জেহেলের কাছে এসে উপস্থিত। আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা তখন মা'আজের বাম বাহুতে তলোয়ারের আঘাত হেনে তার গতিরোধ করতে গেলো। কিন্তু মা'আজের সেদিকে লক্ষ্য নেই। ইকরামার প্রতিশোধ না নিয়ে সে সংকল্প সিদ্ধির জন্য অগ্রসর হলো।

মা'আজের বাম বাহুটি তখন স্কন্ধ বিচ্যুত হয়ে চামড়ার উপর ঝুলছে। চলার পথে সেটিকে বিঘ্ন মনে করে মা'আজ চক্ষের নিমিষে দোদুল্য বাহুটিকে পায়ের নিচে চেপে ধরে এমন জোরে ঝটকা দিলেন যে, তা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেলো। এবার তিনি স্ফূর্তি সহকারে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেলেন। মু'আউজ তখন এসে গেছেন। দুই ভায়ের যুগল বাহুর প্রচণ্ড আঘাতে নিমিষেই আবু জেহেলের রক্তরঞ্জিত দেহ ধূলায় গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কুরাইশ সৈন্যদল দেখলো, মুসলিম বীরদের সিংহ বিক্রমে আবু জেহেলসহ সত্তর জন কুরাইশ নিহত

www.pathagar.com

হয়েছে। তাদের মধ্যে ওৎবা, শায়বা, আসীস, আবু সুফিয়ানের পুত্র হানজালা প্রভৃতি কুরাইশ প্রধানরা আছে। ত্রাসে ও আতঙ্কে সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে মুসলমানগণ অস্ত্র চালনা বন্ধ করে দিয়ে পলায়নপর কুরাইশদের মধ্যে সত্তর জনকে বন্দী করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশেষ করে বলে দিলেন যে, কুরাইশদের মধ্যে কিছু লোক অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে যোগদান করেছে। সুতরাং পশ্চাদ্ধাবন করে আর কাউকে আঘাত করা ঠিক হবে না।

তখনকার প্রচলিত নীতি ও দেশাচার অনুসারে বন্দীদেরকে হত্যা অথবা বংশানুক্রমে দাস বানিয়ে রাখা যেতো। অতীতের দুষ্কার্য ও ভবিষ্যতের আশংকার কথা মনে করলে বন্দী কুরাইশদের ধ্বংস করাই যথাযথ বলে মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল এমন অবস্থায়ও করুণা ও দয়াকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে বিবেচনা করলেন। কারণ, এ যুদ্ধ আল্লাহর জন্য। যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত কিছু করে আল্লাহর সৃষ্টিকে নষ্ট করা অনুচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ হলো, বন্দীদের সঙ্গে যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আদেশ যে কি নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়েছিল, তা একজন বিদেশী ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি দিয়েই বলা যেতে পারে। একজন বন্দী নিজেই বলেছে, আল্লাহ মদীনাবাসীদের মঙ্গল করুন। তারা আমাদের উটে ও ঘোড়ায় সওয়ার হতে দিতো আর নিজেরা হেঁটে যেতো। আমাদেরকে ময়দার রুটি খাইয়ে, ওরা শুধু খেজুর খেয়ে কাটিয়ে দিতো।

বন্দীদের সম্পর্কে যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করার পর রাসূল (সা.) নিহত ব্যক্তিদের সৎকারে প্রবৃত্ত হলেন। মুসলমানদের মধ্যে ছয়জন মুহাজির ও আটজন আনসার শহীদ হয়েছিলেন। মুসলমানদের যথাবিধি সমাধিস্থ করা হলো। নিহত কুরাইশদের লাশগুলো ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে ময়দানে পড়েছিল, সেগুলোকেও সাহাবারা বয়ে এনে একত্রে একটি কবরে সমাধিস্থ করলেন।

মদীনার পৌত্তলিক ও ইহুদীরা তখন উৎসুক হয়ে মুসলমানদের ধ্বংস সংবাদ শোনবার জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের দৃঢ় আশা, মুসলমানগণ এই যুদ্ধে নিদারুণভাবে পরাজিত হবে এবং সে সংবাদ পাওয়া মাত্র তারা সম্মিলিতভাবে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করবে। এদিকে আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে ও কুরাইশদের অন্যান্য জিনিস গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত আছেন মুসলমানরা। মদীনাবাসী ভক্তগণের উৎকণ্ঠার কথা তাঁদের মনে হলো।

রাসূল (সা.) তখন কালবিলম্ব না করে আবদুল্লাহ ও জায়েদ নামক দু'জন সাহাবাকে বদরের বিজয় সংবাদ জানাবার জন্য মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন।

মদীনায় যখন এ সংবাদ প্রচারিত হলো, তখন মুসলমানগণ রাসূল (সা.)-এর কন্যা

www.pathagar.com

ওসমান (রা.)-এর বিবি রোকাইয়ার সৎকার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কয়েকদিন আগে বদর যাত্রার সময় তিনি পীড়িত ছিলেন বলে ওসমান যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। যা হোক, বিজয় সংবাদ পাওয়ামাত্র মদীনার মুসলমানদের মধ্যে মহা উৎসব শুরু হয়ে গেলো। তাঁরা দলে দলে আবদুল্লাহ ও জায়েদের মুখ থেকে সে সংবাদ শুনে আল্লাহর নামে জয়ধ্বনি করতে লাগলেন।

ইহুদী, পৌত্তলিক ও মুনাফিকদের কেউ কেউ জায়েদকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উটে সওয়ার হয়ে একাকী ফিরে আসতে দেখে প্রকাশ্যে বলে ফেললো যে, মুহম্মদ শেষ, ওই দেখ তার উট ফিরে আসছে। কিন্তু জায়েদ নগর উপকণ্ঠে পৌঁছেই উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, মুসলমানগণ আনন্দিত হও। সত্যের শত্রুদেরকে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছেন। কুরাইশ দলপতিদের অধিকাংশ নিহত হয়েছে। তাদের অনেক সৈন্য হতাহত। কুরাইশদের বহু রণসম্ভার ও সাজ-সরঞ্জাম আমাদের হস্তগত হয়েছে। বহু সংখ্যক কুরাইশ বন্দীও মদীনায় প্রেরিত হচ্ছে।

ইহুদী ও পৌত্তলিকদের কাছে এ সংবাদ কল্পনাতীত। ইহুদী সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ আত্মসংবরণ করতে না পেরে প্রকাশ্যেই বলে উঠলো, 'তোদের সর্বনাশ হোক, এ-ও কি সত্য? হায়! হায়! কুরাইশরা যে আরবের সম্ভ্রান্ত বংশ, তারা রাজা! মুহাম্মদ (সা.) যদি ওদের ধ্বংস করে তবে তো আমাদের মরণই শ্রেয়।' মুসলমানগণ ইহুদীদের প্রলাপোক্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বিজয়ের আনন্দ সংবাদ সকলের কাছে বলে যেতে লাগলো।

মুসলমানদের কাছে এ যুদ্ধ আক্রোশের যুদ্ধ ছিল না। এ যুদ্ধ শান্তির সপক্ষে ও শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নির্দেশিত জিহাদ ছাড়া আর কিছু নয়। এ আনন্দ প্রায় অপার্থিব। এর তুলনা নেই।

এ সময়ই কোরআনের কিছু আয়াত নাজিল হয়। আল্লাহ বলেন, এবং আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা এবং ধন-প্রাণের ক্ষতি ও ফলশস্যের অভাব দ্বারা পরীক্ষা করবো এবং (হে মুহাম্মদ) সেই সকল ধৈর্যশীলকে সুসংবাদ দাও, যারা বিপদে পড়লে বলে নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে ফিরো যাবো। এদেরই উপর তাদের প্রতিপালকের শান্তি ও করুণা এবং এরাই সুপথগামী। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৫-১৫৭)।

মুসলামন বুঝলো, জীবনের পথে চলতে গেলে বিপদ আসবেই। এবং বিপদই পরীক্ষা। আল্লাহ ভয়, ক্ষুধা ও ধন প্রাণের ক্ষতি দ্বারাও মানুষকে পরীক্ষা করবেন। সেই পরীক্ষায় তারাই উত্তীর্ণ বলে পণ্য হবে, যারা বলবে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য ও তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাবো। যারা ধৈর্যের সঙ্গে এমন আত্মসমর্পণে অবনত হবে তাদের প্রভুর কাছে, তারাই শান্তি পাবে এবং তারাই সুপথগামী।

এইভাবে ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের মধ্যেই শান্তি ও সুপথের নির্দেশ

www.pathagar.com

দেয়া হয়েছে।

বদর যুদ্ধে যে-কজন সাহাবা নিহত হয়েছেন এবং ইতিপূর্বে নিজেদের উপার্জন থেকে অভাবগ্রস্থদেরকে জাকাত দেয়ার যে নির্দেশে দেয়া হয়েছে এবং এক মাস পর্যন্ত দিনে অভুক্ত থাকার জন্য যে নির্দেশ এসেছে, সেগুলো আল্লাহর আনুগত্যে পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ধৈর্যের সঙ্গে মেনে নিতে হবে। তাহলে সমাজে শান্তি আসবে এবং সুপথের চিহ্নও রয়েছে এগুলোর মধ্যেই।

কুরাইশ বন্দীদের নিয়ে মুসলমানগণ মদীনা ফিরে এলেন। আল্লাহ বন্দীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব মুসলমানদের উপর ছেড়ে দিলে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাদের ডেকে তাঁদের মতামত জানতে চাইলেন। আবু বকর (রা.) বললেন, হে রাসূল (সা.), এরা সকলেই আমাদের আত্মীয়স্বজন। আমার মতে, কিছু কিছু অর্থ নিয়ে এদের মুক্তি দেয়া উচিত। তাছাড়া, অল্পদিনের মধ্যে এদের ইসলাম গ্রহণও সম্ভব।

এবার রাসূল (সা.) ওমরের মত জানতে চাইলেন। ওমর (রা.) বিনীতিভাবে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আমি আবু বকরের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। এরা ইসলামের চির শত্রু। আল্লাহর রাসূলকে (সা.) হত্যা করার সংকল্প এরাই করেছিল। আল্লাহর সত্যকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলতে যথাসাধ্য চেষ্টাও এরাই করেছে। সুতরাং এদেরকে হত্যা করে ফেলা উচিত। আর প্রত্যেক মুসলমান তরবারি হাতে নিয়ে নিজের হাতে নিজের আত্মীয়দের প্রাণ বিনাশ করুক, এই আমার অভিমত।

রাসূল (সা.) লক্ষ্য করলেন যে, আবু বকরই সাহাবাগণের সাধারণ মতের প্রতিধ্বনি করছেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) ওমরের (রা.) মতামত অগ্রাহ্য করে আবু বকরের (রা.) অভিমত অনুসারে মুক্তিপণ গ্রহণের সিদ্ধান্তেই উপনীত হলেন।

ঐতিহাসিকদের অভিমত এই যে, বদর যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তিপণ ছিল এক হাজার থেকে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত। তাছাড়া, বন্দীদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানতো, মদীনার দশজন বালককে লেখাপড়া শিখিয়ে দেয়া তাদের মুক্তিপণ হিসাবে নির্ধারিত হলো।

বন্দীদের মধ্যে ছিলেন রাসূল (সা.)-এর চাচা আব্বাস। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ, তুমি কি চাও, তোমার চাচা তার মুক্তিপণের জন্য মানুষের কাছে হাত পাতুক?

জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, কেন? আপনি আসার সময় ফজলের হাতে যে অর্থ দিয়ে এসেছেন, তাই দিয়ে মুক্তিপণ পরিশোধ করে দিন।

আব্বাস ভাবলেন, মুহম্মদ এ খবর জানলো কি করে? একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুরাইশ সর্দারের কাছে মুহাম্মদের রাসূল হওয়ার অবশ্যই প্রমাণ তো সাধারণত: এমনই হবে। আব্বাসের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। তাই আর বিলম্ব না করে আব্বাস রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিকে হাত বাড়িয়ে

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণ করলেন। সকল দ্বিধা অপসারিত হয়ে ঈমানের সূর্যোদয় হলো আব্বাসের জীবনে।

আবুল ওজ্জা নামক এক বন্দী এসে রাসূল (সা.)কে বললো, মুহাম্মদ, তুমি জান যে, মুক্তিপণ শোধ করার সাধ্য আমার নেই। আমি গরীব, তার উপর আমি কয়টি কন্যার পিতা। আমার প্রতি দয়া কর।

আবুল ওজ্জাসহ আরো কয়েকজন বন্দী অর্থ বিনিময় ছাড়াই মুক্তি লাভ করে স্বাধীনভাবে মক্কা ফিরে গিয়েছিল।

মক্কার কুরাইশরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ হিসাবে মুহাম্মদ (সা.)কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো এবং ষড়যন্ত্রের ফলে ওমের ইবনে ওহাব নামক এক দুর্দান্ত কুরাইশকে অবশিষ্ট বন্দী মুক্তির অজুহাতে মদীনায় পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলো।

ওমের মদীনায় প্রবেশ করে মুসলমানদের সমাজ কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হলো। সাহাবাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখানেই অবস্থান করছিলেন।

সমাজ কেন্দ্রের দ্বারদেশে গলায় তরবারি বাঁধা ওমেরকে দেখেই সাহাবীরা বলাবলি করতে লাগলো, কুরাইশদের অন্যতম শয়তান দেখি এখানে, ব্যাপার কি?

ওমর (রা.) সেই শয়তানের কঠিন চাউনি দেখেই সকলকে সতর্ক করে দিলেন ও কয়েকজন আনসারকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চারদিকে উপবেশন করার আদেশ দিয়ে স্বয়ং রাসূল (সা.)-এর কাছে গিয়ে অবস্থা নিবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ, তাকে নিয়ে এসো'।

অনুমতি পেয়ে ওমর (রা.) আগন্তুককে টেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলে রাসূল (সা.) বললেন, ওমর তাকে ছেড়ে দাও। তারপর ওমেরকে কাছে এসে বসতে বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওমের কি মনে করে?'

ওমের জবাব দিলো, হুজুর এই বন্দীদের জন্যে আপনি দয়া করুন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু এই তলোয়ার কেন?

ওমের উত্তরে বললো, তলোয়ারের কপালে আগুন। ওটি আপনার কি ক্ষতি করতে পেরেছে।

রাসূল (সা.) বার বার তাকে সত্য কথা বলতে আদেশ করলেন, কিন্তু সে নানা কথার বাহানায় সত্য গোপন করে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন মক্কায় বসে যেসব ষড়যন্ত্র তারা করেছে, সেসব বললেন। ওমের যে তাঁকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে তরবারিতে তীব্র বিষযুক্ত করে এনেছে মুহম্মদ (সা.) তাও বললেন।

ওমের অবাক হয়ে ভাবছে, মুহম্মদ এসব জানলো কি করে?

ওমেরের বিবেক আর আত্মগোপন করতে পারলো না। সে প্রকাশ্যে বলে উঠলো, মুহাম্মদ, পূর্বে তোমার কথায় বিশ্বাস করিনি, সে জন্য এখন অনুতপ্ত। তুমি সত্যিই আল্লাহর রাসূল। ধন্যবাদ সেই আল্লাহকে তিনি এমন এক দুরভিসন্ধির বদৌলতে

www.pathagar.com

আমাকে সত্যের জ্যোতি দর্শন করার সৌভাগ্য দান করলেন।
রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাদের সম্বধোন করে বললেন, তোমাদের এই ভাইকে ভালো করে কোরআন শিক্ষা দাও।
কিছুদিন পর ওমের রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমেত উপস্থিত হয়ে বললো, হে মহান পুরুষ, আমি আল্লাহর জ্যোতি নিভিয়ে দিতে ও সত্যের সেবকগণকে নির্যাতীত করতে সব চেষ্টাই করেছি। এবং এভাবে যে মহাপাপ সঞ্চয় করেছি, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আপনি অনুমতি দিন, মক্কায় গিয়ে আমি ইসলাম প্রচার করি।
রাসূলুল্লাহ (সা.) সানন্দে ওমেরকে অনুমতি দিলে তিনি মক্কায় ফিরে গিয়ে কুরাইশদের বিস্ময় উৎপাদন করলেন। ওমেরের প্রাণের বৈরী হয়ে দাঁড়াল কুরাইশ কুল। কিন্তু তিনি তখন সকল ভয়-ভাবনার অতীত। তিনি ইসলাম প্রচারে নিরত থেকে কতিপয় সর্বনাশা নর-নারীকে ইসলামের শান্তির পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হন।
বদর যুদ্ধের পরাজয় মক্কার সমাজপতি আবু সুফিয়ানকে সাংঘাতিকভাবে মর্মাহত করলো। কুরাইশগণ মক্কায় ফিরে এলে আরবের সে সময়কার প্রথা মতো আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করলো যে, বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত সে কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, স্ত্রীলোকদের নিকটেও যাবে না।
এর কিছুদিন পরেই আবু সুফিয়ান কুরাইশের নির্বাচিত দুইশো ঘোড় সওয়ার নিয়ে মদীনার দিকে ধাবিত হলো। যথা সময়ে মদীনার নিকটবর্তী হয়ে সঙ্গীদের কোন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে কয়েকজন অনুচরসহ রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মদীনায় ইহুদী পল্লীর সাল্লাম নামক ধনপতির গৃহে এসে আশ্রয় নিলো। সাল্লাম ইবনে মিশকাম বনু নজীর গোত্রের এক বিশিষ্ট ধনকুবের। ইহুদীরা আগে থেকেই মুসলমানদের নির্মূল করার অভিসন্ধি নিয়ে এক সাধারণ তহবিল গঠন করেছিল। এই তহবিলটিও ছিল সাল্লামেরই জিম্মায়।
ইতোমধ্যেই মদীনার ইহুদীদের সঙ্গে মক্কার কুরাইশদের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলছিল। পান ভোজনের পর সাল্লামের সঙ্গে আবু সুফিয়ানের বহু পরামর্শ হলো এবং সাল্লাম থেকে মুসলমানদের সম্পর্কে আবু সুফিয়ান বহু তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে শেষ রাত্রির দিকে সেখান থেকে বিদায় নিল।

[এটুকু লিখার পর কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফ রচনাটি আর সম্পন্ন করে যেতে পারেননি।]

www.pathagar.com

প্রবন্ধ

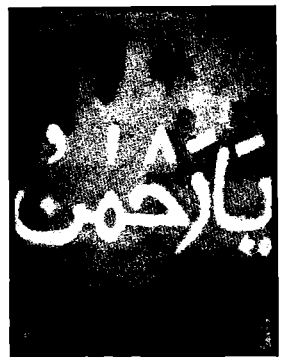

www.pathagar.com

নবীপ্রেম
ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

ক.

ঈমানের সর্বাপেক্ষা জরুরী অনুষঙ্গগুলির একটি হচ্ছে প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের প্রতি সর্বাধিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করা। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর পথ-নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনসহ দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে বেশি ভালবাসা প্রিয়তম নবীর (সা.) প্রতি পোষণ করতে হবে। যদি কেউ দুর্ভাগ্যক্রমে নবী করীম (সা.) এর প্রতি এই পর্যায়ের ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তার ঈমান কিছুতেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

ঈমানের পূর্ণতা অর্জনের জন্য নবী করীমের (সা.) প্রতি দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে বেশি ভালবাসা পোষণ করা নিম্নোক্ত হাদীস শরীফটি দ্বারা ইমামগণ ফরয সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম বুখারীর (রা.) বর্ণনা : আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম (রা.) নামক একজন সাহাবী বলেন, আমরা একদা হযরত নবী করীম (সা.)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। তিনি পবিত্র হাতে হযরত ওমরের (রা.) একখানা হাত ধারণ করে ছিলেন। ওমর (রা.) বলছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! নি:সন্দেহে আমার নিকট আপনি আমার প্রাণটুকু ছাড়া আর সবকিছুর চাইতে অধিক প্রিয়। (প্রাণটুকুর কথা বলতে পারি না। কেননা সেরূপ কোন পরীক্ষার সম্মুখীন আমি এখনও হইনি)।

নবী করীম (সা.) বললেন, না। আল্লাহর কসম! যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ রয়েছে; যে পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণের চাইতেও বেশি প্রিয় বিবেচিত না হই। পবিত্র হাতের স্পর্শ কিছুক্ষণ অব্যাহত থাকার পর হযরত ওমরের (রা.) অনুভূতি আরও একটু তীক্ষ্ণতর হলো। স্বত:স্ফূর্তভাবেই তখন তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে এলো, হ্যাঁ, এখন বলতে পারি, আল্লাহর কসম, আপনি আমার প্রাণের চাইতেও অধিক প্রিয়! হযরত ওমরের (রা.) এই স্বীকারোক্তি শুনে নবী করীম (সা.) এরশাদ করলেন, হ্যাঁ, এতক্ষণে তুমি ঠিক স্থানে পৌঁছে গেছ হে ওমর!

বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা আইনী (রাহ.) হাদীসখানার ব্যাখ্যায় বলেন, নবী

www.pathagar.com

করীম (সা.) তাঁর সর্বাধিক প্রিয় একজন সাহাবী হযরত ওমরকে (রা.) লক্ষ্য করে বললেন, সে পর্যন্ত তোমার ঈমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে না, যে পর্যন্ত আমি তোমার নিকট নিজের জীবনটুকুর চাইতেও বেশি প্রিয় বিবেচিত না হব। (ওমদাতুল-কারী)।

নবী করীম (সা.) হযরত ওমরকে (রা.) লক্ষ্য করে যে মন্তব্য করলেন, অর্থাৎ 'এতক্ষণে তোমার ঈমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে' এর দ্বারাই নবীর (সা.) প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা পোষণ ঈমানের পূর্ণতা লাভের শর্তরূপে প্রমাণিত হয়।

খ.

পিতা এবং সন্তানের চাইতেও হযরত নবী করীমকে (সা.) বেশি ভালবাসতে হবে।

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রার (রা.) বর্ণনা : নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন, সেই পরম সত্তার কসম, যার কুদরতি হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ সে পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পিতা ও সন্তানের চাইতে বেশি প্রিয় বিবেচিত হই। (বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড)।

হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, স্থূলদৃষ্টিতে এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আরবী 'ওয়ালেদ' অর্থ যেহেতু পিতা সুতরাং মাতাও ঠিক এই হুকুমের আওতায় আসবে কিনা? অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর (সা.) প্রতি ভালবাসাকে শুধুমাত্র পিতার প্রতি ভালবাসার ওপর স্থান দিতে হবে না মায়ের প্রতি মমতাও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে? অপরদিকে হাদীসের শব্দ ওয়ালাদ দ্বারা শুধুই কি পুত্র সন্তান বুঝাবে, না কি কন্যা সন্তানও অন্তর্ভুক্ত হবে?

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারীর অভিমত হচ্ছে, ওয়ালেদ শব্দটি এক অর্থে যেহেতু জনক বা জন্মদানকারী বুঝায়, সুতরাং এর দ্বারা জনক-জননী উভয়কেই বুঝতে হবে। একই সঙ্গে ওয়ালাদ অর্থে শুধু পুত্র সন্তান নয় পুত্র-কন্যা এবং নিতান্ত আপনজন সবাইকে বুঝতে হবে। মোটকথা, নিজের রক্তসম্পর্কীয় বা নিতান্ত আপনজন বলতে যাদেরকে বুঝায় তাদের সবার চাইতে বেশি ভালবাসা হযরত নবী করীমের (সা.) জন্য থাকতে হবে। (ফতহুল বারী ১ম খণ্ড)।

গ.

নবী প্রেমকে জান-মাল-আল-আওলাদ প্রভৃতি সবকিছু থেকে বেশি মর্যাদায় আল্লাহপাক মুমিনগণের উপর ফরজ করেছেন। নিম্নোক্ত হাদীসটি এর প্রমাণ।

সাহাবী হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, কোন বান্দাই সে পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তার দৃষ্টিতে আমি তার ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজনসহ দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে অধিক প্রিয় না হই। (মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড)।

ঘ.

প্রিয়তম নবীকে (সা.) সৃষ্টির সবকিছুর থেকে বেশি ভাল না বাসা বিপদের কারণ হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ধন-সম্পদ, বাড়ী-ঘর, এবং দুনিয়ার অন্যান্য সবকিছুর থেকে বেশি ভালবাসতে না পারলে তা মুসলমানদের উপর কঠিন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর স্পষ্ট ঘোষণা : ওদের বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, স্ত্রী-কন্যা, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ যা অর্জন করেছ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য যা মন্দা কবলিত হয় কিনা এরূপ আশংকা সবসময় তোমরা উদ্বিগ্ন থাক অথবা মনোরম বাসস্থান যেগুলিতে শান্তিতে বসবাস কর এসব যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথে জেহাদ করা থেকে বেশি প্রিয় বিবেচিত হয় তবে অপেক্ষা করতে থাক আল্লাহ তায়ালার সেই চরম নির্দেশের জন্য। মনে রেখো, আল্লাহ পাক কখনও ফাসেক পাপাচারীদের কোন অবস্থাতেই পছন্দ করেন না। (সূরা তওবা -২৪)।

উপর্যুক্ত আয়াতের তফসীরে ইমাম ইবনে কাসীর (রাহ.) লেখেন : উল্লিখিত বস্তুনিচয়ের প্রতি আকর্ষণ যদি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও জেহাদের চাইতে বেশি অন্তর্ভুক্ত হয় তবে এ আকর্ষণের কারণে দুনিয়া ও আখেরাত এ উভয় জাহানেই তোমাদের উপর কঠিন আযাবের ফয়সালা হতে পারে এবং তা ভোগ করার জন্য অবশ্যই তোমাদিকে অপেক্ষা করতে হবে। (মুখতাছার ইবনে কাসীর, ২য় পৃষ্ঠা)।

এ আয়াতে আজাবের যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে তাফসীরবিদ মোজাহেদ (রাহ.) বলেন, এ অপরাধে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই আজাবে পতিত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। (তাফসীরে কুরতুবী ৮ম খণ্ড)।

আল্লামা যমখশরী (রাহ.) লেখেছেন, এটি একটি নিতান্ত ভীতি উদ্রেককারী আয়াত। এর চাইতে ভীতিকর সতর্কবাণী পবিত্র কোরআনের অন্য কোথাও খুঁজে পাবে না। (তাফসীরে কাশশাফ ২য় খণ্ড)।

ইমাম কুরতুবী (রাহ.) লিখেছেন : এই পবিত্র আয়াতটি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা ফরয হওয়া প্রমাণ করে। আর এই ভালবাসা দুনিয়ার সকল কিছুর চাইতে অধিক হওয়া শর্ত। (তাফসীরে কুরতুবী ৮ম খণ্ড)।

আয়াতের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যাসমূহ একথাও প্রমাণ করে যে, যেখানে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য, আল্লাহর রাসূলের প্রতি ভালবাসা এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথে জেহাদের ডাক আছে, সেখানে জান-মালসহ সকল প্রিয় বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান করে সে ডাকে সাড়া দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

ঙ.

নবী করীম (সা.) আমাদের সর্বাধিক প্রীতি-ভালবাসার পাত্র। তাঁর প্রতি শর্তহীন আনুগত্য আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। একমাত্র তাঁর প্রতি আবেগপূর্ণ আনুগত্য ও প্রীতি-ভালবাসাই দুনিয়াতে শান্তি এবং আখেরাতের মুক্তি ও সাফল্যের

www.pathagar.com

চাবিকাঠি। হযরত নবী করীমের (সা.) পবিত্র সত্তা কোন অবস্থাতেই মানুষের প্রীতি-ভালবাসার মুখাপেক্ষী নয়। কেননা স্বয়ং সৃষ্টি ও পালনকর্তা মহান আল্লাহ পাক তাঁকে স্বীয় হাবীব বা পরম ভালবাসার পাত্ররূপে ঘোষণা করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রিয়তম নবীকে (সা.) ভালবাসার ফলশ্রুতিতেই বান্দার জন্য আল্লাহ তায়ালার করুণা প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হতে পারে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন : হে প্রিয় রাসূল! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর। স্বয়ং আল্লাহপাক তোমাদেরকে ভালবাসবেন। আর তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান-৩১)।

নবী করীম (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য, প্রীতি-ভালবাসা আল্লাহ তায়ালার করুণা লাভ এবং পাপ মোচন ও দুনিয়া আখেরাতের নিরাপত্তা ও শান্তি সুনিশ্চিত করার সর্বোত্তম মাধ্যম। তা ছাড়া নবীপ্রেমের মাধ্যমেই কেবল অর্জন করা যায় জাগতিক, আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক এমন সব নেয়ামতরাশি যা বর্ণনারও অতীত। তন্মধ্যে কয়েকটি দিকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা বিষয়টি অনুধাবন করা যেতে পারে।

ক.

ঈমানের স্বাদ এবং প্রকৃত অনুভূতি নবীপ্রেমের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। ঈমানের স্বাদ বলতে বোঝানো হয় আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালন ও অনুসরণের স্বাদ ও পরম তৃপ্তিবোধ। দ্বীনের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার এবং কষ্ট সহ্য করা এবং যে কোন প্রিয় বস্তুর তুলনায় অধিক কাম্য মনে করাও ঈমানের স্বাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

ঈমানের স্বাদ অনুভব করা সম্পর্কে হযরত নবী করীমের (সা.) ইরশাদ : যার মধ্যে তিনটি আলামত পাওয়া যায় সেই কেবল মাত্র ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হবে।

(১) আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল তার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বিবেচিত হবে।

(২) অন্য কাউকে ভালবাসতে হলে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই ভালবাসবে।

(৩) কুফুরীর দিকে প্রত্যাবর্তনকে এই রূপ না পছন্দ করবে, যেরূপ জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে মানুষ অপছন্দ করে থাকে। (বুখারী, মুসলিম)।

খ.

প্রকৃত নবী-প্রেমিকগণ পরজীবনে তাঁর সাথেই অবস্থান করবেন। সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেকের (রা.) বর্ণনা : একদা এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর নিকট হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! কেয়ামত কবে সংঘটিত হবে?

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, তুমি কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? তিনি জবাব দিলেন: আমার প্রস্তুতি কেবলমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা।

এ কথা শুনে নবী করীম (সা.) বললেন : যাকে তুমি ভালবাস তার সাথে তুমি অবশ্যই থাকবে। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী করীমের (সা.) এই কথা শুনে আমরা যে রূপ আনন্দিত হয়েছিলাম, এরূপ আনন্দ জীবনে আর কখনও পাইনি।

আনাস (রা.) বলেন, আমি আল্লাহপাক, তাঁর রাসূল (সা.) তৎসহ আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.)কে আন্তরিকভাবেই ভালবাসি। যদিও শেষোক্ত দু'জনের আমলের তুল্য আমল আমি করতে পারি না তবুও আশা করি আখেরাতে তাঁদের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ লাভ করতে পারব। (মুসলিম শরীফ)।

অন্য এক হাদীসে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন : ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে কোন দলকে মনেপ্রাণে ভালবাসে কিন্তু সে ব্যক্তি ঐ পরিমাণ নেক আমল করতে পারে না যে পরিমাণ নেক আমল ঐ দলের লোকেরা করে থাকে।

রাসূল (সা.) এরশাদ করলেন, সে ব্যক্তি ওদের সাথেই থাকবে, যাদেরকে সে মহব্বত করতো। (বুখারী ও মুসলিম)।

এখানে 'তাদের সাথে থাকবে' অর্থ জান্নাতে তাদের সাথে একত্রে বাস করবে। (ওমদাতুল-কারী)।

গ.

নবীপ্রেম ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আলেমগণ পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর আলোকে নবীপ্রেমের আলামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবীপ্রেমের সর্বপ্রথম আলামত হচ্ছে, প্রতিটি সুন্নাতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা। সুন্নাত প্রতিষ্ঠায় সাধ্যমত চেষ্টা-চরিত্র করা, নবী করীম (সা.)-এর প্রতি নাজিলকৃত শরীয়তের আনুগত্য ও প্রতিষ্ঠায় সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থাকা। সর্বোপরি এরূপ একটি মনোভাব পোষণ করা যে, প্রিয় নবীজীর (সা.) যুগে যদি আমরা থাকতাম তবে সাহাবায়ে কেরামের মতই জান-মাল উৎসর্গ করে তাঁর আনুগত্য করতাম। (কাযী আয়ায (রাহ.), শরহে নববী)।

প্রখ্যাত হাদীস তত্ত্ববিদ হাফেজ ইবনে হাজার মক্কী (রাহ.) বলেন, নবীপ্রেমের একটি প্রকৃষ্ট আলামত হচ্ছে, নিজের জান-মাল এবং সব ধরনের সহায়-সম্পদের বিনিময়েও যদি তাঁর দীদার নসীব হয় তবুও দীদারকেই অগ্রাধিকার দিয়ে বাকি সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। যদি এরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি না হয় তাহলে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নবীপ্রেমের দাবী নিতান্তই অর্থহীন। উপরন্তু সুন্নাতের পাবন্দি,

www.pathagar.com

প্রতিটি সুন্নাতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান, শরীয়তের অনুসরণ, শরীয়ত বিরোধিতা মোকাবেলা করার জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি, সৎকর্মে উৎসাহ প্রদান এবং অন্যায়-অনাচার প্রতিহত করার মানসিকতা অর্জনও নবীপ্রেমের আলামতের অন্তর্ভুক্ত। (ফতহুল বারী ১ম খণ্ড)।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রাহ.) বলেন, উত্তমরূপে বুঝতে চেষ্টা কর যে, নবীপ্রেমের সারকথা– মনেপ্রাণে তাঁর অনুসরণ করা এবং নাফরমানি ত্যাগ করার সংকল্পের মধ্যেই নিহিত। আর এটা ইসলামী বিধি-বিধানের অত্যাবশ্যকীয় করণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। (ওমদাতুল কারী ১ম খণ্ড)।

উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহের আলোকে মোটামুটিভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, নবীপ্রেমের প্রকাশ্য আলামতসমূহ হচ্ছে :

(১) প্রিয়তম নবীর (সা.) দীদার এবং সান্নিধ্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

(২) প্রিয় নবীজীর উদ্দেশ্যে জান-মাল উৎসর্গ করার সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি।

(৩) নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশাবলী পালন এবং যেসব বিষয় নিষেধ করেছেন সেসব বিষয় থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকা।

(৪) প্রতিটি সুন্নাতের অনুসরণ এবং তাঁর প্রতি নাযিলকৃত শরীয়ত প্রতিষ্ঠায় সার্বক্ষণিক প্রয়াস অব্যাহত রাখা।

যেসব লোকের মধ্যে উপর্যুক্ত আলামতগুলি বিদ্যমান তাদের উচিত আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করা যে, তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রেম ভালবাসা ও আনুগত্যের প্রেরণা তার অন্তরে স্থাপন করেছেন। উপরন্তু সে ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে, সর্বসময় আল্লাহর নিকট এ জন্য দোয়া করতে থাকা যেন এই নেয়ামত তার মধ্যে স্থায়ী হয়। অপরদিকে নবীপ্রেমের আলোচ্য আলামতসমূহের মধ্যে যদি আংশিকও কারো মধ্যে না থাকে তবে হাশরের হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হওয়ার আগেই তার নিজের হিসাব করে নেওয়া কর্তব্য। ভেবে দেখা উচিত যে, অন্তরে কপটতার আবর্জনা জমিয়ে রেখে মিছেমিছি নিজেকে মুমিনরূপে জাহির করছে কিনা। প্রকৃত প্রস্তাবে ওরা একাধারে মুমিন-মুসলমানদের এবং তৎসহ খোদ আল্লাহর সাথে প্রতারণা করছে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়, যারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করার চেষ্টা করে তারা প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মপ্রতারণার শিকার হয়।

আল্লাহপাক বলেন, এসব কপট লোক আল্লাহপাক এবং ঈমানদারগণের সাথে প্রতারণা করতে চায়। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা নিজেদেরকেই প্রতারিত করে থাকে। কিন্তু ওরা তা বুঝতে চেষ্টা করে না। (সূরা বাকারা)।

লেখক : প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং মাসিক মদীনা পত্রিকার সম্পাদক।

www.pathagar.com

হাদীসে রাসূল (সা.)-এর আলোকে বিজ্ঞান

ড: এম. শমশের আলী

মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ করেন মানবজাতির পথ-প্রদর্শক হিসেবে। তাঁর নিকট নাজিল করা হয় আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন, যা সমগ্র মানব জাতির জন্য অনুসরণীয় একটি জীবনাদর্শ। আধুনিক জীবনে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও তৎপরতা মানুষের কৃষ্টির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে– পবিত্র কোরআন এবং হাদীসে যেহেতু মানুষের জীবন পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তাই এ দু'টি সূত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিও ইঙ্গিত থাকার কথা। হ্যাঁ, ইঙ্গিত আছে এবং আছে খুব জোরালোভাবে। পবিত্র কোরআনের ৬৬৬৬টি আয়াতের মধ্যে প্রায় সাড়ে সাতশ' আয়াতই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত। লোকেরা এই আয়াতগুলো খুব একটা শোনেনও না, বোঝেনও না। যারা ধর্মীয় ওয়াজ করেন, তারাও এসব আয়াতের কথা তেমন বলেন না। এর একটা কারণও রয়েছে– আমাদের দেশে যারা কোরআন তেলাওয়াত করেন তাদের অনেকেই মানে বোঝেন না, আর যারা মানে বোঝেন তাদের অধিকাংশের সাথেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সম্পর্ক খুব কম। এসব চিন্তা করেই সম্প্রতি Scientific Indications in the Holy Quran শীর্ষক একটি গ্রন্থ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। হাদীসেও যে বিজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত আছে এখন সে কথাও জনসাধারণকে ভাল করে জানান দরকার। আল্লাহর রাসূল হজরত মুহাম্মদ (সা.) কোন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা এমনকি কোন স্কুলেও পাঠ করেননি। তাহলে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত দিলেন কেমন করে? এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা অনুশীলনের মাধ্যমে যে জ্ঞান সংগ্রহ করি, তা হচ্ছে Derived knowledge বা সংগৃহীত জ্ঞান। কিন্তু আমাদের নবীজীর জ্ঞান ছিল Revealed knowledge অর্থাৎ নাজেলকৃত জ্ঞান। স্বয়ং আল্লাহই ছিলেন তাঁর শিক্ষক। সূরা নাজমে বলা হয়েছে যে, নবীজী কোন মনগড়া কথা বলতেন না, তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল ওহী, আল্লাহ তাঁকে শিক্ষাদান করেছিলেন শক্তিশালী জিবরাঈল (আ:)-এর মারফৎ। আল্লাহ যেখানে নিজেই নবীজীকে শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে নবীজীর উক্তিগুলো যে বিজ্ঞানসম্মত হবে তাতে আর সন্দেহ কোথায়? নবীজী যেসব কাজ করতে বলেছেন এবং যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন সেগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝা যায় যে, সেগুলো সত্যিই বিজ্ঞানসম্মত। নবীজীর জ্ঞান যে সুদূরপ্রসারী এবং সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য ছিল, তা কয়েকটি হাদীসের বিশ্লেষণ করলেই বোঝা

www.pathagar.com

যায়।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে : একদিন এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি কালো সন্তান হয়েছে।' ঐ ব্যক্তি স্বভাবতই কালো রঙয়ের সন্তান আশা করেননি। নবীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন ভিন্নতর এক প্রশ্ন : 'তোমার উট আছে?' লোকটি উত্তর দিলেন : 'জ্বি আছে।' 'উটগুলোর রং কি?' নবীজী আবারও জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি উত্তর দিলেন : 'লাল রঙয়ের।' নবীজীর পরের প্রশ্ন : 'সব লাল রঙয়ের, একটাও কি ধূসর বর্ণের নেই?' এবার লোকটি উত্তর দিলেন : 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা ধূসর বর্ণের উট আছে বটে।' এবার নবীজী লোকটিকে প্রশ্ন করলেন : 'অনেক লাল উটের মধ্যে হঠাৎ ধূসর উট আসলো কেমন করে?' লোকটি উত্তর দিলেন: 'একটি গুপ্ত বৈশিষ্ট্য এই ধূসর রঙটিকে টেনে বের করে এনেছে।' এবার নবীজী বুঝিয়ে দিলেন: 'তোমার সন্তানের কালো রঙটি টেনে বের করে এনেছে একটি গুপ্ত বৈশিষ্ট্য।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই গুপ্ত বৈশিষ্ট্য Genetics বা বংশগতি বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Hidden trait। ভাবতে অবাক লাগে যে, আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে এ হাদীসে নবীজী যে প্রসঙ্গটি অবতারণা করেছিলেন তা ছিল Recessive Genes বা সুপ্ত Genes-এর কথা যা Genetecist-রা জানতে পেরেছেন অনেক পরে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মানব দেহের বিভিন্ন Traits বা বৈশিষ্ট্যের জন্য এক বা একাধিক Genes দায়ী। Gene হচ্ছে জীবকোষের মধ্যে অবস্থিত DNA বা Dioxy ribo Nucleic Acid নামক যে Master molecule of life বা বংশগতির নীল নকশা নির্ধারক যে অণু রয়েছে, তার অংশবিশেষ, যা বিশেষ কয়েকটি Chemical components দিয়ে তৈরি। বংশ পরাণুক্রমে এই Gene-গুলো এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে Transmitted বা প্রবাহিত হয় প্রজনন কোষের মারফৎ। যেসব বাবা-মা'র চোখ কালো তাদের সন্তানের চোখ কালো হবে– সেটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে কালো চোখের জন্য যে Gene-গুলো দায়ী, সেগুলো সন্তানের মধ্যে সরাসরি প্রকাশিত হয়– এগুলোকে বলা হয় Dominant। এখন বংশগতির কোন এক পর্যায়ে কোন এক পূর্বপুরুষের চোখ যদি নীল থেকে থাকে, তবে সেই নীল চোখের জন্য দায়ী Gene-গুলো সরাসরি প্রকাশিত না হয়ে বেশ কয়েক Generation ধরে Hidden বা সুপ্ত থাকতে পারে এবং হঠাৎ কালো চোখওয়ালা বাবা এবং কালো চোখওয়ালা মা'র সন্তানের মধ্যে সেই পূর্ব-পুরুষের নীল চোখের জন্য দায়ী Gene-গুলো যেগুলো এতকাল Recessives বা সুপ্ত ছিল, সেগুলো যদি হঠাৎ করে প্রকাশ পায় তবে বাবা-মা'র চোখ কাল হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের চোখ নীল হতে পারে এবং তা মাঝে মাঝে হতেও দেখা যায়। বাবা-মা'র গায়ের রঙ সাদা হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের রঙ কালো

www.pathagar.com

হতে পারে এবং সেটি ঠিক এই কারণেই। ভাবতে অবাক লাগে যে, Dominant Genes এবং Recessives Genes-গুলো আমরা ভাল করে জানতে পেরেছি এই মাত্র সেদিন, আর আমাদের মহাজ্ঞানী নবী (সা.) সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন কত শত বছর আগে। নবীর (সা.) হাদীসটিতে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হচ্ছে– উটের বৈশিষ্ট্যের সাথে মানুষের বৈশিষ্ট্য তুলনা করেছেন তিনি। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, Laws of heredity অর্থাৎ বংশগতির নিয়ম-কানুন জীবজন্তু ও মানুষর বেলায় Similar বা সদৃশ এবং এটাই আধুনিক বংশগতিরও কথা।

এবারে পরিবেশ সংক্রান্ত একটি হাদীসের আলোচনা করা যাক। আজকের বিশ্বে পরিবেশ একটি বহুল আলোচিত বিষয়। কিছুদিন আগে Brazil-এর Rio di genero-তে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন। এর পরপরই সারা বিশ্ব জুড়ে পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার, বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন ক্লাব পরিবেশের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেছেন। চারদিকে গাছ লাগাবার একটি হিড়িক লক্ষ্য করা যায়। এই হিড়িক একটি শুভ পদক্ষেপ, অবশ্য যদি গাছ লাগাবার ব্যাপারটা এলোপাথাড়ি না হয়ে সুপরিকল্পিত হয় এবং ব্যাপারটিকে Monitor করা হয়। কোনখানে গাছ বাঁচল না, কোনখানে আবার লাগাতে হবে– সেসব দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গাছের অস্তিত্বের সাথে আমাদের ও অন্যান্য প্রাণীর অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা কার্বনডাই অক্সাইড ছাড়ি, বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করি। গাছ কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ছাড়ে। আমরা যদি বেশী মাত্রায় গাছ কেটে ফেলি এবং তা জ্বালাই, তাহলে একদিকে যেমন আমাদের এবং যানবাহন, কল-কারখানা থেকে নির্গত কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করবার মত পর্যাপ্ত গাছ রইল না, অন্যদিকে কাঠ পুড়াবার ফলে বাতাসে অতিরিক্ত কার্বনডাই অক্সাইড সংযোজন করলাম। অর্থাৎ বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইড Build-up বা পুঞ্জীভূত হতে থাকল। এ কথা সুবিদিত যে, বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইড, Water vapour, Nitrous oxide, Methance ইত্যাদি গ্যাসের মাত্রা বেড়ে গেলে ভূপৃষ্ঠে যে সৌরতাপ এসে পড়ে তা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেই আটকা পড়ে যায় অধিক মাত্রায়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় Green house effect। এই তাপমাত্রা বাড়ার ঘটনাকে বলা হয় Global warming। তাপমাত্রা বাড়লে বরফ গলবে বেশি। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে, সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলো তলিয়ে যাবে– এ এক ভয়াবহ পরিণতি। এসব কথা ভেবেই সবদিকে গাছ লাগানোর দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। বেশি গাছ থাকলে বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইড-এর মাত্রা কমবে। তাছাড়া গাছ মাটিকে আঁকড়ে রাখে। নদীর তীরে গাছ থাকলে Soil erosion বা ভূমি ধ্বস হয় না।

www.pathagar.com

গাছের সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ ও বন্যার প্রকোপ ইত্যাদি গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

ভাবতে অবাগ লাগে যে, বাংলাদেশে যেখানে শতকরা ৮৬ ভাগেরও বেশি জনসাধারণ মুসলমান, সেখানে গাছ লাগনোর প্রেরণা তো অনেক আগেই আসা উচিত ছিল হাদীস থেকে। গাছ লাগানোর প্রতি নবীজী (সা.) অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস অনুযায়ী নবীজী (সা.) বলেছেন : 'যদি নিশ্চিতভাবে জান যে, রোজ কিয়ামত এসে গেছে তথাপি তোমার হাতে যদি একটি গাছের চারা থাকে তা লাগান যায় তবে সেই চারা লাগাবে।'#

আমরা সবাই জানি যে, রোজ কিয়ামত কখন হবে সে জ্ঞান আল্লাহ কাউকে দেননি। রোজ কিয়ামত যখন হবে তখন গর্ভবতী উষ্টীর গর্ভও প্রত্যাখ্যান হবে– তখন কে কার কথা ভাববে? দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি শুরু হয়ে যাবে– এ অবস্থাতে চারা লাগাতে যাবে কে? অথচ এ অবস্থাতেও চারা লাগাতে বলা হয়েছে। এই হাদীসটির মারফৎ নবীজী (সা.) বৃক্ষরোপণের প্রতি যে অসাধারণ গুরুত্বারোপ করেছেন, তার তুলনা হয় না। হাদীস অনুসরণ করতে হবে– এ কথা মনে করেও ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানরা যদি গাছ লাগাতে শুরু করে এবং শুরু করা উচিতও, তবে তা হবে দেশের জন্য একটি শুভ পদক্ষেপ।

জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক হাদীস রয়েছে। সবগুলো আলোচনা করা বেশ সময়সাপেক্ষ। এবারকার ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে দেশবাসীর প্রতি একটি কথাই বলার আছে, তা হলো– আপনারা তো অনেক হাদীস মেনে চলেন নবীর (সা.) প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখিয়ে এবং আল্লাহর আদেশ পালন করেই। এখন জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত হাদীসগুলো বুঝুন, ছেলেপুলেদের বুঝান এবং পালন করুন। একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস হচ্ছে : 'জ্ঞানার্জন নর ও নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য।' এই হাদীস মানলে তো বাংলার ঘরে ঘরে নিরক্ষর লোক থাকবারও কথা নয়। তাই দেশবাসীর প্রতি আমার আকুল আবেদন, আপনারা ঘরের দোরগোড়ায় যেমন দোয়া ইউনুস লিখে রাখেন তেমনি এখন থেকে ঐ দোরগোড়ায় একটি হাদীসটি লিখে রাখবেন: 'জ্ঞানার্জন প্রত্যেক নর ও নারীর প্রতি অবশ্য কর্তব্য।' আমাদের জ্ঞান বাড়লে আমরা রাসূল (সা.)-কে ভাল করে বুঝতে পারবো, আল্লাহর মহিমা ভালভাবে বুঝতে পারবো।

লেখক: প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, প্রাক্তন ভিসি, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[আল্লামা আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর [কামালুদ্দীন] ইবনে মুহাম্মদ জালালুদ্দীন (তুলুনী) আল খুযাইরী আসসুয়ুতী(র.) সংকলিত 'রিসালা'গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

www.pathagar.com

ইসলামের দারিদ্র বিমোচন ও জনগণের আস্থা

শাহ আবদুল হান্নান

ইসলাম দারিদ্র বিমোচনে সক্ষম কিনা– এ প্রশ্নের ব্যাপারে ভাবতে গেলে একদিকে মনে হয় এ প্রশ্নটি সঠিক নয়। কেননা, ঐতিহাসিক বিচারে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো, ইসলাম যখন বিস্তার লাভ করে, তার খেলাফতের যখন বিস্তার হয়, তারপর থেকে বিভিন্ন সময়ে সম্পূর্ণভাবে দারিদ্র উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে, এমন সময়ও পার হয়েছে, যখন যাকাত নেয়ার লোক ছিল না। যাকাত নেয়ার লোক কখন থাকে না? যখন কোনো সমাজে দারিদ্র থাকে না। কিন্তু আজকের পাশ্চাত্য সমাজ কি এ দাবী করতে পারবে যে, সাহায্য নেবার কেউ নেই? আমেরিকা কি দাবী করতে পারবে, তাদের সমাজে সাহায্য নেবার মত কোন লোক নেই? এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামের ইতিহাস অনেক গৌরবোজ্জ্বল আর এ অর্থে সুপিরিয়র, শ্রেষ্ঠ যে সে দারিদ্র দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এ দাবী পুরোপুরিভাবে পশ্চিমা বিশ্ব এখনো করতে পারবে না।

এ দিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে 'ইসলাম দারিদ্র বিমোচন করতে সক্ষম কিনা' এ প্রশ্নটা অযৌক্তিক মনে হয়। কিন্তু এ প্রশ্নটাই মাঝে মধ্যে শুনে থাকি।

আবার একদিক থেকে এ প্রশ্নটা সাধারণ মানুষের মধ্যে আসতে পারে। কেননা, তারা বলে– ইসলামে আখেরাতের কথা বলা হয়। ইবাদত, ঈমানের কথা বলা হয়। নামাজ, রোযা, হজ্জের কথা বলা হয়। কিছুটা যাকাতের কথা বলা হয়। তাহলে এখানে দারিদ্র বিমোচন করার ওপর কিংবা অর্থনীতির ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে তো মনে হয় না। এর থেকে তাদের ধারণা হয়, ইসলামে প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র বিমোচনের কোনো কথা বলা হয়নি। কিংবা ইসলামের আলোকে হয়ত বা দারিদ্র দূর করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু ঐতিহাসিক যে বিচারের কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি সেটা ছাড়াও তারা এটা ভুলে যায় যে, ইসলাম দুনিয়ার কথা বলেছে। ইসলাম বলেছে, 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানা।' এ কথাও তারা ভুলে যায় যে, কোরআনে সুরাতুল বাকারার ২০১ আয়াতে প্রথমত দুনিয়ার কল্যাণের কথা বলা হয়েছে আখেরাতের কল্যাণের পূর্বে। আবার ইসলামে কাজের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা কাজ কর, আমল কর। কিন্তু তোমরা বসে থাকো– এ কথা ইসলাম কোথাও বলেনি। আবার ইসলাম ব্যবসার কথা বলেছে। ইসলাম চুক্তির কথা বলেছে, চুক্তি রক্ষার কথা

www.pathagar.com

বলেছে। বলেছে, সম্পদের ব্যাপক বিতরণের কথা, মানুষের অধিকারের কথা। ইসলামে হকের কথা বলা হয়েছে। ইসলামে 'হক্কুল ইবাদ' অর্থাৎ বান্দার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এগুলোকে যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে একথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, ইসলাম শুধু আখেরাতের কথা বলেছে, শুধু ঈমানের কথা বলেছে– এ কথা বলা ঠিক নয়।

তবে আমি একথাও বলব যে, সাধারণ মানুষ বা যারা জানে না, তাদের পুরো দোষও দেয়া যাবে না। কেননা, তারা জুমআর খুতবায়, ঈদের খুতবায়, আলেমদের ওয়াজ মাহফিলের আলোচনায় সাধারণভাবে ইসলামের অর্থনীতির কথা শোনে না। তারা 'মুদারাবা' নামে যে এক ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি আছে সেই 'মুদারাবার' কথাও শোনেনি। মুদারাবা হলো– এক পক্ষ কাজ করবে, আর এক পক্ষ অর্থ দেবে। আবার তারা 'মুশারাকা'র কথাও শোনেনি– এটা হলো এক ধরনের শরিকদারী ব্যবসা বা বাণিজ্য বা শিল্প– যাতে শরীকদের পুঁজি একত্র হয়। আবার 'ইসতিসনা' বা ম্যানুফেকচারিং কন্ট্রাক্টের (Manufacturing Contract) কথা তারা শোনেনি। যদি বলি আজকের বাংলাদেশের তের কোটি মানুষের মধ্যে কতজন 'ইসতিসনা'র কথা শুনেছে, তা চিন্তার বিষয় হবে। কারণ এসব কথা তারা খুতবা বা ওয়াজে শোনেনি। ফলে তাদের কি করে দোষ দেয়া যায় যে, কেন তারা এ প্রশ্ন করে, ইসলাম দারিদ্র বিমোচন করতে সক্ষম কিনা?

এ প্রসঙ্গে এখানে এ কথা বলতে হয়, ইসলামের লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ। ইসলামের শ্রেষ্ঠ আলেমগণও তাদের পুস্তকাদিতে এ জনকল্যাণের কথা বলেছেন। এদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালী, ইমাম শাফেয়ী, ইবনুল কাইয়্যিম-এর কথা উল্লেখ করা যায়। 'মাকাসিদ আল শরীয়াহ' বা শরিয়াহর লক্ষ্য হচ্ছে জনকল্যাণ করা। আর জনকল্যাণ কি? জনকল্যাণ হচ্ছে যা কিছু ঈমান বা বিশ্বাসের জন্য কল্যাণকর, যা কিছু জীবন ও অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর, যা কিছু বুদ্ধিমত্তার জন্য কল্যাণকর, যা কিছু ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য কল্যাণকর– এর সবগুলো মিলেই হচ্ছে প্রকৃত জনকল্যাণ। আর যা কিছু এসবগুলোকে নষ্ট করে অর্থাৎ জীবনের কল্যাণ, অর্থ বা মালের কল্যাণ এবং যা কিছু ঈমানের কল্যাণের বিরোধী হবে, মানুষের বুদ্ধি-বিবেক নষ্টকারী হবে– সেগুলোকে 'মাফাসিদ' বা অকল্যাণ বলে গণ্য করা হবে। (দ্রষ্টব্য : ইমাম গাজ্জালী, আলমুসতাসফা, ১ম খণ্ড, ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লাম আল মুয়াক্কিয়িন, তৃতীয় খণ্ড)।

আবার সহজ করে বলতে গেলে ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে জনকল্যাণ। আমরা লক্ষ্য করেছি, আধুনিক যুগে যারা ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে লিখেছেন, যেমন ড: ওমর চাপরা, ড: ফাহিম খান, ড: মনওয়ার ইকবাল, প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, ড: তরীকুল্লাহ খান, ড: নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকি, ড: মনজের কাহাফসহ অন্যান্য বড় বড়

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনীতিবিদদের কথা যদি বলি তাহলে দেখব, তারা যে ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি খাঁড়া করেছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে আদালত বা জাস্টিস। তারা কোরআন বিশ্লেষণ করে বলছেন, কোরআনে প্রায় একশ' আয়াত আছে যেখানে আদল বা জাস্টিস বা ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে। আবার একশ' আয়াত আছে যেখানে জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা বলতে চাচ্ছেন, মোটামুটি প্রায় দুইশ' আয়াতে ইনসাফ করার কথা বলা হয়েছে।

তারা বলেছেন, ইনসাফ করার মূল তাৎপর্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনকে মেটাতে হবে। ইংরেজিতে তারা বলছেন : Nad Fulfillment করতে হবে। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, ইসলামে শরীয়তের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ (Wolefare)। আবার ইসলামের শরীয়তের যে দর্শন, অর্থনীতির যে দর্শন সেখানেও রয়েছে জাস্টিস। আর জাস্টিসের অন্যতম তাৎপর্য হচ্ছে Nad Fulfillment। জাস্টিসের এ ছাড়াও অনেক তাৎপর্য আছে। কাজেই যে অর্থনীতির দর্শনে রয়েছে Nad Fulfillment বা প্রয়োজন পূরণ করা, সেখানে এটা কি করে বিশ্বাস করা যায় যে, সেই অর্থনীতি দারিদ্র বিমোচন করতে সক্ষম হবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, ইসলামী অর্থনীতি দারিদ্র দূর করার জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছে? কি কৌশল (Strategy) গ্রহণ করেছে। অর্থনীতিতে এভাবেই ইসলাম তার কৌশল ও কর্মপদ্ধতিকে সাজিয়েছে যে, মানুষ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করবে– তবে এটা হবে শরীয়তের সীমার মধ্যে। সে রোজগার কররে। তার সম্পত্তির ওপর তার অধিকার রয়েছে এবং থাকবে। ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক তার যে মালিকানা হয় তা তার থাকবে। সে স্বাধীনভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প করতে পারবে। এমনভাবে যদি অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন করা যায় বা সাজানো যায়, তাহলে দারিদ্র বিমোচন সহজ হবে। তবে কিছুটা সময় তো লাগবেই। এর সবকিছু নির্ভর করে যদি সরকার ইসলামী সরকার হয় কিংবা কমিটেড হয় এবং জনগণ তা চায়। কিন্তু সরকার যদি ইসলামিক না হয় কিংবা ইসলামের প্রতি কমিটেড বা আগ্রহী না হয় বা তার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বা অঙ্গীকারাবদ্ধ না হয় অথবা জনগণ যদি এ ব্যাপারে আগ্রহী না হয় তাহলে তো ইসলামের কোন কল্যাণকর কর্মসূচীই কার্যকর হবে না।

একজন ব্যক্তি যদি পরাধীন হয়, স্বাধীন না হয়, তাহলে তার মধ্যে প্রতিভার স্ফূরণ হয় না। সুতরাং যে অর্থনীতি মৌলিকভাবে স্বাধীন নয় সেখানে ব্যক্তির প্রতিভার স্ফূরণ হবে না, বিকাশ হবে না। সেখানে অর্থনৈতিক উদ্যোগ বেশি হবে না, প্রবৃদ্ধি (Growth) বেশী হবে না। কিন্তু যেহেতু ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শরীয়ার সীমার মধ্যে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে, ফলে তা যদি কার্যকর করা যায় তাহলে

www.pathagar.com

সেখানে ব্যক্তির বিকাশ বা স্ফূরণ হবে। অর্থনীতিরও বিকাশ হবে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ লোক নিজেদের রোজগারের ব্যবস্থা নিজেরা করে নেবে। আর এটাও স্বাভাবিকই যে, যে কোনো অর্থনীতিতে মানুষ নিজেরাই নিজেদের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করে থাকে।

এ কথা সত্যি যে, ইসলামী অর্থনীতিতে এমনভাবে স্ট্রাকচার করা হয়েছে যাতে মানুষ নিজেরাই তাদের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে। এ প্রসঙ্গটি আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। তারপরেও যারা কোনো কারণে রোজগার কিংবা প্রয়োজনীয় আয় করতে পারবে না তাদের দায়িত্ব ইসলামী ব্যবস্থায় পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনের উপর বর্তাবে। তারাও যদি সে দায়িত্ব পালন করতে না পারে তাহলে সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের দায়িত্ব পড়বে রাষ্ট্রের ওপর।

ইসলাম যেটাকে ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণ রাষ্ট্র বলেছে, এর সাথে পাশ্চাত্যের কল্যাণ রাষ্ট্রের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্যে ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রে (যেমন সুইডেন) যদি কোনো লোক নিজে তার ব্যবস্থা করতে না পারে তাহলে তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর চলে যায়। এর ফলে একটা খারাপ দিক দেখা দেয়, তা হলো রাষ্ট্রের ওপর বোঝা বেড়ে যায়। আর রাষ্ট্রের ওপর যদি বোঝা বেড়ে যায় তাহলে রাষ্ট্রকে সেটা মোকাবিলা করার জন্যে জনগণের উপর বেশি ট্যাক্স ধরতে হয়। রাষ্ট্রকে অনেক বেশি ঋণ (Borrow) করতে হয়। আর ঋণ নিলে পাশ্চাত্যের সিস্টেমে সুদ দিতে হয়। কাজেই দেখা যায়, হয় ঋণ নিতে হয়, তার উপর সুদ দিতে হয় অথবা ট্যাক্স বৃদ্ধি করতে হয়। কখনো দু'টাই করতে হয়। যার ফলে কিছুদিন এভাবে চলে দীর্ঘ মেয়াদী, (Long term) একটা পর্যায় যাওয়ার পর, এটা আর চলে না, স্থবির হয়ে যায়। এটা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে যায়।

এজন্যে পাশ্চাত্যের ওয়েলফেয়ার ইকোনমি বা জনকল্যাণ রাষ্ট্রগুলো ক্রমেই রিট্রিট করছে। ক্রমেই তারা পিছিয়ে আসছে জনকল্যাণমূলক প্রোগ্রাম থেকে। এগুলোকে তারা কাটসাট করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ইসলাম এ বিষয়টিকে এভাবে মোকাবিলা করেছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজে আয়-রোজগার করতে না পারে তাহলে তাৎক্ষণিকভাবেই তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর হবে না। বরং তা তার পরিবারের ওপর হবে, তার ছেলের, পিতা বা ভাইয়ের ওপর হবে। কিংবা অন্য কোনো আত্মীয়ের ওপর হবে। আর রাষ্ট্র এটা দেখবে যে তারা এ দায়িত্ব পালন করছে কিনা। এখানে যদি কেউ বেআইনী কাজ করে, অর্থাৎ এ দায়িত্ব পালন না করে তাহলে তার জন্য রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিতে পারে, তাকে বাধ্য করতে পারবে। এটা তার ওপর আইনগত বাধ্যবাধকতা (Obligation) হবে। কিন্তু এসব কিছু করার মতো তার যদি কেউ না থাকে তাহলে কেবলমাত্র তখনই তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর পড়বে।

কাজেই এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্যের ওয়েলফেয়ার সিস্টেমে রাষ্ট্রের ওপর

www.pathagar.com

যে বিরাট দায়িত্ব চলে আসে তার তুলনায় ইসলামের ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রের ওপর দায়িত্ব কম আসে। যার ফলে ইসলামের ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্র More sustainable, বেশি কার্যকর। এটাকে কার্যকরী করা সম্ভব। পাশ্চাত্যের দীর্ঘমেয়াদী সিস্টেমে এটা সম্ভব হয় না বলেই সেখানে ওয়েলফেয়ার সিস্টেম ধসে (Collapse) পড়ছে। নর্থ ইউরোপ, বৃটেন, আমেরিকাসহ বিভিন্ন জায়গায় এ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। যার ফলে তারা আবার পুরানো ক্যাপিটালিজম সিস্টেমে ফিরে যাচ্ছে কিংবা যেতে বাধ্য হচ্ছে। এখন এ ওয়েলফেয়ার সিস্টেমে, যেটার কথা ইসলাম বলছে তার মধ্যে যাকাত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামে দারিদ্র বিমোচনের যে কর্মসূচী আছে তার মধ্যে যাকাত একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ব্যবস্থায় যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের দায়-দায়িত্ব থাকে রাষ্ট্রের।

কিছুদিন আগে আমরা কি পরিমাণ যাকাত আমাদের দেশে আদায় হতে পারে তার একটা হিসাব করে দেখলাম, প্রায় ২৪০০ কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব। এটা এক বছরের কথা বলা হয়েছে। এখানে খুব কমই হিসাব করা হয়েছে। এর পরিমাণ আরো বেশী এমন কি পাঁচ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। আমরা কম করে ২৪০০ কোটি টাকা হিসাব করলেও যদি এ টাকা সত্যিই রাষ্ট্র আদায় করে এবং এটা যদি শুধুমাত্র দারিদ্র বিমোচনে ব্যবহার করা হয় তাহলে এটা দারিদ্র বিমোচনে বিরাট ভূমিকা রাখবে।

কিন্তু যদি ধরি তা রাষ্ট্র আদায় করবে না, ব্যক্তি বা সমাজ করবে, আর এটাই যদি আমরা মেনে নেই তাহলে যে ২৪০০ কোটি টাকা আদায় হবে তা ধনীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে গরীবদের মাঝে বন্টন (Transfer) হবে। এটা যদি সিস্টেমেটিক্যালি করা যায়, সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে করা যায়, এবং এমনভাবে করা যায়, যেটা ইসলামের সেই লক্ষ্য 'তুমি এমনভাবে দেবে যাতে গ্রহীতা ব্যক্তি জীবনের মতো স্বাবলম্বী হয়ে যায়। হযরত ওমর (রা.)-এর বিখ্যাত বক্তব্য হলো, 'তুমি এমনভাবে দাও যাতে সে ধনী হয়ে যায়।' অর্থাৎ তাকে যেন আর কোনোদিন যাকাত না নিতে হয়। যাতে তার কোনো না কোনো কাজের ব্যবস্থা হয়ে যায়। একটা Self employment হয়। তার যেন একটা ব্যক্তিগত আয়-রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে যায়। কাজেই যাকাতের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র করুক বা সমাজ করুক এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে।

যাকাতের ব্যবস্থার সাথে সাথে 'ওয়াকফ'ও তার ভূমিকা পালন করবে। আমাদের ওয়াকফ সিস্টেম ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা এটাকেও নষ্ট করে ফেলেছি। কিন্তু আমরা জানি যে, ইসলামের ইতিহাসে ওয়াকফ-এর বিরাট ভূমিকা ছিল যেটা বর্তমানে নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। সেটাকে আমাদের পুনরুদ্ধার (Revive) করতে হবে। এক সময় ইসলামের যে দারিদ্র বিমোচন

www.pathagar.com

হয়েছে তা মূলতঃ একদিকে যাকাত আর একদিকে ওয়াকফ-এর কারণে হয়েছে। আবার এমন সময় গেছে যেখন সবাই চাইত কিছু না কিছু সম্পত্তি আল্লাহর পথে দিতে। সেটা দিত বলেই সে সময় সকল স্কুল ফ্রি চালানো সম্ভব হতো। ওয়াকফ'র কারণে সকল ইউনিভার্সিটি ফ্রি চালানো হতো। অর্থাৎ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই ওয়াকফ'র কারণে ফ্রি চালানো সম্ভব ছিল।

আবার 'ওয়াকফ' ব্যবস্থার কারণেই সকল চিকিৎসা ফ্রি চালানো হতো। পথিক কিংবা আগন্তুকদের জন্য যে সরাইখানার ব্যবস্থা ছিল তাও ওয়াকফ সম্পত্তির মাধ্যমেই ফ্রি চালানো সম্ভব হতো। এখন দরকার ওয়াকফকে একটি লম্বা সময় ধরে পুনর্গঠন করা। জনগণকে এর গুরুত্ব বোঝানো দরকার। জনগণ যদি এটা বুঝতে পারে এবং যদি সত্যিই তারা আগের দিনের লোকদের মতো আল্লাহর পথে দান করতে থাকে, প্রত্যেক ধনীই যদি তার সম্পদের একটা অংশ ওয়াকফ করে যান তাহলে সমাজে ব্যাপকভাবে দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব হবে এবং এভাবেই সমাজ উন্নয়নে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ড: ওমর চাপরা তার বইতে উল্লেখ করছেন, এমনও সময় গেছে, যখন পাঁচ থেকে পনের ভাগ পর্যন্ত মানুষের সম্পত্তি ওয়াকফ-তে চলে গিয়েছিল, যেগুলোর মাধ্যমে অর্জিত আয় সম্পূর্ণ জনকল্যাণে, মানুষের দারিদ্র বিমোচনে ব্যবহার করা হতো। আমরা জানি, সোভিয়েত ইউনিয়নে, ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় যাবার পরপরই ওয়াকফ প্রপার্টি বাতিল করে দেয়। এর একটা অন্যতম কারণ হলো, যাতে করে সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলামী শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে স্কুলগুলো চলত এসব ওয়াকফ প্রপার্টির মাধ্যমে। (দ্রষ্টব্য: Islam in the Soviet Union, Alexander Benigsen.)

যাই হোক, দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা থাকবে যা আগেই উল্লেখ করেছি। সেই সাথে ওয়াকফ তার ভূমিকা পালন করবে। এ জন্য নতুন ভাবে, নতুন করে আমাদেরকে ওয়াকফ চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা জানি, ইসলাম ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে নতুনভাবে অর্গানাইজ করার কথা বলে। এটা সুদভিত্তিক হবে না। এটা মুদারাবা ভিত্তিক, মুশারাকা ভিত্তিক হবে। মুরাবাহা ভিত্তিক হবে, ব্যবসাভিত্তিক হবে। লাভ-লোকসান ভিত্তিক হবে। ভাড়া বা ইজারা ভিত্তিক হবে। এখানে শোষণের সুযোগ কম থাকবে। যদিও একথা এখনো পুরোপুরি বলা সম্ভব নয় যে, ইসলামী ব্যাংকিং তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে। কারণ ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র ছাড়া সমাজের বিভিন্ন সেক্টরে পরিপূর্ণ ইসলামীকরণ সম্ভব নয়। তাই একথা এখন দাবী করাও সম্ভব নয়। তবে ইসলামের সামাজিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণে ইসলামী ব্যাংকিংকে ব্যবস্থা নিতে হবে। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ

www.pathagar.com

বলেন, ইসলাম যে সামাজিক বিপ্লব চায়, অর্থনৈতিক বিপ্লব বা পরিবর্তন চায় সেই পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সিস্টেমকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থ লাগবে এবং এ অর্থ আদান-প্রদান হবে ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে। সুতরাং ব্যাংককেই এ ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে গেলে আমাদেরকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর যে সমস্ত থিওরিটিক্যাল কাজ হয়েছে, তাত্ত্বিক কাজ হয়েছে, তার লক্ষ্য সম্পর্কে যে সমস্ত কাজ হয়েছে, তার পলিসি সম্পর্কে যে সমস্ত কাজ হয়েছে, সেগুলোকে আমাদের পড়তে হবে এবং জানতে হবে।

তেমনিভাবে, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র তার রাজস্ব নীতি (Fiscal Policy) ও শুল্ক নীতিকে (Taxation Policy) কাজে লাগাবে। রাজস্ব নীতিতে আয় ও ব্যয়ের ইসলামী নীতিগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগালে সমাজে আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যয়ের নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। যেমন আমি যদি বলি আগামী বাজেটের পরিমাণ হবে ছিচল্লিশ হাজার (৪৬,০০০) কোটি টাকা। এখন আমরা ঢাকা শহরে প্রায় এক কোটি লোক বাস করি; এর মধ্যে ধরলাম দেড়-দুই লাখ লোক রাস্তাঘাটে থাকে। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ধরে নেই লাখ খানেক। প্রশ্ন হলো, এ সংখ্যার জন্য আমরা কি আমাদের ৪৬,০০০ কোটি টাকার বাজেট থেকে এক দুই বছরে ৫০০ কোটি টাকা করে বের করতে পারি না বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে? এ প্রকল্পের আওতায় আমরা এদেরকে আবার শহর থেকে যার যার গ্রামে নিয়ে গিয়ে পুনর্বাসন করে দেব। কিন্তু এর জন্য দরকার রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের Determined Policy। এর জন্যে যদি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আন্তরিক হন এবং তারা যদি এর জন্যে সময় দেন, সাধারণভাবে বিভিন্ন স্থান থেকে যে সমস্ত বাঁধা আসে সেগুলোকে যদি তারা অতিক্রম করতে পারেন, কিংবা সিভিল সার্ভেন্টের ভেতর থেকে যে বিরোধিতা আসে সেটাকে যদি প্রতিরোধ করতে পারেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডাকে অতিক্রম করে এর কল্যাণকারিতাকে ধারণ করতে পারেন তাহলে এটা করা খুব কঠিন কিছু নয়।

দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের যে ব্যয় নীতি (Expenditure policy) আছে তারও একটা বিরাট ভূমিকা আছে। কিন্তু আমরা সেগুলো করতে ব্যর্থ হচ্ছি। আজ হোক, কাল হোক, দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের জন্য সেগুলো আমাদেরকে গ্রহণ করতেই হবে। তেমনিভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে মনিটরি পলিসি এটাতে ইসলাম ব্যাপক পরিবর্তন আনবে দারিদ্র বিমোচনের জন্য। কারণ সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রতিবছরই নতুন অর্থ বাজারে ছাড়ে, ৫-১০ ভাগ। এটা একটা ক্রিয়েটেড মানি। এতে নতুন অর্থের সৃষ্টি হয়। এ অর্থ জনকল্যাণমূলক

www.pathagar.com

কাজে ব্যবহার করা যায়। সেন্ট্রাল ব্যাংকের এ নতুন অর্থের জন্য যেহেতু কোনো খরচ করতে হচ্ছে না, এর জন্য তাকে কোনো জিনিস বেঁচতে হচ্ছে না, এটা একদমই আকাশ থেকে পাওয়া অর্থই বলা যায়, যেটা নোট প্রিন্টের মাধ্যমে সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রতি বছর বাজারে ছাড়ে। এ টাকা যদি সরকারকে দেয়ার সময় বলেঃ এটা শুধুমাত্র জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে, দারিদ্র বিমোচনে ব্যয় করতে হবে তাহলে এর মাধ্যমে সামগ্রিক পরিবর্তন সম্ভব। এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ অর্থ সরকারকে কর্জ হিসাবে দিতে পারে। এ ব্যাপারে ড: চাপরার বই 'Towards a Just Monetory System এ তার Monitory Policy অধ্যায়ে তিনি এ বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

এর থেকে বোঝা যায়, ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যয়নীতি ও মুদ্রানীতির একটা বিরাট ভূমিকা আছে। এরপর যে কথা আমি আগেই বলেছি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, ইসলামী সমাজে কঠিন দারিদ্র কম ছিল। যাকে আমরা Hard Core Poverty বলি তা কম ছিল বা ছিল না। এ জন্যই দারিদ্রমুক্ত সমাজ তারা গড়তে পেরেছিল। একেবারে শুরু থেকেই ইসলাম সিস্টেমটিকে আস্তে আস্তে গড়ে তোলে, যে কারণে শুরুতে কিছুটা দরিদ্রতা ছিল। কিন্তু উমাইয়া, আব্বাসীয়দের সময় থেকে তা কার্যত সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। আর একথাও আগেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলামে এমন এক সময় গেছে যখন যাকাত নেবার লোক পাওয়া যায়নি। কিন্তু পশ্চিমারা আজকেও এ দাবী করতে পারবে না যে, সাহায্য নেবার লোক তাদের সমাজে নেই। এসবই সম্ভব যদি দেশে যোগ্য ইসলামী দল থাকে, যোগ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব থাকে, ইসলামী নেতৃত্ব থাকে। এ ধরনের যোগ্য লোকেরা যদি সরকার গঠন করতে পারে, জনগণের সাহায্যে সম্মতিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, গণরায় নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় আসতে পারে তবে দারিদ্র দূরীকরণ ও কাঙ্খিত সমাজ উন্নয়ন অবশ্যই সম্ভব। কেবল ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রই এ কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। অবশ্য এটাও সম্ভব, যারাই সরকারে থাকুক তারা যদি ইসলামকে অগ্রাধিকার দেয় এবং কমিটেড হয় আর ইসলামী দল ও স্কলারদের যথাযথভাবে কাজে লাগায় এবং সেই সাথে জনগণ যদি ইসলামী কল্যাণ কর্মসূচী মেনে নেয় ও গ্রহণ করে, তাহলে আমার মতে বাংলাদেশের মত সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা উর্বর ভূমির দেশে অভাব ও দারিদ্রের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে ইসলামের চেয়ে আর কোনো ভালো আদর্শ নেই এবং হবেও না। কিন্তু এর সুফল লাভ করতে হলে এর জনগণকেই সম্মিলিতভাবে তা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

লেখক: চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ। সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

www.pathagar.com

ইসলামী শিল্পকলা ও বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা

ড. আবদুস সাত্তার

আমরা যে সকল নীতি কথা বলি সেই সকল নীতি কথা যদি বাস্তবে পালন করা যায় তাহলে জীবনের সর্বস্তরে শৃঙ্খলা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। এই শৃঙ্খলা এবং শান্তি কিংবা সুখ প্রতিষ্ঠা করা গেলে বেহেশতী সুখ কিংবা জান্নাতী শান্তি ইহলোকেই উপভোগ করা সম্ভব। ইহলোকে বা মর্তে বেহেশতী সুখ আনয়নে সুনীতি যেমন ভূমিকা পালন করে থাকে ঠিক তেমিন ভূমিকা পালন করে থাকে শিল্পকর্মও। অর্থাৎ শিল্পকর্ম মানুষকে আধ্যাত্মবাদে আকৃষ্ট করে। এবং মানব অভিজ্ঞতাকেও উন্নত করে। যদি এই শিল্পকর্ম ইসলামী শিল্পকর্ম হয়, বিশেষ করে যদি ইসলামী ক্যালিগ্রাফি হয় তাহলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, সুনীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে, শুভ চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এবং মানব চরিত্র উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে প্রভাব বিস্তার করবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। থাকে না, কারণ ধর্ম মানুষকে শুদ্ধ করে এবং শুভ কাজে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে যে শিল্পের সম্পর্ক সেই শিল্প যে কল্যাণকর হবে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে সে কথা নির্দ্বিধায় বলে চলে। ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শুধু নয়, যে কোন ধরনের শিল্প চর্চার অর্থই সুন্দরের চর্চা করা। অর্থাৎ শিল্পীর কাজই সুন্দরের চর্চা করা। সমাজে সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং যারা সুন্দরের চর্চা করেন, সুন্দরকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করবার কাজে নিয়োজিত থাকেন তাদেরকে সমাজের সকলেই পছন্দ করেন। আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। সুন্দরের যারা এর চর্চা করেন তাদেরকেও তিনি পছন্দ করেন। সুতরাং ক্যালিগ্রাফি শিল্পের চর্চার মাধ্যমে যারা সুন্দরের প্রচার করছেন আল্লাহ তাদেরকেও পছন্দ করেন। আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদও (সা.) ক্যালিগ্রাফি শিল্প এবং এই শিল্পের চর্চাকারী শিল্পীদেরকে পছন্দ করতেন। তিনি

www.pathagar.com

নিজে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার প্রচারের জন্য কাজ করেছেন। তিনি শুধু নন তাঁর জামাতা হযরত আলীও (রা.) একজন ক্যালিগ্রাফি প্রেমিক মানুষ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কারণ তিনি নিজেও একজন সুদক্ষ ক্যালিগ্রাফি শিল্পী ছিলেন।

ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয়, বদরের যুদ্ধে যে সকল বন্দী মুক্তিপণ দিতে অপারগ হতো তাদের প্রত্যেককে দশজন মুসলমানকে লেখাপড়া শিক্ষা দেবার শর্তে মুক্তি দেয়া হতো। এই শিক্ষাদানের মধ্যে ক্যালিগ্রাফিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ থেকেই ক্যালিগ্রাফির প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভালবাসার গভীরতা নিরূপণ করা যায়। শুধু হযরত মুহাম্মদ (সা.) ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের পছন্দ করেছেন তাই নয়, সেকালে মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে ক্যালিগ্রাফি এবং ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের কদর ছিল। মুসলিম শাসকগণ শিল্পীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ছাড়াও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাও দান করেছেন। আব্বাসীয় আমলে অনেক শিল্পীকে প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োগ দেবার ক্ষেত্রেও সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকল মুসলিম রাষ্ট্রে এমন কি মুঘল আমলেও রাষ্ট্র নায়কগণ ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও প্রচার প্রসারে সহায়তা করে গেছেন। যে ক্যালিগ্রাফির প্রতি এক সময় এত বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেই ক্যালিগ্রাফি বলতে হস্তলিপি বিদ্যা (Hand writing as an art)। অর্থাৎ সাধারণ অক্ষরকে বিশেষভাবে বিন্যাসের মাধ্যমে সুন্দর আকর্ষণীয় রূপ দেয়াকে বুঝানো হয়েছে। এই আদর্শকে সামনে রেখেই অতীতে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ক্যালিগ্রাফি চর্চা হয়েছে। ক্যালিগ্রাফি চর্চার এই পদ্ধতি ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে পবিত্র কোরআনরে সুরা আল-বাকারার ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ আদম (আ:)-কে প্রত্যেক বস্তুর নাম এবং তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত করিয়েছেন'। সুতরাং এই আয়াতের আলোকেই বিশ্বাস করা হয় যে, যেহেতু প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আদম (আ:)-কে অবহিত হয়েছে সেহেতু তাকে আরবী সম্পর্কেও অবগত করানো হয়েছে। এই বিশ্বাসের আলোকেই বিভিন্ন তথ্যে বলা হয়েছে যে, আদম (আ:) এর পর তাঁর পুত্র শীষ (আ:) আরবী বর্ণ ও বর্ণ বিন্যাসের উৎকর্ষ সাধন করেন। এমনিভাবে বংশানুক্রমে তাঁরাই আরবী ভাষার বিকাশ সাধন করেছেন। আব্বাসীয় আমলে মুসলিম সভ্যতার যখন স্বর্ণযুগ তখন আরবী ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছিল বলে অভিমত পাওয়া যায়। এই তথ্য থেকেই আরবী ভাষার এবং ক্যালিগ্রাফি শিল্পের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে ক্যালিগ্রাফি শিল্প জনপ্রিয়তা লাভে ব্যর্থ হয়েছে বলে অনেকে মনে করে থাকে। তা না হলে যে শিল্প

www.pathagar.com

সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এমন কি ভারতীয় উপমহাদেশে এক সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল সেই শিল্পের কদর না থাকবার আর কোন কারণ থাকতে পারে না। বিশ্ব শিল্পের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে এখনও বহু দেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের জনপ্রিয়তা রয়েছে। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতেও শিল্পমান সম্পন্ন ক্যালিগ্রাফি চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। পাকিস্তানের শিল্পী সাদেকাইন, ইন্দোনেশিয়ার শিল্পী আব্দুল জলিল পাইরোস, ইরানের শিল্পী আর মাফি, বি, জাভিদ, এম. এহসাঈ, জর্ডানের শিল্পী এম. রফিলাহ্হাম, কুয়েতের শিল্পী জাবের আহমাদসহ বহু দেশের বহু শিল্পীর ক্যালিগ্রাফি শিল্প এই প্রদর্শনীতে অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। দেশ বিভাগের পূর্বে এতদঞ্চলে যে সকল ক্যালিগ্রাফি শিল্পের চর্চা হয়েছে তার সিংহভাগই মসজিদকে কেন্দ্র করে করা হয়েছে। এ সকল শিল্পের মধ্যে কিছু করা হয়েছে পাথর খোদাই করে এবং কিছু করা হয়েছে মসজিদের দেয়াল গাত্রে। পাথরে খোদাই করা ক্যালিগ্রাফি শিল্পের নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রাচীন বাংলায় প্রাপ্ত ক্যালিগ্রাফির সিংহভাগই আরবী অক্ষরে করা। তবে কিছু কিছু ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় নির্মিত ক্যালিগ্রাফি নিদর্শনও পাওয়া গেছে। এই সমস্ত ক্যালিগ্রাফির স্টাইল বিভিন্ন রকমের। যেমন, থালয, নাসক, তুঘরা, কুফিক, বিহারী প্রভৃতি। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যে সকল নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে তার অধিকাংশই তুঘরা স্টাইলে করা। এই স্টাইলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পাশাপাশি সন্নিবেশিত অক্ষরগুলি অত্যধিক লম্ব স্বভাবের। দূর থেকে লক্ষ্য করলে এগুলোকে লোহার রেলিংয়ের অনুরূপ মনে হয়। প্রকৃত অর্থে তুঘরা কোন স্বতন্ত্র লিখন পদ্ধতি নয়। কুফিক, নাসক, সুলস এবং তাদের গোত্রভুক্তির মধ্য দিয়ে তুঘরা নামে পরিচিত হয়েছে। এই পদ্ধতির আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অক্ষর বা বর্ণগুলো একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করে একটি সুন্দর দৃষ্টি নন্দন শৈল্পিক রূপ ধারণ করে। এই পদ্ধতিতে কোরআনের কোন আয়াত বা বিশেষ দোয়া অবলম্বন করে অলংকরণ প্রক্রিয়ায় পাখি, বাঘ, সিংহ এবং হাতির প্রতিকৃতি করা হয়েছে বলে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে (পৃ: ৩২৫)।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে যারা ক্যালিগ্রাফি শিল্পের চর্চা করছেন তাদের অনেকেই তুঘরা স্টাইলের অনুসরণ করছেন। যেমন ইব্রাহিম মণ্ডল, আরিফুর রহমান, কে-এইচ মুনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেনসহ আরও অনেকে। ১৭ মে '০২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র নামক সংগঠনের উদ্যোগে যে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী হয়েছে সেই প্রদর্শনীতে ২৪ জন শিল্পীর শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে। এ সকল শিল্পীর মধ্যে দেশের প্রবীণ খ্যাতিমান শিল্পীসহ ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন এমন শিল্পী এবং অনেক প্রতিশ্রুতিশীল

www.pathagar.com

শিল্পীরা রয়েছেন। এ সকল শিল্পীরা হলেন, শিল্পী মুর্তজা বশীর, আবু তাহের, শামসুল ইসলাম নিজামী, আব্দুস সাত্তার, সাবিহ-উল-আলম, মো: রেজাউল করীম, রাসা, ইব্রাহীম মণ্ডল, আরিফুর রহমান, নাসির উদ্দিন আহমেদ খান, আমিনুল ইসলাম আমিনী, শহীদুল্লাহ এফ বারী, মাহবুব মুরশীদ, এম. এ. আজীজ, মোহাম্মদ আমীরুল হক, কে এইচ মুনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ মনোয়ার হুসেইন, মুবাশ্বীর মজুমদার, মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, ফেরদৌস আরা আহমেদ, রফিকুল্লাহ গাজালী, হা. মিম কেফায়েতুল্লাহ, আবু ডারডা মো: মোনাঈম, মো: মাসুম বিল্লাহ। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী এসকল শিল্পীর প্রায় সকলেই আরবী বর্ণ এবং কোরআনের আয়াত অবলম্বন করেছেন চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে। শিল্পী আব্দুস সাত্তার এবং শিল্পী আরিফুর রহমানসহ হাতে গোনা কয়েকজন বাংলা বর্ণ ব্যবহার করেছেন।

শিল্পী মুরতজা বশীর এমন একটি নাম যার সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন হয় না। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতের প্রায় সকলেই জানেন, তিনি এ দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পী। তিনি পূর্বে তার পেইন্টিংয়ে যে আরবী অক্ষর ব্যবহার করেছেন সে বিষয়টিও অনেকের জানা। এবার এই প্রদর্শনীতে তিনি দুটো নির্ভেজাল ক্যালিগ্রাফি চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এর একটির বিষয় আলীফ, লাম এবং মীম। তিনি এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যেই ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে চিত্র দুটি অংকন করেছেন। চিত্র দুটিতে শিল্পী আরবী অক্ষর ব্যবহার করলেও এর সার্বিক অবয়বে নির্বস্তক পেইন্টিংয়ের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। শিল্পী আবু তাহের এবং শামসুল ইসলাম নিজামীও এ দেশের প্রবীণ শিল্পী এবং শিল্পাঙ্গনে উভয়েই পরিচিত। উভয় শিল্পীকে দেশের শিল্পপ্রেমী মানুষের এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পী হিসেবেই জানেন। তবে উভয়েই তাদের কাজে অনেক সময় আরবী অক্ষর ব্যবহার করেছেন। উভয়েই পূর্বে আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। এবারেও আকর্ষণীয় সুন্দর চিত্র উপহার দিয়েছেন। শিল্পী আবু তাহের ও শামসুল ইসলাম নিজামীর মত শিল্পী আব্দুস সাত্তারও আরবী এবং বাংলা উভয় শ্রেণীর বর্ণমালা সহযোগে ২০/২৫ বছর পূর্ব থেকেই চিত্র নির্মাণ করছেন। তিনি কাঠখোদাই, এক্রোলিক, জল রঙ এবং এচিং মাধ্যমে বহু ক্যালিগ্রাফি চিত্র অংকন করেছেন। বর্তমান প্রদর্শনীতে তিনি এক্রেলিক মাধ্যমে করা তিনটি চিত্র উপহার দিয়েছেন দর্শকদের জন্য। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শীত শিল্পীর আরবী বর্ণমালার বিশালাকৃতির কাঠখোদাই ক্যালিগ্রাফি চিত্র মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারীতে সংরক্ষিত হয়েছে।

শিল্পী রাসাকে সবাই দেশের একজন প্রথিত যথা ভাস্কর হিসেবেই জানেন। তিনি ক্যালিগ্রাফি, প্রদর্শনীর জন্য বাংলা বর্ণমালা অবলম্বনে কাঠের কাজ দর্শকদের জন্য

www.pathagar.com

উপহার দিয়েছেন। ইব্রাহীম মণ্ডল ইতিমধ্যেই ক্যালিগ্রাফি শিল্পী হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন। তিনি নিয়মিত ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে থাকেন। তার এ সকল কাজের মধ্যে বর্ণ বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যে রঙ ফর্ম এবং বর্ণ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ফলে চিত্রে একটি ভিন্ন স্বভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে এ সকল চিত্র একটি ভিন্ন স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এবারের প্রদর্শনীতে তেল রঙ-এর পাশাপাশি কাঠের তৈরি ক্যালিগ্রাফিও উপহার দিয়েছেন। শিল্পী আরিফুর রহমান আর একজন শিল্পী যিনি তার কাজের জন্য ইতিমধ্যেই ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন। দেশের দৈনিকসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার বাংলা এবং আরবী বর্ণমালার চিত্তাকর্ষক ক্যালিগ্রাফি চিত্র অনেকেই প্রত্যক্ষ করে থাকেন। তার শিল্পকর্ম দেখে অনেকেই প্রশংসা করেছেন। মোঃ আমিনুল ইসলাম আমিন আরবী বর্ণকে অবলম্বন করে সুন্দর আকর্ষণীয় শিল্প রচনা করেন। তার চিত্রে আরবী বর্ণমালার পাশাপাশি মানুষের হাত, লতা, পাতাসহ আরও বহুবিধ বিষয়ের সমাহার লক্ষ্য করা যায়, যা তার চিত্রকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করে। যেমন সুরা আর রূম-৪১। শহীদুল্লাহ এফ বারী নির্ভেজাল আরবী ক্যালিগ্রাফি করে থাকেন। কখনো রঙের মাঝে সাদা স্পেস রেখে সে জমিনে স্পষ্টভাবে আরবী অক্ষরগুলা উপস্থাপন করেন। কখনও আবার পুরো জমিনে বিভিন্ন ধরনের হালকা রঙ ব্যবহার করে তার উপর বর্ণ বিন্যাস করেন। মাহবুব মুর্শিদ এবারের প্রদর্শনীতে ৫টি চিত্র উপস্থিত করেছেন যার প্রায় প্রতিটিই অত্যন্ত সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। তিনি আরবী বর্ণ ব্যবহারের সাথে সাথে আরও কিছু ফর্ম ব্যবহার করে চিত্রকে ভিন্ন রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি স্বার্থক হয়েছেন। একই বর্ণ এবং ফর্ম-এর মধ্যে বিচিত্র বর্ণের সমাহার ঘটিয়ে চিত্রগুলোকে দৃষ্টিনন্দন করেছেন। আমিরুল হকও তার চিত্রে আরবী বর্ণের পাশাপাশি লতা-পাতা-ফুল ব্যবহার করে তার চিত্রকে আকর্ষণীয় রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। শিল্পী মুনিরুজ্জামান হালকা রঙের জমিনে বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে আরবী বর্ণ ব্যবহার করেছেন। তিনি জল রঙ মাধ্যমে বিষয়কে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

মনোয়ার হোসেন তুঘরা স্টাইলে অক্ষর বিন্যাসের মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেছেন। কোনটিতে শুধু অক্ষর, আবার কোনটিতে পাহাড়, পর্বত, আকাশ, সবুজ বৃক্ষ এবং মসজিদের গম্বুজ ব্যবহার করে তার মধ্যে সুন্দরভাবে আরবী বর্ণ উপস্থাপন করেছেন। তার এ প্রচেষ্টা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

শিল্পী আব্দুর রহীম চিত্রের পাশাপাশি ক্যালিগ্রাফি সমৃদ্ধ পটারী বা মৃৎপাত্র উপহার দিয়েছেন দর্শকদেরকে। তার চিত্র এবং মৃৎপাত্র উভয়ই আকর্ষণীয়। রঙ ব্যবহারে মার্জিত রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন শিল্পী রহীম। ফেরদৌস আরা আহমেদ বর্তমান প্রদর্শনীর একমাত্র মহিলা শিল্পী। তার সঙ্গে এক সময় একটি ক্যালিগ্রাফি

www.pathagar.com

ওয়ার্কশপে সামান্য দু'একটি বাক্য বিনিময়ে হয়েছিল। সেদিন তিনি বলেছিলেন মেহদী পাতা থেকে রস সংগ্রহ করে ক্যালিগ্রাফি চর্চার চেষ্টা করছেন। প্রদর্শনীতে তার দু'টি চিত্র স্থান পেয়েছে। তিনি মেহদী পাতার রস দিয়ে নানা রকম লতা-পাতা-ফুলের নক্সার মাঝে আরবী বর্ণ ব্যবহার করেছেন। আরবী অক্ষরগুলোর মধ্যেও একইভাবে লতা-পাতা-ফুলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্সা করেছেন। তিনি তার প্রচেষ্টায় যে সফল হয়েছেন তা দর্শক সাধারণ চিত্র দর্শনেই সে কথা অনুভব করবেন। শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালীর ক্যানভাস-এর চতুর্দিকে গাছ-পাতার সমাহার ঘটিয়ে তার মাঝের অংশে সাদা রঙে আরবী অক্ষর ব্যবহার করেছেন। এই অক্ষর বিন্যাসের পিছন অংশে অর্থাৎ জমিনে হালকা লালচে ও নীল রঙ ব্যবহার করে পুরো ছবিকে আকর্ষণীয় করেছেন। শিল্পী কেফায়েত উল্লাহ তার ক্যানভাসের উপর এ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মে গাঢ় নীল রঙের ফ্রি ব্রাশ স্ট্রোক ব্যবহার করে তার উপর উজ্জ্বল হলুদাভ রঙে মোটা অক্ষর বিন্যাস করেছেন। আরবী মোটা বলিষ্ঠ অক্ষরগুলোর নিচে ক্ষুদ্রাকৃতির অক্ষর বিন্যাসের মাধ্যমে বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করেছেন। শিল্পী নাঈম প্রদর্শনীতে সুন্দর তিনটি চিত্র উপস্থাপন করেছেন। তার বর্ণবিন্যাসে তিনি শিল্পী-সুলভ মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণ ব্যবহার করে চিত্রকে আকর্ষণীয় করেছেন। রঙ ব্যবহারও চমৎকার। তিনি বিভিন্ন রঙে আরবী অক্ষর বিন্যাসের মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি চিত্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। মো: মাসুম বিল্লাহ জল রঙ মাধ্যমে আরবী বর্ণ বিন্যাসে চিত্র রচনা করেছেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রজনী নামক চিত্রে বর্ণগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে, সেটি গোলাকার রূপ ধারণ করেছে। এই গোলাকার রূপ ব্যাঞ্জনাকে বার বার ব্যবহার করেছেন। এগুলোর একটি আর একটি থেকে ক্রমান্বয়ে অস্পষ্ট হতে হতে জমিনের রঙের সাথে মিশে গিয়েছে।

শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার এক্সিলিক রঙ ব্যবহার করেছেন তার চিত্র রচনার ক্ষেত্রে। শিল্পী অত্যন্ত আকর্ষণীয় রঙ ব্যবহারের সাথে সাথে আরবী বর্ণ বিন্যাস করেছেন।

নাসির উদ্দিন আহমেদ খান তেল রঙের মাধ্যমে এ্যাবস্ট্রাক্ট পেইন্টিং-এর আবহ সৃষ্টি করে তার উপর আরবী অক্ষর বিন্যাস করে চিত্র রচনা করেছেন। তার কোন কোন চিত্রে অক্ষরগুলোকে বৃহৎ আকারে ব্যবহার করেছেন এবং এর সঙ্গে ফুল-পাতার অনুভূতি সৃষ্টি করে চিত্রকে আকর্ষণীয় করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

শিল্পী শহীদুল্লাহ জল রঙ মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি চিত্র অংকন করেছেন। আরবী বর্ণের পিছনে কোনটিতে তিনি মসজিদের গম্বুজ আবার কোটিতে কোরআনের ব্যবহার করে ধর্মীয় অনুভূতি প্রদানে সচেষ্ট হয়েছেন।

এই প্রবন্ধ লিখবার মুহূর্তে কয়েকজন শিল্পীর শিল্পকর্মের ফটো না থাকার কারণে তাদের শিল্পকর্ম বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

www.pathagar.com

বর্তমান প্রদর্শনীতে অধিক সংখ্যক শিল্পীদের অংশগ্রহণ প্রমাণ করছে যে, ক্রমান্বয়ে ক্যালিগ্রাফি চিত্র চর্চা বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরও অনেক শিল্পী এ মাধ্যমে শিল্প চর্চায় উৎসাহিত হবেন এবং এক কালের জনপ্রিয় শিল্প বাংলাদেশেও জনপ্রিয় হবে। এবারের প্রদর্শনীর প্রধান শিল্পী এবং বলা যায় প্রধান আকর্ষণ মুর্তজা বশীর। তিনি যে বহু পূর্ব থেকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করতেন তা তার এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট হয়েছে। আমার এই প্রবন্ধ লেখা যখন শেষ করছি ঠিক তখনই হাতে এলো সকালের দৈনিক। সেই দৈনিকে তার এই সাক্ষাৎকারটি সবিস্তারে ছাপা হয়েছে। তিনি ক্যালিগ্রাফি চর্চা করতে গিয়ে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর অবিবেচক এবং পরশ্রীকাতর মানুষদের দ্বারা যে আক্রান্ত হয়েছেন সাক্ষাৎকারে সে কথাও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি যে ঐ সকল পরশ্রীকাতর মানুষদেরকে পরওয়া করেননি সেটি তার বক্তব্যে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি তার সাক্ষাৎকারে শিল্প চর্চার ক্ষেত্রে তার বাবার সহৃদয় ভূমিকা, হাদীস-কোরআনের আলোকে শিল্প চর্চার ক্ষেত্রে পাপ-পূণ্যের বিষয়সহ বহু মূল্যবান তথ্য তুলে ধরেছেন। শেষে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, বর্তমানে তিনি ব্যাপকভাবে ইসলামী অনুভূতিকে অবলম্বন করে চিত্রাংকন করছেন এবং সে সকল চিত্রের সাহায্যে সামনের রজমানে প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন। এখানে তার বক্তব্য হুবহু তুলে ধরা হলো। তিনি বলেছেন যে, 'অন দ্যা অকেশন অব রমজান' আমি এটা করবো। আমি জানি আমার উপর দিয়ে আরেকটা ঝড় বয়ে যাবে। সেই সবকে কেয়ার আমি করি না।' আমাদের আশা শিল্পী মুর্তজা বশীরের এই বলিষ্ঠ ঘোষণা এবং ক্যালিগ্রাফি বিষয়ে তার উৎসাহ আরও অনেক শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করবে এবং ক্যালিগ্রাফি শিল্প অন্যতম প্রধান শিল্প হিসেবে শিল্পপ্রেমী মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেবে।

লেখক : পরিচালক, বাংলাদেশ চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

অমুসলিমদের দৃষ্টিতে হযরত মোহাম্মদ (সা.)

সৈয়দ আশরাফ আলী

বর্তমান বিশ্বের প্রায় একশ' কোটি মুসলমান নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেন যে, হযরত মোহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন সর্বযুগের, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু এই দাবী যখন করা হয় তখন অমুসলিম কিংবা যারা ধর্মে আদৌ বিশ্বাস করেন না তারা অনেকেই প্রতিবাদ করেন, ভ্রুকুটি করেন এবং প্রয়োজনবোধে ব্যঙ্গ করেন। এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বা সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন 'ISM'-এর দ্বারা প্রভাবান্বিত মুষ্টিমেয় দুর্বলচিত্ত মুসলমানও এই দাবীর পটভূমিকায় উচ্চারণ করেন যে, আমরা মুসলমান বলেই নাকি এরূপ দাবী করছি। কিন্তু তাঁরা বোধ হয় জানেন না যে, আমাদের এই দাবী শুধুমাত্র ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দাবী নয়; এই দাবীর স্বীকৃতি দিয়েছেন উইলিয়াম ম্যুরের মত কঠোর ইসলামবিদ্বেষী, এই দাবীর স্বীকৃতি দিয়েছেন জন স্টুয়ার্ট মিলের মত Utilitarianism-এর একজন প্রখ্যাত প্রবক্তা, ঘোর নাস্তিক ও বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক। এই দাবীর স্বীকৃতি দিয়েছেন মহাত্মা গান্ধীর মত অহিংসবাদী, ধর্মপ্রাণ হিন্দু, এই দাবীর স্বীকৃতি দিয়েছেন বসওয়ার্থ স্মীথের মত ধর্মভীরু পাদ্রী। এই দাবীর স্বীকৃতি দিয়েছেন নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মত জগদ্বিখ্যাত বীর ও মনীষী, এই দাবীর স্বীকৃতি দিয়েছেন বার্নার্ডশ'র মত বিশ্বনন্দিত সাহিত্যিক। এই দাবীর স্বীকৃতি দিয়েছেন আলবার্ট আইনস্টাইন-এর মত সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী, এই দাবীর স্বীকৃতি দিয়েছেন গুরু নানকের মত উদারপ্রাণ ধর্মগুরু। যারা ইসলামের কথা শুনে উন্নাসিক হয়ে পড়েন, যারা মনে করেন যে, ইসলাম হচ্ছে মধ্যযুগের চিন্তাধারা এবং আধুনিক বিশ্বের অনুপযোগী, তারা যদি একটু খোঁজ রাখতে কষ্ট স্বীকার করেন, অজ্ঞতার মায়াজাল ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসার সামান্য প্রয়াস নেন, তাহলে দেখবেন যে, হযরত মোহাম্মদ (সা.)-কে মুসলমানরাই শুধু শ্রদ্ধা করে না, পৃথিবীর

www.pathagar.com

ইতিহাসে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বরাও মেনে নিয়েছেন তাঁকে যুগস্রষ্টা হিসেবে, মহামানব রূপে, এমনকি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে।

অমুসলিমদের দৃষ্টিতে ইসলামের নবী সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, হযতর মোহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে অমুসলিমদের মধ্যে এবং স্বল্পসংখ্যক তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছে তা আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। এটি হচ্ছে একটি সুপরিকল্পিত কুট চক্রান্তের ফল। 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'র মত নির্ভরযোগ্য প্রকাশনাও দাবী করছে: 'Few great men have been so maligned ad Muhammed Christain scholars of medieval Europe painted Muhammad as an imposter, a Lecher and a man of blood. A corruption of his name, Mahound, came to signify the divil. This picture of Muhammad and his religion still retains some influence'. একই এনসাইক্লোপেডিয়া হযরত মোহাম্মদ (সা.)-কে আবার চিহ্নিত করেছে 'জগতের ধর্ম-প্রবর্তকদের মধ্যে সর্বপেক্ষা সফলকাম পয়গম্বর' হিসাবে।

ইসলাম ও হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র যে কত সুপরিকল্পিত তার ছোট্ট একটি নিদর্শন মেলে মাইকেল হার্টের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'দি হানড্রেড এ র‍্যাঙ্কিং অফ দি মোস্ট ইনফ্লুয়েনশিয়াল পারসন্‌স ইন হিস্টরি' শীর্ষক গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি মাত্র ১১ বছর পূর্বে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর মধ্যেই এই বইটি তাপর্যময়ভাবে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপী, একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্তের দরুন। এর কারণ বোধহয় এই যে, এই বইটিতে মাইকেল হার্টের মত একজন বিশ্ববিখ্যাত অমুসলিম দাবী করেছেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল বিরল ব্যক্তিত্ব অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছেন তাদের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর স্থান সর্বশীর্ষে। তার ভাষায়:

My choice of Mhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be qestioned by others but he was the only men in history who was supremely successful on both the religions and secular levels.

তাঁর এই অভিমতের জন্য এই বইটির প্রায় সমস্ত কপিই মুসলিম বিদ্বেষীরা সংগ্রহ করে এমনভাবে বিনষ্ট করেছে যে, অনেকে মনে করেন, এ জাতীয় কোন গ্রন্থ নাকি আদৌ প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থটির 'রিভিউ' বা পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত 'নিউজ উইক' পত্রিকার ১৯৭৮ সালের ২১শে জুলাই তারিখের সংখ্যায়। তবুও এটি বিস্ময়ের ব্যাপার যে, মুসলিম বিদ্বেষীরা দাবী করেছেন, এ

www.pathagar.com

জাতীয় গ্রন্থ নাকি আদৌ প্রকাশিত হয়নি। এই ঢাকা শহরেই অল্প কয়েক বছর পূর্বে একটি সেমিনারে তথাকথিত 'আঁতেলেকচ্যুয়ালরা' এই বইয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেন। এ থেকে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, এক শ্রেণীর হযরত মোহাম্মদ (সা.) বিদ্বেষী লোকদের চক্রান্ত, দুরভিসন্ধি কত মারাত্মক ও কত ভয়ংকর ছিল। অথচ, মাইকেল হার্ট এই গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন :

This ranking dose not imply, of course, that I think Muhammad was greater man than Jesus.

কিন্তু তবু এই বইটি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কারণ, তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তো স্বীকার করতে পারেন না যে, ১৪শ' বছর পূর্বের পার্থিব অর্থে নিরক্ষর একজন আরব পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। তাদের 'ISM' তাঁদের আধুনিক শিক্ষা তাদেরকে তো এই সত্য স্বীকার করতে দেবে না।

কিন্তু কেন এই চক্রান্ত, কেন এই বিষোদগার? এর কারণ হযরত মোহাম্মদ (সা.) শুধুমাত্র আরবদের জন্য বা মুসলমানদের জন্যই প্রেরিত হননি। তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য, সকল সৃষ্টির জন্য রহমত– রাহমাতুল্লিল আলামীন। পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে: 'হে মানবকুল! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রাসূল বা প্রেরিত দূত'।

তাঁর পূর্বসুরীদের মত তিনি একটি জাতির জন্য, কোন একটি দেশের জন্য, কোন একটি সমাজের জন্য প্রেরিত হননি। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি বিশ্বজগতের সমস্ত সৃষ্টির কল্যাণের জন্যই প্রেরিত হয়েছেন।

অবশ্য এ দাবী শুধুমাত্র মুসলমানদেরই নয়। জর্জ বার্নার্ডশও দাবী করেছেন: 'মধ্যযুগের খৃস্টীয় ধর্মযাজকগণ তাঁদের অজ্ঞতা কিংবা গোঁড়ামির কারণে মোহাম্মদকে কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। বস্তুত তাহাদিগকে মানুষ মোহাম্মদ এবং তাহার ধর্মকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের কাছে মোহাম্মদ ছিলেন দজ্জাল। আমি তাহাকে অধ্যয়ন করিয়াছি– আশ্চর্য মানুষ তিনি। আমার বিশ্বাস, তাহাকে দজ্জাল না বলিয়া বরং মানব জাতির ত্রাণকর্তা বলাই উচিত। আমি বিশ্বাস করি, যদি তাঁহার মত কোন ব্যক্তি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করিতেন তবে তিনি ইহার সমস্যাগুলি এরূপভাবে সমাধান করিতে পারিতেন যাহাতে বহুল আকাঙ্খিত শান্তি ও সুখ ইহজগতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইতেন।'

গুরু নানক উল্লেখ করেছেন, 'এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ। সাধু, সংস্কারক, গাজী, পীর, শেখ ও কুতুবগণ অশেষ উপকার পাবেন যদি তাঁরা পবিত্র নবীর উপর দরূদ পাঠ করেন। মানুষ যে অবিরত অস্থির থাকে এবং নরকে যায় তার একমাত্র কারণ এই যে, ইসলামের নবীর প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নাই।'

www.pathagar.com

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্যার সিভি রমন বলেছেন, 'মোহাম্মদের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ও কলঙ্কহীন। মোহাম্মদ কখনও নিজেকে ভগবানের সমান বলে মনে করেননি। তার অনুসারীরা কখনও একবারের জন্যও বলে না যে, তিনি একজন মানুষের চেয়ে বেশী অন্য কিছু ছিলেন। তারা কখনও তাঁকে ঐশী সম্মান আরোপ করেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) অন্য যে কোন ব্যক্তির চেয়ে দুনিয়ায় অধিকতর মঙ্গল সাধন করে গেছেন।'

স্বামী বিবেকানন্দ 'দি গ্রেট টিচার্স অফ দি ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : 'তারপর আসেন সাম্যের দূত মোহাম্মদ! তুমি প্রশ্ন কর, তাঁহার ধর্মে কি ভাল আছে? যদি তাহাতে ভাল না থাকে, তবে কিরূপে তা বাঁচিয়া থাকে? কেবল ভালই বাঁচে, কেবল তাহাই টিকিয়া থাকে। এক অপবিত্র লোকের জীবন, এমনকি আমার এই জীবনেরও, কত কাল?

পবিত্র লোকের জীবন কি দীর্ঘ হয়? নিঃসন্দেহে, কারণ পবিত্রতা শক্তি, সৎস্বভাব শক্তি। মুসলমান ধর্ম কিরূপে বাঁচিয়ে রহিল যদি তাহার শিক্ষার কিছুই ভাল না থাকে? তাহাতে নিঃসন্দেহে বহু কিছু ভাল আছে। মোহাম্মদ ছিলেন সাম্যের পয়গম্বর, মোহাম্মদ ছিলেন মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের পয়গম্বর– সার্বজনীন বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের পয়গম্বর।'

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও সমালোচক এইচ. জি. ওয়েলস ইসলামকে কলুষিত করার চেষ্টা করেছেন। মহানবীকে তিনি নানাভাবে দোষারোপ করেছেন। অন্যায়ভাবে বিভিন্ন কলঙ্কে কলঙ্কিত করেছেন। তবুও তিনি স্বীকার করেছেন: 'দ্ব্যর্থবোধক কোন প্রতীক ছাড়াই, অন্যকে মসীলিপ্ত বা পুরোহিতগণের স্তুতি না করেই, মুহম্মদ সেই আকর্ষণীয় বিশ্বাসগুলি মানবজাতিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়েছিলেন। ইসলাম সৃষ্টি করেছিল এমন এক সমাজ, এর আগে দুনিয়ার অস্তিত্বশীল যে কোন সমাজের তুলনায় যা ছিল ব্যাপক নিষ্ঠুরতা ও সামাজিক অত্যাচার থেকে অধিকতর মুক্ত।'

অনেকের হয়ত ধারণা হতে পারে যে, অমুসলিম এই চক্রান্তের কাহিনী মুসলমানদের মনগড়া, তাদের কল্পনার ফলশ্রুতি। কিন্তু 'দি হানড্রেড' শীর্ষক মাইকেল হার্টের যে গ্রন্থটির বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি সম্পর্কে পুস্তকের দোকানে কিংবা গ্রন্থাগারে খোঁজ নিলে প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয়, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এমনকি এই এশিয়ারও বইয়ের কোন দোকানে এবং লাইব্রেরীতে সেটি পাওয়া যাবে না। মাত্র ১১ বছর পূর্বে প্রকাশিত 'দি হানড্রেড' গ্রন্থটি প্রায় কর্পূরের মত গায়েব হয়ে গেছে, মিশে গেছে ওমর খৈয়্যামের ভাষায় 'Yesterdays seven thousand years'-এর সঙ্গে। আরও একটি জ্বলন্ত

www.pathagar.com

দৃষ্টান্ত দ্বারা হয়ত উপলব্ধি হবে যে, ইসলাম বিরোধীরা ইসলামকে কিভাবে বাধা প্রদান করে। বিশ্ববিখ্যাত মুষ্ঠিযোদ্ধা ক্যাশিয়াশ ক্লে যখন সনি লিস্টনকে পরাজিত করে 'বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন' আখ্যা লাভ করেন তখন অমুসলিম সাংবাদিকরা তার বিষয়ের সংবাদ নির্দ্বিধায় পৃথিবীর প্রতিটি কোণে পৌছে দেন। কিন্তু এই একই ব্যক্তি পরবর্তী পর্যায়ে যখন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মোহাম্মদ আলী নাম গ্রহণ করেন, তখনই সেই সংবাদ সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয় মাসের পর মাস। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে থেকেও আমরা এ খবর জানতে পেরেছি বহু মাস পরে এবং সেটিও সম্ভব হয় মোহাম্মদ আলীর ব্যক্তিগত প্রয়াসের মাধ্যমে। 'বক্সিং-রিং' -এর মধ্যেই প্রতিপক্ষকে বার বার আঘাত করে তিনি জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, 'What is my name? What is my name?' তার এই উন্মত্ত রূপ দেখে সেদিন দর্শকরা এবং সাংবাদিকরাও সহজেই বুঝতে পেরেছিল, পৃথিবীও জানতে পেরেছিল যে, সত্যি তিনি আর ক্যাশিয়াশ ক্লে নন, তিনি তখন পুরোপুরি মুসলমান মোহাম্মদ আলীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। একই ভাবে আমরা আজও সঠিকভাবে জানিনা, চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পনকারী প্রথম মানুষ নীল আর্মস্ট্রং সত্যি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছেন কিনা। বৃটেন, ভারত, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে স্বীকৃত হয়েছে যে, নীল আর্মস্ট্রং ও মাইকেল কলিন্স ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। এই বাংলাদেশ থেকেও সরাসরি পত্র লেখা হয়েছে নীল আর্মস্ট্রং-এর কাছে। 'নাসা'-র কাছে এই সত্যের স্বীকৃতির জন্য পত্র মারফত বেশ কয়েকবার অনুরোধ জানান হয়েছে। কিন্তু সুস্পষ্ট কোন উত্তর, কোন স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। বলা বাহুল্য, আমাদের নবীর মহত্ত্বকে, প্রতিভাকে, ঔদার্যকে অমুসলিমরা যে স্বীকৃতি দিয়েছেন তা'ও সুস্পষ্টভাবে আমাদের কাছে পৌছতে দেয়া হয়নি।

১৮৪০ খৃস্টাব্দে প্রথমবারের মত পাশ্চাত্য জগতে ইসলামী বিরোধী এই মনোভাবের ব্যতিক্রম ঘটে যখন বিখ্যাত মনীষী টমাস কার্লাইল এডিনবার্গের বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে ৮ই মে তারিখে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেন ইসলামের নবীকে মহামানব হিসেব। HERO, HERO-WORSHIP AND THE HEROIC IN HISTORY সিরিজে বক্তৃতা প্রদানকালে 'HERO AS PROPHET' শীর্ষক আলোচনায় তিনি উল্লেখ করেন : Our current hypothesis about Mahommet, that he was a scheming Imposter, a Falsehood incarnate that his religion is a mask of quachery and fatuity, begins really to be untenable to us. The lies, which well-meaning zeal has heaped round this man, are disgraceful to ourselves only.

নিবেদিতপ্রাণ ও একনিষ্ঠ খৃস্টান ধর্মযাজক বসওয়ার্থ স্মীথও উল্লেখ করেছেন: ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনায়ক মোহাম্মদ ছিলেন একাধারে 'পোপ' ও 'সীজার'। কিন্তু পোপের

www.pathagar.com

অসম্ভব দাবী, অথবা সীজারের বিশাল সৈন্যবাহিনী কোনটিই তাহার ছিল না। যদি কোন মানুষ স্থায়ী সেনাবাহিনী, দেহরক্ষী, রাজপ্রাসাদ, নির্দিষ্ট রাজস্ব ছাড়া কেবলমাত্র ঐশ্বরিক অধিকার বলে রাজ্য শাসন করার দাবী করিতে পারেন, তবে মোহাম্মদই হইতেছেন সেই ব্যক্তি। সাধারণ রাজপুরুষগণ, এমনকি নেপোলিয়ন, ক্রমওয়েল ও সীজারের ন্যায় শক্তিমান পুরুষগণও ক্ষমতার প্রলোভন ও আকর্ষণ হইতে নিজদিগকে দূরে রাখিতে পারেন নাই। মোহাম্মদ পূর্ণ বিনম্রতায় রাজদরবারের ঐশ্বর্য, আড়ম্বর ও আত্মাভিমানের অনেক উর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন। তিনি ক্ষমতার আড়ম্বরের কোন মূল্য দেন নাই। তিনি কেবল মূল্য দিয়াছেন সত্যের। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ, এমনকি তাহার শত্রুগণও যাহারা তাহার বাণীকে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহারাও একবাক্যে প্রতিটি বিষয়ে তাহার ন্যায়পরায়ণতা, দয়ার্দ্রচিত্ততা ও সত্যনিষ্ঠার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে এক বিশেষ সৌভাগ্যের বলে তিনি একধারে একটি ধর্ম, একটি জাতি ও একটি সাম্রাজ্যের স্থপতি। যদিও তিনি নিরক্ষর ছিলেন এবং লিখিতে-পড়িতে পারিতেন না, তবুও তিনি ছিলেন এমন একটি গ্রন্থের রচয়িতা যাহা একাধারে একটি কাব্যগ্রন্থ, আইনশাস্ত্র, প্রার্থনা পুস্তক ও 'বাইবেল' এবং আজও পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসী যাহাকে নিখুঁত রচনা কৌশল, জ্ঞান-গর্ভতা ও সত্য জ্ঞানের প্রেরণার দিক দিয়া অলৌকিক বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। মোহাম্মদ ইহাকে একটি অলৌকিক বস্তু বলিয়া দাবী করিয়াছেন এবং সত্যই ইহা ছিল একটি অলৌকিক সৃষ্টি। তিনি যে দাবী লইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন জীবনের সায়াহ্ন অবধি সেই দাবী লইয়া তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। ইহা অপেক্ষা তাহার সততা ও আন্তরিকতার বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে? আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, একদিন না একদিন প্রকৃত খৃস্টধর্ম ও জগতের শ্রেষ্ঠতম দর্শনও তাহাকে ঈশ্বরের একজন আদর্শ পয়গম্বর আখ্যা দিতে বাধ্য হইবে।"

প্রজাপতির পাখার মত বর্ণাঢ্য ছিল মহানবীর জীবন। অসাধারণ ছিল তাঁর প্রভাব। অনুপম ছিল তাঁর আদর্শ। এতদসত্ত্বেও বাস্তবানুগ, অনুকরণীয়, সহজ-সরল, স্বাভাবিক ছিল তাঁর চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, বর্ণিল কর্মকাণ্ড। নবী করীম (সা.)-এর সামগ্রিক জীবনের একটি সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে মনীষী স্ট্যানলি ল্যানপুলের অপূর্ব ভাষায় :

'এই মানুষটির মধ্যে একদিকে নারীসুলভ কোমলতা ও অন্যদিকে পৌরষব্যঞ্জক তেজস্বিতার এমন সমাবেশ ছিল যে, এরূপ চরিত্র মানুষের মনে যে প্রেম ও ভক্তিভাব জাগাইয়া তোলে তাহাতে সমালোচক নিজের অজ্ঞাতসারেই অভিভূত হইয়া পড়েন এবং তাহার পক্ষে সঠিক রায় দান দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নিঃসঙ্গভাবে তাঁর স্বজাতির ঘৃণা-বিদ্বেষ

www.pathagar.com

সহ্য করিয়াছেন, আবার তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি করমর্দনের সময় অপরের হাত হইতে নিজের হাতকে কখনও প্রথমে সরাইয়া লন নাই। শিশুদের পরম প্রিয় সেই ব্যক্তিটি কখনও তাহার মনোরম লোচনের মৃদু হাসি এবং তাঁহার মধুর কণ্ঠের মধুরতর সম্বোধন ছাড়া শিশুদের পাশ দিয়া যান নাই। সেই মানুষটির অকপট বন্ধুপ্রীতি, মহান ঔদার্য, অসমসাহসিকতা ও আশাবাদ ইত্যাদি গুণাবলী সমালোচনাকে স্তুতিবাদে পরিণত করে।'

'তিনি সেই অর্থে একজন ভক্ত ছিলেন যখন ভক্তিই হয় পৃথিবীর সারবস্তু, যাহা মানব জীবনকে পচনের হাত হইতে রক্ষা করে। যখন জগতকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য ভক্তির একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল, তিনি সেই সময়েই একজন ভক্তের বেশে আভির্ভূত হন এবং তার ভক্তি ছিল মহৎ উদ্দেশ্যে নিবেদিত। যেই সামান্য কয়েকজন ভাগ্যবান মানুষ একটি বিরাট সত্যকে জীবনের মূল উৎসরূপে বিবেচনা করার পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি তাহাদেরই অন্যতম। তিনি ছিলেন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর দূত। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আত্মবিস্মৃত হন নাই এবং তার অস্তিত্বের নির্যাসস্বরূপ ছিল যে বাণী সেই বাণীকে তিনি বিসর্জন দেন নাই। তিনি নিজের দীনতাবোধ হইতে উদ্ভূত মধুর নম্রতা ও বিরাট কর্তব্যানুভূতি সম্বলিত মর্যাদাবোধের সহিত তাঁহার জাতির নিকট আপন বারতা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন।'

প্রেক্ষিতে, নিতান্তই স্বাভাবিক যে, জন উইলিয়াম ড্রেপারের মত বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিকও তার 'এ হিস্টরী অফ দি ইনটেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট অফ ইউরোপ' শীর্ষক গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষার স্বীকার করেছেন যে:

'হজরত মোহাম্মদ মানব ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।' তার ভাষায় : 'Four years after the death of Justinian, in A.D. 569, was born at Mecca, in Arabia, the man (Muhammad) who, of all men, has exercised the greatest influence upon the human race.'

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিকও ঐতিহাসিক লামার্টিনও তাঁর 'Histoire de la Turques' গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে: 'যে কোন মাপকাঠিতেই মানব-মহত্ত্ব বিচার করা হোক না কেন, আমরা সহজেই জিজ্ঞাসা করতে পারি– কোন মানুষ কি তাঁর (মহানবীর) চেয়ে মহৎ ছিলেন?'

লেখক: বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

বিশ্বনবী (সা.)
প্রসঙ্গ কাব্য সাহিত্য

এম, এ, রশীদ চৌধুরী

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। দরূদ ও সালাম নবী মুহাম্মদের (সা.) প্রতি। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত মশহুর হাদীস অনুযায়ী 'বিশ্বনবী (সা.) ছিলেন জীবন্ত কোরআন'। আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, 'এ কিতাবে আমি কোন কিছু বাদ দেইনি'। আবার বিশ্বনবী মুহাম্মদের (সা.) কোন কাজ, কোন কথা কোরআনে পাকের অনুমোদন ছাড়া নেই। তাই কাব্য সাহিত্য প্রসঙ্গে মহানবী মুহাম্মদের (সা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করতে গেলে আল কোরআনের কাছেই যেতে হয়।

পবিত্র কোরআনে সূরা আশ্-শুআরা অর্থাৎ 'কবিগণ' নামে কোরআনের ২৬ নম্বর সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। সূরা আশ্-শুআরার শেষ রুকুর শেষ আয়াতগুলো হলো : '(২২০) নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। (২২১) আমি আপনাকে বলব কি কার নিকট শয়তান অবতরণ করে? (২২২) তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গোনাহগারের উপর। (২২৩) তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (২২৪) বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। (২২৫) আপনি কি দেখেন না তারা প্রতি ময়দানেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? (২২৬) এবং এমন কথা বলে যা তারা করে না। (২২৭) তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়িনকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ!'

আল কোরআনের ভাষাশৈলী, বাচনভঙ্গী, ছন্দময়তা এতো উন্নত যে, যার তুলনা নেই। যদিও এটা কোন কাব্যগ্রন্থ নয়। আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিতে এই ছন্দময়তা

www.pathagar.com

বিরাজমান। প্রতিদিনের সূর্যোদয় এবং অস্তগমন থেকে শুরু করে সমুদ্র স্রোত, বায়ু প্রবাহ, জোয়ার-ভাটা, পাখির কলরব, মৌমাছির গুঞ্জরণ, এমনকি ইলেক্ট্রন, নিউট্রন এবং প্রোটনের মধ্যেও সেই অনাবিল ছন্দময়তা বিজ্ঞানীরা অবলোকন করে যে নিপুণ নিয়মতান্ত্রিকতা আবিষ্কার করেছেন তাতে গোটা বিশ্বকে একখানা অপূর্ব কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আমরা জানি তৎকালীন আরব সমাজ, যাকে আইয়ামে জাহেলিয়াত বলা হয়, প্রায় সব দিক থেকেই কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে তাদের উৎকর্ষতা আজও প্রবাদের মতো। তাদের সকল সাহিত্যকর্ম ছন্দময় বাক্যে লিপিবদ্ধ ছিল। উকাজের মেলায় গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কবিতা আবৃত্তি করতেন, শুনতেন। প্রতি বছর কাবার দেয়ালে সুদৃশ্য মিশরীয় বস্ত্রে সোনালী অক্ষরে লিপিকৃত সে বছরের শ্রেষ্ঠ সাতটি কবিতামালা ঝুলিয়ে রাখা হতো; যা 'ঝুলন্ত কাব্য সপ্তক' নামে পরিচিত ছিল। যদিও কাব্যগুণে ঐসব কবিতা অত্যন্ত উন্নতমানের ছিল কিন্তু ওগুলো শিরক এবং অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ থাকতো। মক্কা বিজয়ের পর এই প্রথা পরিত্যক্ত হয়। বর্তমানে কাবার গেলাফে অপরূপ সৌন্দর্যে শোভা পায় আল কোরআনের বাণী। সুদৃশ্য কেলিগ্রাফিতে কালো বস্ত্রের উপর সোনালী রংয়ের রেশমী সূতার কারুকাজে আল্লাহর বাণীসমূহ কি অপার মহিমায় ফুটে উঠে। বারবার ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে। কি বিরাট এবং মহিমান্বিত পরিবর্তন। নিজ চোখে এবং অন্তরদৃষ্টি দিয়ে না দেখলে এই অপরূপ সৌন্দর্যের সৌরভ উপলব্ধি করা যায় না। আমার আফ্সোস হয়, নজরুল, ফররুখদের মতো কবিরা যদি এই মহিমান্বিত দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পেতেন, তাহলে তাঁদের কাব্য, সঙ্গীত, হামদ, না'ত এদেশের মানুষকে আরো বেশীভাবে আল্লাহ এবং রাসূলপ্রেমে মতিয়ে রাখতো।

কবিদের একটি অন্তরদৃষ্টি থাকে। তা দিয়েই তাঁরা অনেক কিছু দেখতে পান। তাই হয়তো স্বচক্ষে না দেখেই তাঁরা এমন সুন্দর বর্ণনা তাঁদের কবিতা ও সঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। যেমন, নজরুল গেয়েছেনঃ

'বক্ষে আমার কাবার ছবি
চক্ষে মোহাম্মদ রসূল
শিরোপরি মোর খোদার আরশ
গাই তারি গান পথ বেভুল।' অথবা,

'খোদার হাবিব হলেন নাজেল খোদার ঘর ঐ কাবার পাশে
ঝুঁকে পড়ে আর্শ কুর্শী, চাঁদ সুরুয তাঁয় দেখতে আসে॥
ভেঙ্গে পড়ে মূরত মন্দির, লা'ত-মানাত, শয়তানী তখত
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র উঠিছে তকবীর আকাশে॥
খুশীর মউজ তুফান তোরা দেখে যা মরুভূমে

www.pathagar.com

কোহ-ই তূরের পাথরে আজ বেহেশতী ফুল ফুটে হাসে।'
ফররুখ বারবার বলেছেনঃ
'তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজতোরণ।' অথবা
'নাইতো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া
তৌহিদ সুর জাগায় সাড়া, জাগায় সাড়া।' অথবা
'তোমার কাবা, তোমার কোরআন
হয়নি আমার জানা
জ্ঞানের আলোয় করো উজল হৃদয়– রাব্বানা।'

আজও জাহেলিয়াত যুগের কবি ইমরাউল কায়েস প্রমূখের কবিতা মাদ্রাসায় পড়ানো হয়। আরবী কাব্য-সাহিত্যে এদের স্থান শেক্সপীয়ারের মতো। কারণ কাব্যগুণে এগুলো কালোত্তীর্ণ। কিন্তু এই কাব্য চর্চা তৎকালীন আরব সমাজকে শয়তানের প্ররোচনায় জাহেলিয়াতের অতল গহ্বরে নিয়ে গেল। কারণ এই অপূর্ব শিল্প মাধ্যমকে তারা মদ্যপান, অশ্লীলতা, প্রতিহিংসা, অপবাদ, গীবত, যুদ্ধ, উন্মাদনা, যৌন উত্তেজনা, ব্যক্তিবন্দনা, মিথ্যাচার, অহংকার, মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে সামান্য কারণে ক্ষেপিয়ে তোলা, নারীদেহের অশ্লীল বর্ণনা, প্রকৃতি ও প্রতিমা পূজা, মিথ্যা বংশগৌরব ও ভোগবাদী সমাজ সৃষ্টিতে ব্যবহার করতো। তারা সমগ্র সমাজকে কবিতামুখী করে তুলেছিল। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের বর্তমান কবিদেরও অনেকে এ ব্যাপারে আজ মোটেই পিছিয়ে নেই। তার প্রমাণ আমাদের হাতের কাছে, যা আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পাচ্ছি।

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে রাসূল (সা.)-এর সাহবাগণ ছিলেন কাব্যপ্রেমিক। সূরা আশ্ শু'আরার 'কবিগণ' সংক্রান্ত উক্ত আয়াতগুলো নাযিলের পর সাহাবী কবিবৃন্দ ক্রন্দনরত অবস্থায় ছুটতে ছুটতে রাসূল (সা.)-এর দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। রাসূল (সা.) তাদের এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, 'সূরার শেষ অর্থাৎ ২২৭ নম্বর আয়াতটি পড়ো।' ২২৭ নম্বর আয়াতটি ছিল: 'তবে তাঁদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে আর নিপীড়িত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ?' কত সুন্দর এবং মহৎ অভয়বাণী! এই সূরার প্রত্যেকটি আয়াত এত চিরন্তন যে, মনে হয় যেন এগুলো এ যুগেই নাযিল হয়েছে। এ আয়াতগুলো সকল যুগের কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীতসহ সকল প্রকার শিল্প সাধনার সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত। সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়। সূরার শুরুতেই আল্লাহ পাক '(১) ত্বা, সীন, মীম'-এর কোডওয়ার্ড দ্বারা সত্যায়ন করে বললেন, '(২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।' আবার শেষ

www.pathagar.com

রুকুর শুরুতে বললেন, '(১৯২) এই কোরআন তো বিশ্ব জাহানের রবের নিকট থেকে অবতীর্ণ। (১৯৩) বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেন। (১৯৪) আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। (১৯৫) এর ভাষা সুস্পষ্ট আরবী।' এরপর ২১০ থেকে ২১৩ এই চারটি আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করা যাক, '(২১০) এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করেনি। (২১১) তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। (২১২) তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (২১৩) অতএব, আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন।' এতে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহপাক আল কোরআনের প্রত্যেকটি বাণীকে শয়তানের প্রভাব থেকে কিভাবে সংরক্ষিত করে রেখেছেন।

আরবের মুশরিকগণ রাসূলকে (সা.) পাগল, জ্বীনেধরা, যাদুকর এবং অন্য কারো শিখিয়ে দেয়া বাণী প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। এমনকি, বর্তমান বিশ্বে শয়তানের অনুসারী কিছু বুদ্ধিজীবী, লেখক, সমাজপতি এবং ভাষ্যকাররা উপরোক্ত ধারণাগুলো নবী করীমের (সা.) ব্যাপারে সূক্ষ্মভাবে প্রচার করতে চায়। তাই দেখা যায়, আলোচ্য সূরায় উল্লেখিত শয়তান অবতরণের ব্যাপারটা শুধুমাত্র কবিদের প্রসঙ্গে আসেনি। এসেছে ব্যাপকভাবে সকল বাতিল আদর্শ, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং খেয়ালী ভাষ্যকারদের প্রতি। যাদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রসারকারী বলে পরিচয় দানকারী, আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্ত তথাকথিত আলেম সমাজের একটি অংশও অন্তর্ভুক্ত। তাই বলছিলাম, শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপারে বুঝতে হলে অন্তত: এই সূরাটি অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে সকলের অধ্যয়ন করা জরুরী।

নবী করীম (সা.)-এর সাথী কবিবৃন্দের অন্যতম ছিলেন হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.), আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.), কা'ব বিন মালিক (রা.), লবিদ ইবনে রাবিয়া (রা.) প্রমূখ। একবার কা'ব বিন যুহায়ের (রা.)-এর একটি কবিতা শুনে নবী করীম (সা.) এতই খুশী হয়েছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ আপন গায়ের থেকে নিজের চাদরখানি খুলে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। চাদরখানি এখনও তুরস্কের জাতীয় মিউজিয়ামে সুরক্ষিত আছে। অথচ এই কা'ব বিন যুহায়ের (রা.) এক সময় ইসলামের কুৎসা রটনাকারী কবিদের অন্যতম নেতা ছিলেন। আসলে তৎকালীন আরব সমাজে কবিদের প্রাধান্য এবং সংখ্যা ছিল প্রচুর। দ্বীনের দাওয়াত পাওয়ার পর দেখা গেল সেই কবিদের একটি বিপুল অংশ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল। ফলে মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন মানুষ একদল জান্নাতী ও অপর দল জাহান্নামী এ দু'টি ভাগে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত হয়ে গেল, তেমনিভাবে কবিরাও দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে। আর এ বিভাজনের মানদণ্ড হলো 'কবিগণ' সূরায় বর্ণিত কয়েকটি বিশেষ গুণ। এভাবে কোরআনে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করে

www.pathagar.com

তৎকালীন কবিদের বিশাল অংশ ইসলামে দাখিল হওয়ার কারণেই দেখা যায়, নবী করীম (সা.)-এর সাহাবীদের একটি বিশাল অংশ মূলত: উচ্চস্তরের কবি ছিলেন।

কোরআনের উক্ত সূরার ২২৭ নম্বর আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মহান আল্লাহ কবিদের মাত্র চারটি গুণে বিভূষিত হয়ে কল্যাণের ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে বলেছেন। চিরন্তন কল্যাণের পথে এগিয়ে চলা এ কবিগণ প্রথমেই আল্লাহর ওপর ঈমান আনে। দ্বিতীয়ত তারা সৎকর্ম করে। তৃতীয়ত তারা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং সর্বশেষ ও চতুর্থত তারা নিপীড়িত হলে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উচ্চকিত হয়। মূলতঃ যে কোন মানুষের জীবনকে সফল করতে হলেই এ চারটি কাজ তাকে করতে হবে। তবে কবিদের জন্য আল্লাহ বিশেষ করে এ চারটি কাজ করার কথা উল্লেখ করেছেন এ জন্য যে, যখন কোন মানুষ ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তখনই সে মুসলিম দলভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কবিরা ভাবুক ও কল্পনাবিলাসী হওয়ার কারণে নেক আমলে তাদের ভুলভ্রান্তি হওয়ার অবকাশ থাকে। এ ধরনের ভুল থেকে কবিরা যেন বেঁচে যেতে পারে এ জন্য তাদেরকে বলা হয়েছে বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করার কথা। আল্লাহর স্মরণ মানুষকে যাবতীয় পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। এরপর আল্লাহ কবিদের একটি বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। বলেছেন, নির্যাতীত হলে প্রতিবাদ করার কথা। আয়াতের এ অংশ কবিদের স্মরণ করিয়ে দেয়, সমাজে অন্যায়, অসঙ্গতি ও নির্যাতন দেখলে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া কবিদের নৈতিক দায়িত্ব। এ জন্যই দেখা যায়, পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজ বিপ্লবের প্রাথমিক ডাক দিয়েছে কবিরা। কারণ আল্লাহ সমাজের গতিধারা অনুধাবন করার যে বিরল ক্ষমতা কবিদের দিয়েছেন, তা অন্যদের দেননি। কবি-সাহিত্যিকরা আযান দেয়, মুসল্লিরা সমবেত হলে তাদের ইমামতি করার জন্য এগিয়ে যায় রাজনৈতিক নেতারা, এটাই সভ্যতার ইতিহাস।

রাসূল (সা.) নিজে কবি ছিলেন না। আল্লাহপাক বলেন, 'কবিতা চর্চা তাঁর কাজ নয়, এটা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়'। কারণ রেসালাতের যে মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য তাঁকে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে সে দায়িত্ব ফেলে রেখে কেবলমাত্র মানবতুষ্টির জন্য কাব্যচর্চা করা তাঁর দায়িত্ব ও মর্যাদার পক্ষে মানানসই নয়। কারণ তিনি কবি নন, নবী। যার মর্যাদা কবিত্বের মর্যাদার চাইতেও অনেক অনেক গুণ বেশী। মর্যাদার সে সুমহান স্তর থেকে কবিত্বের সংকীর্ণ এবং মানবীয় মর্যাদায় তাঁকে অভিষিক্ত করা কিছুতেই সমীচীন ও সঙ্গত হতে পারে না।

কিন্তু তার মানে এ নয় যে কাব্য রসের সাথে তাঁর কোন পরিচয় ও সংযোগ ছিল না। বরং সীরাতে রাসূল থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন কবিতার একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুরাগী। তিনি কবিতার ভাষা এবং শব্দ চয়ন খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন।

www.pathagar.com

প্রয়োজনবোধে কবিতার শব্দ পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়ে সাহাবা কবিবৃন্দকে শিরক অথবা সন্দেহবাদ থেকে মুক্ত করতেন।

ইসলামের সোনালী যুগের তরুণ কবিগণকে হযরত ওমর (রা.) জাহেলিয়াত যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো পড়ে নেয়ার তাগিদ দিতেন। কেননা, তুলনামূলক পঠন-পাঠন যে কোন কাব্যের গুণগত তারতম্য সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য অপরিহার্য বলে তিনি মনে করতেন।' তাই ঐসব কবিবৃন্দ আল কোরআনের রচনাশৈলীর প্রভাবে এবং সূরা আশ্ শু'আরার শেষ অর্থাৎ ২২৭ নম্বর আয়াতের অনুপ্রেরণায় এক অনাবিল উন্নত কাব্য সম্ভারে বিশ্বের কাব্য সাহিত্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। বহুকাল ধরে মুসলিম কাব্য সাহিত্যে জাহেলিয়াত যুগের কাব্য চর্চার অমানবিক এবং অশ্লীল দিকগুলো বর্জন করা হয়েছে। সেই সূত্র ধরে আমরা পাই রুমী, সা'দী, হাফিজ, ইকবাল, হালী, নজরুল, ফররুখ প্রমুখের মতো কালজয়ী কবিগণকে।

সাহাবা কবিবৃন্দ একদিকে আল কোরআনের মাধুর্যমণ্ডিত ভাষা, অনন্য শব্দ ঝংকার, ছন্দময়তা এবং অপূর্ব রচনাশৈলী, অন্যদিকে জাহেলিয়াত যুগের কবিতার ছন্দ ও শৈল্পিক উৎকর্ষতাকে আত্মস্থ করে কাব্য ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লব সাধন করেন। তারা ছিলেন সূরা আশ্ শুআরার শেষ আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মু'মিন কবি। যাদের প্রভাব বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান কবিগণের উপর কম-বেশী বিদ্যমান ছিল। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে শিরক এবং অশ্লীলতা তাঁদের কবিতায় তেমন পরিলক্ষিত হয় না। কোন কোন মুসলমান নামধারী কবি 'প্রতি ক্ষেত্রে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ময়দানে ঘুরে ফিরেছেন এবং বিভ্রান্ত লোকেরা তাদের অনুসরণ করে' সমাজে শিরক এবং নাফরমারীর বিস্তার ঘটিয়েছে। কিন্তু অশ্লীলতার প্রসার তখনও এতোটা ব্যাপক হয়নি। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমণ্ড ফ্রয়েড প্রমুখের প্রভাবে পাশ্চাত্যে অশ্লীলতার সয়লাব বয়ে যায়। চার্লস ডারউইন এবং কার্ল মার্কস প্রমুখের মতবাদ এতে ইন্ধন যোগায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই জোয়ার মুসলিম বিশ্বে অবারিতভাবে প্রবেশ করে। কারণ প্রায় সমগ্র মুসলিম জাহান তখন ছিল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যের করতলগত। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পাশ্চাত্যের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সংস্কৃতিসেবীগণ আধুনিক বিশ্বে অশ্লীলতা এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয় যাতে সমাজে নগ্নতা মহামারীর আকার ধারণ করে। ফলে সমগ্র বিশ্বে নারী ধর্ষণ, ছিনতাই, হত্যা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভয়াবহরূপে দেখা দেয়। বর্তমান মিডিয়া বিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র এই আধুনিক জাহেলিয়াতের বিস্তার ঘটেই চলেছে।

অপরদিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার অনেক সুফল মানুষের সহজ যাতায়াত ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদান অতি সহজে সত্যকে জানার এবং উপলব্ধি করার অনেক সুযোগ করে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশের কাব্য-সাহিত্যের

www.pathagar.com

অজস্র অনুবাদসহ আল কোরআনের বহু মূল্যবান তফসীর গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে। ইসলামের মৌলিক আকায়েদ অনুযায়ী সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কাব্য-সাহিত্য, সংস্কৃতির রূপরেখাসহ অনেক গ্রন্থ রচিত, অনূদিত ও প্রচারিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতেই। রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, সবকিছুতেই ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যার ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে শীতল যুদ্ধ বিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে, সে রকম প্রজ্ঞার একটি প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে ইসলাম এবং জড়বাদের মধ্যে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই এর একটা ফয়সালা হয়ে যাবে বলে মনে হয়। প্রতিদিনের বিশ্ব সংবাদ পর্যবেক্ষণ করলে এর আলামত পাওয়া যায়। আমাদেরকে এই প্রজ্ঞার যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে আল কোরআনের কাছে ফিরে যেতে হবে। এ ব্যাপারে কাব্য-সাহিত্যের একটি বড় ভূমিকা আছে। তাই বিশ্বের কাব্য ভাণ্ডার সম্পর্কে না হলেও আমাদের কবি ও কবিতার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। আরো একটি ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, তা হলো প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা ও প্রজ্ঞার প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার আশংকা। অপপ্রচার ছাড়াও উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন জাতি পেশী শক্তিতে বিধ্বস্ত করার প্রয়াস নিতে পারে প্রতিপক্ষকে। সূরা আশ্ শু'আরা এ কথাটিই বার বার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

২.

আরবী কবিতার বাংলা অনুবাদসহ কবিতা পড়া আমার প্রায় নিত্যদিনের অভ্যাস। তাই আমি শেক্সপীয়ার, হুইটম্যান, এজরাপাউণ্ড, ইলিয়ট, শেলী, কীট্স থেকে শুরু করে রুমী, ইকবাল, হালী, নজরুল, ফররুখ, সৈয়দ আলী আহসান, তালিম হোসেন, আহসান হাবীব, আশরাফ সিদ্দিকী, দিলওয়ার, শামসুর রাহমান, আল-মাহমুদ, আফজাল চৌধুরী, ওমর আলী, আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, ত্রিদিব দস্তিদার এবং একেবারে সাম্প্রতিক কালের কবিদের কবিতা অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করে থাকি। এ জন্যই হয়তো সূরা আশ্ শু'আরার তাৎপর্য আমার কাছে এমন পরিষ্কার এবং প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে। সালমান রুশদীর 'দি স্যাটানিক ভার্সেস' আমি ভালভাবে পড়েছি। তাই আমি বুঝতে পারি শয়তান কাদের ওপর অবতরণ করে। আল্লাহর অসীম রহমতে আমি বিভ্রান্ত হইনি। আল কোরআনের বাণীর ওপর আমার প্রত্যয় আরো দৃঢ় হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। তাই আমি শামসুর রাহমানদের অরুচিকর কবিতার নিন্দা করি, সালমান রুশদী, দাউদ হায়দারদের অর্থলিপ্সা ও প্রচারমোহকে ঘৃণা করি। ওদের লেখার ছত্রে ছত্রে শয়তানের সূক্ষ্ম

www.pathagar.com

কারুকার্য প্রত্যক্ষ করি। দেখতে পাই তাদের মিথ্যার বেসাতি। আমি চিনতে পারি ওদের উদভ্রান্ত অনুসারীদের। স্বরূপ উদঘাটনের জন্য আমি তাদের অশ্রাব্য কবিতার উদ্ধৃতি দিতে চাই না। পাঠকরাই পড়ে দেখবেন। ওদের অনেককেই মনে হয় জাহেলিয়াত যুগের কাব্যসভার সদস্য। সূরা আশ্ শুআরার আলৌকিক বাণী মনে করিয়ে দেয়, সকল যুগেই একশ্রেণীর কবি মিথ্যাবাদী এবং শয়তানের অনুসারী হয়। তাদের দাম্ভিকতাপূর্ণ পদচারণায় সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তও হয়। এদের হালুয়া-রুটির অভাব হয় না। রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র যে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ওরা সামনের সারিতে স্থান করে নেয়। কারণ তোষামোদ ও ব্যক্তিবন্দনা তাদের মজ্জাগত। অশ্লীলতার আকর্ষণে এরা তরুণ-তরুণীদের সর্বনাশ করে। তারা সভা সমিতিতে অনেক সময় নীতিকথা শোনায় যা তারা নিজেরা অনুশীলন করে না। আল কোরআনের স্পষ্ট বাণীকে ওরা মানতে চায় না। আল্লাহ ও ফেরেশতায় ওদের বিশ্বাস নেই। নেই আস্থা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে। ওরা ভোগ বিলাসী। কিন্তু একটি ব্যাপারে ওরা বড় অসহায়। সত্যকে দেখলেই ওরা আঁতকে ওঠে। কারণ ওদের সৎ সাহস নেই। সত্যকে ওরা বড় বেশী ভয় পায়। রুখে দাঁড়ালে ওরা গা ঢাকা দেয়, ভোল পাল্টায়। শিল্পের গোলক ধাঁধায় বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের প্রতি ওদের দরদ উগড়ে দেয়। কিন্তু তাদের ব্যক্তি জীবন পর্যবেক্ষণ করলেই সে কপটতা ও মুনাফেকী ধরা পড়ে যায়। তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে ব্যক্তিগত জীবনকে 'প্রাইভেট এ্যাফেয়ার' বলে আড়াল করতে চায়। সাহিত্য, কবিতা, সঙ্গীত, নাটক, শিল্প, ভাস্কর্য ওদের কৃতকর্মের বাহন।

আদিকাল থেকে কাব্য চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সুনির্দিষ্ট আদর্শের অভাবে প্রায় সকল যুগেরই এক শ্রেণীর কবি বিভ্রান্ত হয়ে উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়। সেই সুযোগে শয়তান তাদের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে সমাজে শিরক, অশ্লীলতা এবং মিথ্যার রাজত্ব চালায়। পক্ষান্তরে, আলোচ্য সূরার সর্বশেষ আয়াতে সত্য ও সুন্দরের সৈনিক কবিদের গুণাগুণ ও পরিচয় অতি স্পষ্ট। তাঁরা হলেন প্রত্যয়দীপ্ত ঈমানদার, সৎকর্মশীল, পরহেজগার ও চরিত্রবান মানুষ। আল্লাহর স্মরণে তাঁরা সদা মশগুল থাকেন। তবে অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণকে গুঁড়িয়ে দিতে তারা পিছপা হন না। ওদের মসীই তখন অসিতে রূপান্তরিত হয়। তারা ইলহামের সাহায্যে ভবিষ্যত দ্রষ্টা। জ্যোতিষী কিংবা গণককে তারা উপেক্ষা করেন। ইহজাগতিক চাকচিক্যে তাঁরা অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁদের রচনা শিল্পোত্তীর্ণ কিন্তু বল্গাহীন নয়। মুক্তচিন্তায় তাঁরা বিশ্বাস করেন কিন্তু কপটতায় নয়। শিল্পের সীমানায় যেমন তাঁরা সূক্ষ্ম কারিগর, তেমনি প্রতিটি ক্ষেত্রে 'সীমালংঘনের' ভয়ে সদা সতর্ক। নবী করীম (সা.)-এর সাহাবী কবিবৃন্দের কবিতা পাঠ করলে উক্ত আয়াতের তাৎপর্য গভীরভাবে করা অনুধাবন করা যায়।

www.pathagar.com

৩.

বাংলা কবিতা ও সঙ্গীতের যিনি মুকুটহীন রাজা, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য-সাহিত্য এবং তার জীবন চরিত পর্যালোচনা করলে অনেকের কাছেই বেশকিছু অসংগতি চোখে পড়তে পারে। তাঁর রচনায় হিন্দু 'পুরাণে'র বিষয়বস্তু, শব্দসম্ভারের ব্যাপকতা দেখে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু এগুলো একটু গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, ইসলামসহ পৃথিবীর প্রধান ধর্ম এবং মতবাদ সম্পর্কে তাঁর প্রজ্ঞা কত সুগভীর ছিল! শুধু তাই নয়, শব্দ ও ভাষায় এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, ভাষা, ছন্দ, রচনাশৈলী পর্যালোচনা করলে তিনি যে বিভ্রান্তির উপত্যকা ঘুরে এসে স্থিতি লাভ করেছিলেন ২২৭ নম্বর আয়াতের মুমীন কবিদের সারিতে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইসলামের উদার মানবিকতার সুর বাঙ্ময় হয়ে উঠে এসেছে তাঁর কাব্যে, তাঁর রচনায়। আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের ব্যাপারে তিনি কতটা অবগত ছিলেন তাঁর ইসলামী কবিতা ও সঙ্গীত অধ্যয়ন করলে তা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তাঁর 'কাব্যে আ'মপারা' এবং অসম্পূর্ণ 'মরু ভাস্কর' পাঠ করলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

কবিদের স্বভাব বৈশিষ্ট আল্লাহর বেশি আর কেউ জানেন না। তাদের মধ্যে স্বপ্ন ও কল্পনার গুণ তিনিই দিয়েছেন। এ গুণাবলী না থাকলে কারো পক্ষে কাব্যচর্চা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ স্বপ্ন ও কল্পনার জগতে বিচরণের ক্ষেত্রে তারা কতদূর যেতে পারবে তার একটি সীমারেখা আল্লাহ টেনেছেন চারটি গুণের উল্লেখ করে। তারা আকাশ, পাতাল, মর্ত্য সর্বত্র কল্পনার পাখা বিস্তার করে ছুটে যেতে পারবে, কিন্তু ঈমান, সৎ আমল এবং আল্লাহর স্মরণের সাথে সাংঘর্ষিক কোন ময়দানে যাওয়া তাদের জন্য বারণ। কখনো তেমন কোন পদস্খলন ঘটলে তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসাটাই প্রকৃত ঈমানের দাবী। নজরুল জীবনের অসঙ্গতিগুলো এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করাই অধিক সঙ্গত। কবি চিত্তের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের জোয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলে এ ধরনের অসঙ্গতি কবিদেরকে আক্রান্ত করতে পারে– এ আশংকা থাকার কারণেই আল্লাহ কবিদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করার জন্য। অবশ্য তিনি এ দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন এক সুগভীর সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে। এ ষড়যন্ত্র তাঁর জীবনটাকেই তছনছ করে দিল। বেঁচে থেকেও জীবনের একটি সুদীর্ঘ সময় তাকে কাটাতে হলো বোবা কান্না বুকে নিয়ে অর্ধমৃত অবস্থায়। তা' না হলে তিনি যে কাব্য প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সমকক্ষ অদ্যাবধি সমগ্র বাংলা কাব্য-সাহিত্য ও সঙ্গীতে কেউ নেই। আজও তিনি প্রায় ত্রিশ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অতি কাছের মানুষ, গৌরবের ধন।

www.pathagar.com

সমাজে কবি ও কবিতার প্রভাব আলোচনা করতে গেলে বলতে হয়, আমাদের কাব্যাঙ্গনের প্রবীণতম মহিলা কবি (সম্প্রতি প্রয়াত) যিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতকে ইবাদত (প্রার্থনা)-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। অথচ রবীন্দ্র সঙ্গীতের ছত্রে ছত্রে শিরক মিশে আছে। তিনি কখনো কায়েদ-ই আজম বন্দনা, কখনো রবীন্দ্র বন্দনায় মত্ত হয়ে ব্যক্তি পূজার প্রচলন করে আমাদের সমাজের প্রবীণ, নবীণ এবং তরুণদের কি সর্বনাশ করেছেন তা হয়তো তিনি নিজেও জানেন না। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক অবদান খুব বেশী না হলেও তিনি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাই তাঁর ভক্ত এবং অনুসারীর সংখ্যা কম নয়। এ ধরনের ব্যক্তি বন্দনার জন্য আরো অনেক কবিকে দায়ী করা যায়। মানুষের ভাল কাজের প্রশংসা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। তাই বলে ব্যক্তি বন্দনা বা ব্যক্তি পূজাকে কোন অবস্থায়ই অনুমোদন করা যায় না। 'হামদ এ বারী তা'লা' এবং 'না'তে রাসূল' (সা.)-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অথচ ইদানিং রবীন্দ্র পূজার প্রতিযোগিতায় এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী, কবি, সাহিত্যিক, সমাজপতি এবং রাজনীতিকরা যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন এবং তারা রবীন্দ্রনাথকে অতিমানব বানিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেরণার উৎস, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের জন্মদাতা, ধর্ম নিরপেক্ষতার মূর্ত প্রতীক, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী 'বীরম্মুজাহিদ' ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করে দস্তুরমত পূজা পার্বণের আয়োজন করেছেন। ঋষি, গুরুদেব ইত্যাদি তো তাঁর পুরোনো ভক্তদের দেয়া উপাধি। অথচ ইতিহাসের বিচারে তাঁর এই বিশেষণগুলো প্রায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। শামসুর রাহমান যখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেন, 'আমার অস্তিত্বে তুমি ঈশ্বরের মতো...' হয়তো তিনি জানেনও না যে, এটা কত বড় শিরক। স্বয়ং রাসূল করীম (সা.)-কে কেউ যদি আল্লাহর সঙ্গে তুলনা করে তাহলে সে আর মুসলমান থাকে না। তবে ভুল বুঝতে পেরে সত্যিকারভাবে অনুতপ্ত হয়ে তওবা অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন করলে হয়তো আল্লাহপাক তাঁর অসীম করুণায় কোন ব্যক্তিকে মাফ করে দিতে পারেন। নজরুলের কাব্য জীবনের শেষ দিকে তাঁর এই অনুতাপ প্রকট ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্য এবং সঙ্গীতের প্রশংসা আমরাও করি। কারণ বাংলা কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে একজন বড় কবি। তবে এসব ভাঁড়ামী দেখলে হয়তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বলতেন, 'ধরণী দ্বিধা হও'।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে ছোট বেলায় আমাদের সংলগ্ন এক বাড়ীতে রোজই সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে সবাই মিলে গাইতো 'গুরুদেব দয়া কর দীনজনে' ইত্যাদি। আমরা তখন মাগরিবের নামায পড়তাম। কিন্তু আমার মন ঐ সন্ধ্যা সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হতো। কারণ নামাযের সূরা কালাম ইত্যাদির মর্ম কিছুই বুঝতাম না। ঐ বাড়ীর আমার সহপাঠীকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'দোস্ত, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে

www.pathagar.com

তোরা গুরুদেব বলে থাকিস। প্রার্থনার বেলায় তোরা কি তার কাছে দয়া চাস?' উত্তরে সে বলেছিল, 'নারে, সে তো ভগবানের কাছে'। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমার মরহুম পিতার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি বলেছিলেন, 'তোমরাও তো মাগরিবের নামাজের পর কবি গোলাম মোস্তফার, 'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, বিচার দিনের স্বামী / যত গুণগান হে চির মহান তোমারই অন্তর্যামী।' অথবা 'হে খোদা, দয়াময় রহমানুর রাহীম / হে বিরাট, হে মহান, তুমি অনন্ত অসীম' সুর করে গাইতে পার।' কবি গোলাম মোস্তফা কর্তৃক সূরা ফাতেহার কাব্যানুবাদ পড়েই আল কোরআন বুঝেশুনে পড়ার আগ্রহ আমার কিশোর মনে জাগ্রত হয়। আমার পিতার কাছেই শুনেছিলাম, কোলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়্যাল স্কুলে ক্লাশ শুরু হওয়ার পূর্বে 'অ্যাসেম্বলী'-তে শিক্ষার্থীরা গোলাম মোস্তফার ঐ প্রার্থনাসমূহ সুর করে সমবেত কণ্ঠে গাইতো। এমতাবস্থায় কবি সুফিয়া কামাল প্রমুখরা কি করে নিজেদেরকে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আদর্শ বাস্তবায়নের জয়গান গাইতে ইসলামের বিরোধিতা করতে পারেন? নারী শিক্ষার প্রসার এবং নারী অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা বেগম রোকেয়া ইসলাম থেকেই পেয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও পর্দার মধ্যে থেকেই এ আন্দোলন করেছেন। তিনি জানতেন পর্দা এবং অবরোধ প্রথা এক জিনিস নয়। ইসলামে অবরোধ প্রথা নেই। নারী অবরোধ এসেছে গ্রীক, রোমান এবং আর্য সভ্যতা থেকে। ইসলাম নারীদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়া বা কাজ করার জন্য পর্দা নামের একটি শালীন পোষাককে বাধ্যতামূলক করেছে। এসব কিছুর মূল কারণ আল কোরআনের বাণীর মর্মার্থ উপলব্ধির অভাব। ইসলামে বিদ্যা শিক্ষা প্রত্যেক নর ও নারীর জন্য ফরজ। তাই বলে নারী স্বাধীনতার নামে তাদের মধ্যে পাশ্চাত্যের উলঙ্গপনার প্রসার এবং পণ্যের ন্যায় বাজারজাতকরণের কল্পনা বা স্বপ্ন বেগম রোকেয়ার ছিল না। মুশরিকদের কাছে কন্যা দানের মতো জঘন্য পাপ তিনি কল্পনাও করেননি। শুধু এটাই নয়, আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার মূল আন্দোলন করলো ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিস'। অথচ আজ এর কৃতিত্ব দাবী করছে অন্যরা, যাদের অনেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিরোধিতাও করেছেন।

দাউদ হায়দারদের মতো অর্বাচীন কবি-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ এবং প্রখ্যাত শিক্ষক (সম্প্রতি প্রয়াত) ড: আহমদ শরীফের মতো বুদ্ধিজীবীরা যখন ইসলামের মৌলিক আকিদার ওপর আঘাত হেনে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেন, তখন দুঃখ হয়। তাদের অহেতুক রসিকতা ও মিথ্যাচারের ছড়াছড়ি দেখে আমার কাছে সূরা আশ্ শুআরার আয়াতগুলো আরও চিরন্তন ও জীবন্ত মনে হয়। আমার স্পষ্ট মনে আছে,

www.pathagar.com

আযান শুনে মুসলমান মহিলারা যখন ওড়না অথবা শাড়ীর আঁচল দিয়ে মাথা ঢাকতেন তখন ড: আহমদ শরীফ রসিকতাচ্ছলে বলতেন, 'আল্লাহ আপনাদের ভাসুর নাকি?' তাঁর অনেক ছাত্র-ছাত্রী এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে তাদের অনেকেই দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে আজ কর্ণধার হয়ে বসেছেন। শিক্ষকদের শিক্ষা এবং চরিত্রের ছাপ ছাত্রদের ওপর পড়বে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুতরাং বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় এবং মূল্যবোধের প্রতি অনীহার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে বেশী দায়ী এইসব বিভ্রান্ত শিক্ষকরা। তাই সূরা আশ শু'আরায় উল্লেখিত শয়তান অবতরণের ব্যাপারটা শুধু কবিদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। কারণ শয়তানের কর্মক্ষেত্র অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এমনকি, মানুষের মেধা, মনন এবং অন্তরেও তার অবাধ বিচরণ। সেটা প্রতিরোধের ব্যবস্থাও আল্লাহপাক আল কোরআনের ছোট ছোট সূরায় এবং আয়াতে করে রেখেছেন। যা আমরা অনেকেই জেনে অথবা জানি না বলে অনুশীল করি না। অথচ এসব সূরা বা আয়াতগুলোর মর্মার্থ অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে কঠিন নয়।

এদেশের একজন প্রখ্যাত অভিনয় শিল্পী ফেরদৌসী মজুমদার সম্প্রতি তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কৈশোরে তিনি তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আল্লাহর পরে কে?' উত্তর দিতে তাঁর পিতা ইতস্তত: করলেও তিনি বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ'! তাঁর সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। তবে তিনি যে এই ধারণার জন্য এখনও গর্বিত তা স্পষ্ট করেই বলেছেন। সমাজ বিবর্তনে যাদের প্রভাব এত বেশী, সেই কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সমাজপতিদের সম্পর্কিত সূরাটির তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। তবে এ ধরনের উদাহরণ দিতে গেলে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতিসহ সমাজের অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানকারী বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করা যায়, যারা বুক ফুলিয়ে এ ধরনের বক্তব্য রেখে নিজেদের ধন্য মনে করেন। অনেকে হয়তো এমন সব মন্তব্য করে বসেন যা আলোচ্য সূরায় উল্লেখিত বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের মন্তব্যের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়।

কবিতার ক্ষেত্রে একটি অতীন্দ্রিয় ব্যাপার থাকে। সবাই কবি হতে পারে না। মানুষকে প্রদত্ত অসংখ্য অনুগ্রহের মধ্যে এটা আল্লাহর একটি বড় নেয়ামত। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এর সঙ্গে অহংকার, আত্মম্ভরিতা যুক্ত হয়ে শিরক ও অশ্লীলতাসহ এতে অনেক নাফরমানীর অবতারণা হয়। মোটকথা, সমাজ জীবনে কবি এবং কবিতার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। প্রায় সকল কবিরাই শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। তাঁদের অনেকে একটা দার্শনিকের ভাব বেশ-ভূষায় হলেও প্রকাশ করে থাকেন।

www.pathagar.com

যদিও সমাজের পালাবদলের পালায় আজ পরিবর্তনের সুর শোনা যাচ্ছে। বিশেষ করে আশির দশকে একদল বিশ্বাসী কবির আবির্ভাবের ফলে এবং তাদের ক্রমাগত চেষ্টায় অনেক প্রবীণ কবির চিন্তা চেতনায়ও পরিবর্তনের এ ঢেউ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। যে ধরনের কবিতা শুনে রাসূল (সা.) আপ্লুত হতেন, খোলাফায়ে রাশেদার চার খলিফাসহ রাসূলে করীম (সা.)-এর প্রখ্যাত সাহাবীগণ যে ধরনের কাব্যচর্চা করতেন, আশির কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নতুন প্রজন্মের প্রতিভাধর কবিরা যদি সে ধরনের কাব্যচর্চায় এগিয়ে আসেন তাহলে বাংলা কাব্যে যুগান্তকারী বিপ্লব সাধিত হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে এ ধরনের কবিদের উৎসাহিত করা মুসলিম উম্মাহর অনিবার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। রাসূল (সা.) বিশ্বাসী কবিদের কাব্য যেভাবে পাঠ করতেন, তাদের উৎসাহ দিতেন, নির্দেশনা দিতেন, পুরস্কৃত করতেন, সম্মান দিতেন, এসব সুন্নত সমাজে চালু করার জন্য তাঁর উম্মত হিসাবে আমাদের আজ সচেষ্ট হতে হবে। সমাজে রাসূল (সা.)-এর এ সুন্নতগুলো জারী করার জন্য সচেষ্ট হলে একদিকে আমরা যেমন সওয়াবের ভাগী হবো তেমনি সমাজও উপকৃত হবে। আজকে যাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত আছেন, এ বিষয়ে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাঁরাই পারেন সমাজে এসব সুন্নত চালু করার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মসজিদে নববীতে কবিতা পাঠের জন্য আলাদা স্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে দিয়েছিলেন। আমি এখনি এ পর্যায়ে যেতে বলছি না, কিন্তু আমরা কি পারি না বিভিন্ন ইসলামী দিবসগুলোতে যেসব জায়গায় সম্ভব মসজিদে কাব্য জলসা করতে, কবিদেরকে সম্মাননা প্রদান করতে এবং জাতীয় পর্যায়ে কবিদেরকে পুরস্কৃত করতে?

লেখক: প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় ফুলকুঁড়ি আসরের সম্মানিত সভাপতি।

www.pathagar.com

কবিতা

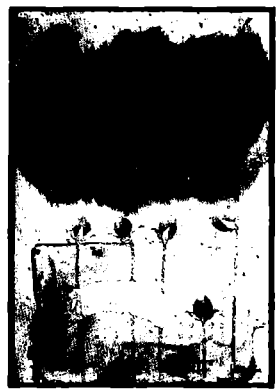

www.pathagar.com

তুমি যেই এলে

সৈয়দ শামসুল হুদা

শ্যামলী শ্যামল হলো নীলিমা সুনীল
তুমি যেই এলে নবী তুমি যেই এলে
আলোদের আলো তুমি জানলো আলোরা
সকল অপূর্ণ যত হলো পূর্ণ হলো।

মরি মরি অলখিত কী যে দৃশ্যমান:
পৃথিবী পাগল-পারা আপন সম্ভারে।
যেদিকেই মেলে চোখ চেনে না নিজেকে
অঙ্গময় অভিনব একি কারুকাজ!

তুমি এলে সাথে সাথে সর্ব আকাঙ্খিত
দিলো ধরা মানুষের স্বপ্ন দীপ্ত হাতে।
মরুচিত্ত নৃত্যময় ধারা সাগরের
ফুলেদের দোল্ দোল্ রঙের বাহার।
স্বর্গলোক এলো নেমে, সপ্ত আকাশের
একে একে গেলো খুলে সকল দুয়ার।

স্রষ্টা সুপ্রকাশমান প্রিয় সৃষ্টিময়
মানুষের বিজয়ের দোলে মাল্যখানি
পরালো তোমারি কণ্ঠে প্রিয় স্রষ্টা হাতে,
পরালে সে মালা তুমি সবারে সবারে।

তুমি যেই এলে প্রিয় তুমি যেই এলে
দেখলো স্রষ্টাকে সৃষ্টি মাটি চোখ মেলে।

www.pathagar.com

তারা কি কেউ বন্ধু স্বজন

আবদুল মুকীত চৌধুরী

বিভাজনের গানে মুখর ভণ্ড তাত্ত্বিকেরা
উষ্ণ শ্বাসে ছড়ায় আগুন জ্বালায় নবীর ডেরা
বিশ্লেষণের সে যে কতো সূক্ষ্ম বোল ও চাল!
আল্লাহ্ তোমার দীন বাচাঁও এরা পঙ্গপাল।

নবীর মাঠের ফসল খেয়ে করলো এরা শেষ
তবু তাদের ক্ষুধার আগুন হলো না নি:শেষ!
দাঁড়িয়ে এরা দেখে জ্বলে নবীর ঘর ও দোর
তবু কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির রাত হলো না ভোর!

বৈরাগ্যে দীক্ষা দিতে যারা ব্রতচারী
পঙ্গুকরণ কর্মযজ্ঞে চেতনা সংহারী
বিশ্বজোড়া গণহত্যায় পরোক্ষে সায় যার
তারা কি কেউ বন্ধু স্বজন বেদিশা উম্মার?

নবীর ঘরে যারা আনে হিংসা বিভাজন
কিংবা যারা পুণ্য বলে বৈরাগ্য সাধন
কিংবা বিবেকবিহীন বুদ্ধি, সে যে কী বিস্ময়
মানবতার বুলি-বচন প্রতারণাময়!

এদের নীরব সম্মতিতে 'বৈধ' হলো সবি
আগ্রাসনের শিখায় জ্বলে 'মানবতা'র ছবি!
আসবে শতক, যাবে শতক রাত হবে না ভোর
ঘরেই যার প্রতিপক্ষ, সামালো ঘর-দোর।

www.pathagar.com

শুভাশিস নেবো

মসউদ-উশ-শহীদ

যদি হই একখানি ভাসমান মেঘ
যদি পাই বাতাসের জোর গতিবেগ
পুবাল আকাশের এই দিগন্ত শেষে
পাড়ি দেবো আমি সেই নবীজীর দেশে
যেখানে দেখা হয় সতেজ রবির–
সবুজ গম্বুজে সুধাময় রওজা নবীর
সেখানেই নেমে যাবো হয়ে বারিধারা
সেখানেই বিলীন হবো, হবো দিশেহারা।

যদি এই দৃশ্যহীন শীতল বায়ু
যদি পাই আরো কিছু আয়ু-পরমায়ূ
তবে আমি যাবো সেই মরু ছুঁয়ে ছুঁয়ে
যেখানে আছেন নবীজী নীরবেই শুয়ে
যেখানে দরূদ-সালাম সুবাস ছড়ায়
যেখানে পুণ্যভূমি হয়েছে ধরায়–
আমিও যাবো সেই নবীজীর দেশে
শুভাশিস নেবো তাঁর, জিয়ারত শেষে।

www.pathagar.com

সোনালী শাহজাদা

আবদুল হালীম খাঁ

কী আশ্চর্য মুজেজা সেই সোনালী শাহজাদার!
তাঁর শাহাদাত অঙ্গুলি আমার চোখের সামনে
আজো ভেসে ওঠে। কী তাঁর মহিমা!
প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এক সঙ্গে দুলে ওঠে
দুলে ওঠে আকাশ বাতাস
অঙ্গুলি ইশারায় দ্বিখন্ডিত হয় চাঁদ
পদতলে লুণ্ঠিত হয় বিশাল পারশ্য রোম
মুছে যায় বিশ্বের তামাম জাহেলিয়াত
হেরার সূর্য হেসে ওঠে

সারা দুনিয়ায় লাগে জাগরণের পূর্ণ জোয়ার।
কী আশ্চর্য ক্ষমতা সেই সোনালী শাহজাদার!
তাঁর পরশে কেউ অপূর্ণ থাকেনি
তাঁর পরশে কেউ দুর্বল থাকেনি
তাঁর পরশে কেউ অতৃপ্ত থাকেনি
ফুল হেসে ওঠেছে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য সৌরভে
চাঁদ হেসে ওঠেছে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতায়
নদী ছুটে চলেছে কাংখিত ঠিকানায়
মানুষ খুঁজে পেয়েছে মনযিল
তাঁর পরশে হীন-পতিত দাঁড়িয়েছে শির উঁচু করে
তাঁর পরশে পঙ্গু লংঘিতে পেরেছে গিরিচূড়া।

কী আশ্চর্য মুজেজা সেই সোনালী শাহজাদার!
যেখানে রেখেছেন হাত সেখানেই হয়ে গেছে সোনা
যেখানে রেখেছেন পা সেখানেই হয়ে গেছে সোনা
যেদিকে তাকিয়েছেন, যার দিকে তাকিয়েছেন
সেই চলে এসেছে তাঁর কাছে মুহূর্তে হয়ে গেছে ছায়া
জাহেলিয়াতের ধুলি ঝেড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে তাঁরা মেরুদন্ড সোজা করে
মাত্র কদিনেই উলট পালট করে দিয়েছেন তামাম দুনিয়া।

www.pathagar.com

জাবালে নূরে দাঁড়িয়ে

মাহবুবুল হক

হাঁ, কবিদের মতই আজ আমার সুতীব্র অনুভূতি
আর সেই অনুভূতির লকলকে মিনার থেকে
আমি মহাকালের মহা আবেগের প্রতিনিধি
নীলাভ্র আকাশে চোখ ফেরাতে ফেরাতে
কখন, কোন্ ক্ষণে এসে থির হয়েছি
জাবালে নূরের এই সম্মোহিত পাদ-পল্লীতে।

আকাশ এখানে এতো নীল কেন?
বাতাস এখানে, এতো ভারী কেন?
একী বেদনার্তের নীল নভোযান?
একী দীর্ঘশ্বাসের ভারী খেয়াযান?
আমার দৃষ্টি ও অনুভব এক মোহনায় একাকার
শুধু দু'টি পা
দেড় হাজার বছর আগের চলিষ্ণু-চঞ্চল
শুভ্র-কোমল দু'টি পা।

হায় কী প্রেমে, কী বিভায়
কী অভিজ্ঞায়, আর
কী মিলন টানে
পা' দুটি তর তর করে উঠে যেত!

আমি আমার সেলুলয়েডে
অকুণ্ঠিত পায়ের তাল ও লয় দেখি
ভাবী দুর্গম এ পর্বতে উঠতে গিয়ে যদি–
ভাবতেই, তায়েফের রক্ত ঝরা পা আর
ওহুদের রক্তাক্ত মুখের ছবি ভেসে ওঠে
কষ্ট হয়। খুব কষ্ট।

নাভীমূল থেকে কষ্টের শ্বাস উঠে আসে
মনে হয় সমস্ত মানবতা আতংকে মুখ ঢাকে

www.pathagar.com

মাতম উঠে জমিনে জমিনে
আকাশ থেকে আকাশে
অনুভবে ভেসে ওঠে–
পবিত্র পদ-চিহ্নের ওপর আচ্ছাদিত হবে
আরো কারো পদচিহ্ন?
হায়! এমনটি যদি না হতো!

এ পর্বতের পবিত্র শরীরে আর কেউ যদি
নতুনভাবে পা না রাখতো!
অক্ষত থাকতো এই নূরের পাহাড়
শুধু চার চারটি পায়ের রেখা চিহ্ন নিয়ে।

হাঁ, অপর দু'টি পা অবশ্যই প্রেমিকার–
অবশ্যই স্ত্রীর–
অবশ্যই একজন মাতার এবং একজন সহধর্মীনীর।
খাদিজার টাল-মাটাল শ্রম সাধ্য পা,
খাদিজার শংকিত লাজ-নম্র পা,
খাদিজার দরদভরা মমতার পা।
আহা! কী আয়াস-সাধ্য ছিল পর্বত অভিযাত্রা
আহা! কী দু:সহ ছিল দীর্ঘপথের অভিজ্ঞতা।

আমি ধীরে ধীরে উঠি আর ভাবি
একজন প্রেমিকের কাছে প্রেমিকার নিত্য অভিসার
অথচ প্রেমিকের অভিসার প্রেমের উৎসমূলে–
যে উৎস আদিতে ছিল,
অন্তেও থাকবে।
খাদিজাও অনন্ত প্রেমের ঋদ্ধ পরশ পেয়েছিল।

তবু মহামিলনের এই মহাস্থানে
অন্য কারো পদচিহ্ন যদি না পড়তো!
হেরার অনির্বান রাজতোরণে
অন্য কারো প্রবেশাধিকার যদি না থাকতো
মহাপ্রলয়ের পরে আবার যদি
মহামিলনের অভিষেক হতো!

www.pathagar.com

শতাব্দীর এ কেমন অভিযাত্রা

জয়নুল আবেদীন আজাদ

নতুন শতাব্দীর এ কেমন অভিযাত্রা
পুরনো পঙ্কেই জড়িয়ে গেল সে।
শতাব্দীর কারাগারে দেখেছে মানুষ
ভয়ংকর সব আস্ফালন,
যুদ্ধে হয়েছে বিধ্বস্ত নগর-মহানগর সহস্র জনপদ।
পারমানবিক অস্থিরতায় টুটেছে আকাশ
হয়েছে বিকৃত মানব মস্তিষ্ক।

এরপর ভেঙেছে ঘর, সমাজ ভেঙেছে
ভেঙেছে মানব-হৃদয়।
দুই দানবের যুদ্ধে তছনছ হলো এভাবেই
সবুজ উদ্যান, মানব-সংসার।
শতাব্দীর শেষ রাতে স্বপ্ন দেখলো মানুষ
ভাবলো, উঠবে নতুন সূর্য
ফুল-ফসলে সৌরভ সম্পদে হাসবে পৃথিবী আবার।
কিন্তু ভাঙতেই ঘুম স্বপ্নে আর থাকে না বিশ্বাস।

আবার যুদ্ধ, আবার ধ্বংস, ছলনা আবার
এমন বাতাবরণে স্বপ্নরাও আর থাকে না জীবন্ত,
হৃদয় জমাট বেঁধে হয়ে যায় পাথর।

মানুষ এখন কাজ করে, অবিরত শুধু কাজ
সভ্যতার কারাগারে অদ্ভুত এক ক্রীতদাস
হাসে না কাঁদে না, শুধুই রোবট সে।
জাহেলিয়াতও ছিল ঢের ভাল এর চেয়ে।

অন্ধকারে তখন তো আলো জ্বেলেছিল, ঐশী আলো
উজ্জ্বল এক আল-আমীন।
এখন জ্বালাবে কে, কোথায় সে বিশ্বাসী?
অথচ চারদিকে কেমন যেন আলোর প্রহসন!

www.pathagar.com

নবীকে সালাম

জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ

পৃথিবীর ছাদ ঢাকা গভীর আঁধারে
আদমের সন্তান বিপথে যে যায়,
মরুদেশে হানাহানি রক্ত গড়ায়
দিবানিশি মানবতা কাঁদে বারে বারে।

আল্লাহর বান্দারা পুজা দেয় কারে
ঈর্ষা ও নিন্দায় একতার শেষ,
সমাজের মাঝে তাই বাড়ে বিদ্বেষ
দূর থেকে ইবলিশ কলকাঠি নাড়ে!

হঠাৎ আলোর ঢেউ, সূর্য ও চাঁদ
নীলিমায় খেলা করে, পাখি গায় গান,
জগতের বুক থেকে যায় অবসাদ
রাসূল মুহম্মদ দেন আহ্বান।

নবীকে সালাম দিয়ে তাঁর ডাকে হুশ
সত্য ন্যায়ের পথে এগোয় মানুষ।

www.pathagar.com

শাশ্বত কথা ও বাণী

সুজাউদ্দিন কায়সার

অবিনশ্বর মোহন ক্লান্তি জুড়ে বসেছে হৃদয়পাতে
আজ জন্মদিন তোমার
প্রস্ফুটিত ফুলের সমারোহ
তুমি তো ভোরের মুয়াজ্জিনের মগ্নধ্বনি

কালের তাপস
সত্য ও সুন্দরের যথার্থ উপমা
তোমার অপার মহিমা জাগায় শাশ্বত বাণী
এবং এ জীবনে আনে জীবনের সরল উপমা–

আমি আমার সত্তায় স্পষ্ট শুনি
জাগরণের কঠিন রেনেসাঁ
যুদ্ধের প্রলয়
ততবারেই আমি জেগে উঠি নবীন সূর্যে
মানুষের ধারাপাতে এ-কি দোলা লাগে
সৃষ্টির বৈভবে–

সুদূর দিগন্ত মাড়িয়ে ছুটে আসছে ওই
মহিমান্বিত নূরানী হাওয়া
সহসা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে তোমার
শাশ্বত কথা ও বাণী।

www.pathagar.com

জগতের সব উজ্জ্বলতার সমষ্টি

দেলওয়ার বিন রশিদ

যত হতাশা, দু:খ কষ্ট, যন্ত্রণার মেঘমালা
সব দূর হয়ে যায়,
পরিপূর্ণ প্রশান্তি
বেহেশ্‌তী সৌরভ ঘ্রাণ–

সব খানে
ছড়িয়ে পড়ে,
দূর দূরান্তরে,
পাহাড় পর্বতের প্রান্তরে প্রান্তরে চূড়ায় চূড়ায়
উজ্জ্বল জ্যোতি ঝরে
থরে থরে,
সর্বত্র শান্তির স্নিগ্ধ সৌরভ ভাসে,
কেবলি তাঁর, তাঁর জন্যে শান্তির অমিয়ধারা,
তিনি শান্তির দূত, তিনি আলোর ফুল
শ্রেষ্ঠ মানুষ
'মুহাম্মদ'
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

জগতের সব উজ্জ্বলতার সমষ্টি
সমবেত সুন্দরের নাম
আলোর ঐশ্বর্যের নাম
'মুহাম্মদ'
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
তাঁর জন্যে বার বার
অসংখ্য দরুদ ও সালাম।

www.pathagar.com

আমার ভালোবাসা

আশরাফ আল দীন

নির্জনতাকে আমি ভালোবাসি কারণ
নির্জতা ভীষণ প্রিয় ছিল আমার নবীর।

একা একা হেঁটে বেড়ানো মরু-দুলালের নির্জন-দৃষ্টি
সীমা ছড়িয়ে অসীমের দিগ্বলয়ে ঘুরে বেড়াতো
মনে পড়ে;

বাণিজ্য-কাফেলার সওয়ারীর পিঠে
এক-ধরণের ধ্যানমগ্নতায় নির্জনতার চাদর জড়িয়ে
যুবক নবী (সা.) পথ চলতেন,
মনে পড়ে,

হেরা-গুহার ঐশী প্রচ্ছায়ায় নির্জতার গাঢ়
কুয়াশাচ্ছন্নতার ভেতর
দিনের পর দিন
রাতের পর রাত
শুধুই আমার প্রিয় নবী (সা.)র ক্লান্তিহীন দিল,
জেগে জেগে একা একা জেগে জেগে,
স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্য-ভাবনায় বাঙময়' হয়ে উঠতো
মনে পড়ে;

ইসলামী রাষ্ট্রের শত ব্যস্ততার ভেতর
যুদ্ধ ও বিজয়ের ঘর্মাক্ততার ভেতর
অবলীলায় আমার নবী (সা.) নির্জনতায় প্রবিষ্ট হতেন
তাঁর মসজিদে এতেকাফে,
মনে পড়ে।

নবী (সা.) কে যারা ভালোবাসে
তারা কি নির্জনতাকে ভালো না বেসে পারে!

www.pathagar.com

নবীর দুলালী তিনি

সোলায়মান আহসান

সে কোন্ ফুল ফুটেছিল বালুকার বনে
যার সুরভী ছড়ায় পৃথিবীর চৌ প্রান্তরে
সে কোন্ জন্মেছিল মাতৃত্বের অহংকার নিয়ে
মহিয়সী, করেছে যে নারীত্বের অপূর্ব উপমা।

যে কোন্ নারীর জন্ম ঘটেছিল এই পৃথিবীতে
যার হাতে রাখা আছে জান্নাতের সুশোভিত খিল
আর যার মাধুরী আজো আমাদের সম্মোহিত করে
যার পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে যাবে সব নারী, নর।

তারাই সফলকাম–
সার্থক জনম নেওয়া তাদের
তিনি আমাদের মা– সারা জাহানের মা জননী
পরম আত্মীয়, প্রেয়সী হযরত আলীর
ধৈর্য্য স্থিরতা তুলনা বিহীন প্রতিচ্ছবির।

নারীকুলের সেরা– জননী এবং জায়া
তাঁর চোখে মুখে ছিল সৃষ্টির তাবৎ মায়া
নবীর দুলালী তিনি
রাসূলের (সা.) যোগ্য কন্যা আর
আমরা গুণগ্রাহী অনুসারী অনুরক্ত তাহার
তিনি মা ফাতেমা তুজ্ জোহরা!
মা ফাতেমা তুজ্ জোহরা!

www.pathagar.com

রাসূলের (সা.) কাছে পত্র

মোশাররফ হোসেন খান

এই পত্র আমার রাসূলের কাছে,
যিনি যাচ্ছেন সিরিয়ার পথে
বাণিজ্য কাফেলার সাথে আর পাখির পালকের মত
হালকা মেঘ তাকে দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত শীতল ছায়া।

এই পত্র আমার রাসূলের কাছে,
যিনি ধ্যানমগ্ন হেরাগুহায়
অকস্মাৎ যিনি কেঁপে উঠলেন ঐ বাণীতে:
'ইকরা বিসমি রাব্বিকাললাজি খালাক..... ।'

এই পত্র আমার রাসূলের কাছে, যিনি কুরাইশদের
সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, শত নির্যাতন পায়ে দলে
দিক হতে দিগন্তে ছড়িয়ে দিলেন:
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

এই পত্র আমার রাসূলের কাছে,
যিনি আবুবকরের সাথে
অবস্থান নিয়েছেন সাওর পর্বতের এক
বিপদ-সংকুল গুহায়।
মাথার ওপরে আবুজেহেল ও তার পদচিহ্ন বিশারদ
গুহার মুখে মাকড়সার জাল। প্রিয় রাসূলকে
আগলে রেখেছেন এক মহান শক্তি।
আবু বকরের কম্পিত কণ্ঠ: 'হে রাসূল! ওরা
যদি একবার তাকায় ওদের পায়ের দিকে,
তাহলে নিশ্চয় দেখে ফেলবে আমাদের!
আমরা তো মাত্র দুজন!'

আমার পত্র সেই রাসূলের কাছে, যিনি নির্ভয়ে জবাব দিলেন:
'ভয় পেয়ো না হে আবুবকর!
আল্লাহপাকও আমাদের সাথে আছেন।'

www.pathagar.com

এই পত্র আমার রাসূলের কাছে, যাকে ধরতে গিয়ে
সুরাকার শক্তিশালী অশ্বের পা আমূল দেবে গিয়েছিল
মাটিতে আর ধূলিঝড়ের আচ্ছাদনে
আল্লাহপাক যাকে আবৃত করে রেখেছিলেন।

আমার এই পত্র রাসূলের কাছে, যার অঙ্গুলি হেলনে
চাঁদটি হয়ে গেল দ্বিখন্ডিত এবং নীরব পাথরও
সরবে উচ্চারণ করলো:
'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

আমার এই পত্র রাসূলের কাছে, তায়েফের পথে
পবিত্র দেহ থেকে ঝরেছিল
তরতাজা রক্ত। রক্ত ঝরেছিল
যুদ্ধের ময়দানে। যিনি ছিলেন সেনাপতি,
রাষ্ট্রনায়ক আবার ক্ষুধায় কাতর
এক জীর্ণ কুটিরের পরিতৃপ্ত বাসিন্দা।

আমার এই পত্র রাসূলের কাছে,
যিনি বাইতুল মাকদাস থেকে
গমন করেছে আল্লাহর সান্নিধ্যে, আরশ মহল্লায়
আর উম্মতের জন্য বয়ে এনেছেন অশেষ কল্যাণ।

আমার এই পত্র কেবল রাসূলের কাছে,
সমগ্র বিশ্বের যিনি শিক্ষক,
যার নামে জিন-ইনসান পড়ে দরুদ-
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম,
হে প্রভু! তার কাছেই পৌঁছে দাও
আমার তাবৎ শ্রদ্ধা প্রেম
আর এই অধমের পত্র-কালাম।

www.pathagar.com

কাওসার তাঁর হাতে

গোলাম মোহাম্মদ

পূর্ণ চাঁদের আলো সে অধরময়
গোলাপের ঘ্রাণ তার সে কান্তি ভরে
তিনি আসলেন রাত্রি করতে দূর
আকাশে বাতাসে সেই উল্লাস সুর।

মৃগনাভী যেন মুহাম্মদের নাম
সেই পদপাতে কত যে সম্মোহন
তিনি আসলেন সাথে এলো সেই
মুক্তির আঞ্জাম
দিকে দিকে হলো সত্যের উদ্বোধন।

সেই সুর আজ হৃদয়ে হৃদয়ে বাজে
সেই মূর্ছনা মরমে স্বপ্ন তোলে
দেশে দেশে তাই স্বাধিকার সংগ্রাম
লড়ে মুজাহিদ প্রাণ দেয় কলরোলে।

শুভ দু'হাতে প্রভাতের মত আলো
তার কথা কাজ সবার শ্রেষ্ঠ ভালো
সেই সংগ্রাম কাওসার তার হাতে
কারো তুলনা হয় না তাঁহার সাথে
দু:খী অসহায় বঞ্চিতদের পাশে
তিনি দাঁড়ালেন অবিচল বিশ্বাসে।

তার ছোঁয়া পেয়ে হাসলো নি:স্বজন
তিনি প্রেমময় রহমত বিশ্বের
ডুবন্তরা শিখলো সন্তরণ
অসহায় পেল বাঁচার তাকিদ বুকে
তিনি যে বন্ধু অসহায় নি:স্বের।

সালাম দরূদ সে নামে লক্ষ কোটি
সুন্দরতম তিনি সুমহান অতি।

www.pathagar.com

গল্প

www.pathagar.com

একটি হারের বিনিময়ে

হাসান আলীম

ক.

তিনি মক্কা ত্যাগ করেছেন। আত্মীয়স্বজনসহ চলে গেছেন মদীনায়। কিন্তু আদরের দুলালী কন্যা ও জামাতাকে সাথে নিতে পারেননি। জামাতা এখনও পৌত্তলিক। সে মক্কা ত্যাগ করবে কেন? অন্যান্য অমুসলিম আত্মীয় স্বজনদের সাথে সেও রয়ে গেছে মক্কায়।

আদরের কন্যা যয়নবের কি হবে? সে যে মুসলিম হয়েছে। এ মুহূর্তে তাকে সাথে নেয়া যাচ্ছে না। বিবাহ বিচ্ছেদও করানো যাচ্ছে না। তাঁর জামাতা খুব ভদ্র। কোরেশ বংশের বিখ্যাত লোক। প্রিয়তমা স্ত্রীর বোনের পুত্র। সে এখনও নিজেকে মুসলিম হিসেবে ঘোষণা দেয়নি। তাঁর আচরণ খুব সুন্দর ও রহস্যজনক। সে কারো সাথে শত্রুতা করে না। গোত্রের প্রধানদেরও অসন্তুষ্ট করে না। আবু লাহাব, আবু জেহেল কেউ তার প্রতি রুষ্ট নয়। মুহম্মদের জামাতা হলে কি হবে? সে তো গোত্র প্রধানদের শত্রু নয়। মুহম্মদ (সা.)এর ধর্ম গ্রহণও করেনি। যয়নব মুসলিম হলে কি হবে, সে তো তাঁর স্ত্রী। তার প্রতি তো আর খারাপ ব্যবহার করা যায় না। বরং রয়েছে গভীর ভালবাসা। আবুল আছের ইচ্ছে হয় মুসলিম হতে। পৌত্তলিকতা ছেড়ে দিতে। কিন্তু সে একটু কৌশল করতে চায়। তার অন্তরে রয়েছে অন্যরকম ভালবাসা। পবিত্রতম ভালবাসা। তার ধারণা যে প্রকাশ্যে মুসলিম হলে তার আমানতদারির ক্ষতি হবে।

মক্কার মুশরিকেরা, গোত্রের লোকেরাই তার সহায় সম্পদ লুটপাট করবে। তার কাছে গচ্ছিত মানুষের সম্পদের খেয়ানত হবে। তাঁকেও তার শ্বশুরের মত জন্মভূমি ত্যাগ করতে হবে। আবুল আছের শুধু কি মাল সামানার খেয়ানত হবে? নাকি অন্য কোন গোপন আমানতেরও ক্ষতি হবে! মুহম্মদ (সা.)-এর ক্ষতি হবে! তাকে সহায়তা করা যাবে না।

খ.

রটনা হয় মুসলিম গুপ্তচরেরা মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলা আক্রমণ করে মালামাল

www.pathagar.com

লুণ্ঠন করেছে। তাই প্রতিশোধ আর যুদ্ধের দাবনাল জ্বলছে দিকে দিকে। ঘরে ঘরে যুদ্ধের সাজসাজ রব। কোরেশ বংশের প্রধান প্রধান লোকেরা মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। যুদ্ধের কাফেলা প্রস্তুত। স্বয়ং আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, ওতবা সহ আরও বিশিষ্ট লোকেরা রয়েছে এ কাফেলায়। কোরেশ বংশের সকল পুরুষকে এ যুদ্ধে যোগ দিতে হচ্ছে। কোন সামর্থবান পুরুষ ঘরে বসে থাকতে পারবে না। কোন অজুহাত চলবে না। সকলকে যুদ্ধে যেতে হবে। রাসূলের জামাতা আবুল আছ কি পরিত্রান পাবে? তাকেও কি যুদ্ধে যেতে হবে? বংশের গন্যমান্য লোকদের সাথে তাকেও মুহম্মদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে? শ্বশুরের বিপক্ষে জামাতাকে তলোয়ার হাতে দাঁড়াতে হবে। এ বড় নিষ্ঠুর আচরণ। এ বড় কঠিন পরীক্ষা। হয়ত এখানেও আবুল আছ কৌশল অবলম্বন করবে। সে যুদ্ধেও যাবে, আমানতও রক্ষা করবে।

বদর প্রান্তর। এক পক্ষের সেনাপতি স্বয়ং রাসূলে খোদা পয়গম্বর মুহম্মদ (সা.)। অন্য পক্ষে আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান। আবুল আছের অন্য উপায় নেই। অন্য দরোজা নেই। সে বাধ্য হয়েই এসেছে যুদ্ধে। পরম শ্রদ্ধেয়, পরম পবিত্রতম মানুষটির বিরুদ্ধে তার এই অনিচ্ছাকৃত তলোয়ার ধারণ। আজ কিভাবে সে তার প্রিয়তমা স্ত্রীর পিতার বিপক্ষে যুদ্ধ করবে? কি করে শ্রেষ্ঠ মানুষ, মহামানব হযরত মুহম্মদ (সা.) এর ওপর অস্ত্র চালাবে? সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তার শ্বশুর যুগের শ্রেষ্ঠ। সে মহামানব। মহানবী। বিস্ময়কর সত্য, অবাক সুন্দরের স্থপতি। এই সুন্দরের, এই জ্যোর্তিময়ের আলোকরশ্মি কখনও নির্বাপিত হবে না।

সে তার শ্বশুরের বিপক্ষে দাঁড়ালে কি হবে? অন্তর্যামী জানেন তার মনের অবস্থা। তার শ্বশুর আল্লাহর দোস্ত মুহম্মদ (সা.)। নিশ্চয় তাঁর কাছে তার অন্তরের খবর রয়েছে। নিশ্চয়ই তাঁর শ্বশুর তার নাজুক অবস্থার কথা অনুধানব করবেন। নিশ্চয়ই তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। হিংস্র কোরেশরা অস্ত্র চালালে কি হবে নিশ্চয়ই তার শ্বশুরের দল সত্য কাফেলার দল বিজয়ী হবে। কাজেই তার ভয় কিসের? যুদ্ধের ময়দানে থাকলেই হল। বন্ধী হলে মুসলিমরা তার ক্ষতি করবে না। রাসূলের জামাতা হিসেবে এটুকু রেহাই দেবে। তাছাড়া সে তো মুসলিম কাফেলার কোন ক্ষতি করেনি। রাসূলের অন্য আত্মীয় আবু লাহাব আবু জেহেলের মত কোন মারাত্মক ক্ষতি করেনি। তাই রাসূলের অন্য আত্মীয়রা, বংশের শত্রুরা মাপ না পেলেও সে হয়ত মাপ পেয়ে যাবে।

তাই সে এসেছে। বদর প্রান্তরে কোরেশের পক্ষে যুদ্ধে এসেছে। ঐতো মুসলিম বাহিনী একে একে বিরোধী কোরেশদের পরাভূত করছে!

শেরে খোদা আলী (রা.) হত্যা করছেন ওলীদকে। বীরকেশরী হামযা হত্যা করছেন ওতবাকে। আর শায়বাকে শেষ করছেন এ দুই জনে মিলে। কোরেশরা ছত্রভঙ্গ

www.pathagar.com

হয়ে গেছে। আবু জেহেলের বিপক্ষে নেমেছেন হযরত মাউয (রা:)। তিনি হত্যা করেন আবু জেহেলকে। তার মস্তক ছিন্ন করেন তরবারীর আঘাতে। যারা মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল নবী মুহম্মদ (সা.)কে, যারা মদীনাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, যারা আল্লার নূর নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল বদর প্রান্তরে, তারা নি:শেষ হয়ে গেছে। পরাজিত হয়েছে পৌত্তলিক কোরেশ শত্রুরা।

মুসলিম সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়েছে অবশিষ্ট শত্রুসেনা। সেও হযরত আবদুল্লাহ বিন জাবিরের হাতে বন্ধী হয়।

গ.

রাসূলের জামাতা বন্দী শিবিরে মুক্তির প্রহর গুনছে।

আবুল আছের হৃদয় লজ্জায় সংকুচিত হয়ে যায়। যদিও তার হৃদয়ের এক কোণে বইছে আনন্দের ফল্গুধারা। তার শ্বশুরের দল সত্যের কাফেলা বিজয়ী হয়েছে। অন্য দিকে লজ্জা আর বেদনা রাসূলের জামাতা হয়ে এসেছিল বিপক্ষে লড়তে, এখন বন্দী হয়েছে। মুসলিম সৈন্যের মধ্যে রাসূলের মুখ কি ছোট হয়ে যাবে? হায় হায়! একি পাপ করেছে সে! একি লজ্জা! ভীষণ লজ্জা! কিন্তু না, আল্লাহতালা তো অন্তর্যামী, তিনি তো আবুল আছের হৃদয়ের খবর জানেন। আবুল আছ তো এসেছিল নেহায়েত অনিচ্ছাসত্ত্বে। আমানতদারী রক্ষা করতে।

কিন্তু ঐদিকে কি হবে? এ পরাজয়ের সংবাদ মক্কার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে। তার ঘরের তো ক্ষতি হবে না? যয়নবের কি হবে? রাসূলের মেয়ে রেহাই পাবে তো? আহা! প্রিয়তমা স্ত্রী কি ভাবছেন! সেও জানে তার অপারগতার কথা। কিন্তু কোন এক মুহূর্তে সে যদি ভাবে, তার পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করেছে, যদি সে তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়! রাসূলের শরীরের অংশ যদি তার ভাগ্য থেকে খসে যায় তা হলে কি হবে তার! প্রিয়তমা স্ত্রী যদি তার কথা ভেবে ভেবে পেরেশান হয়ে পড়ে! সে যদি উদভ্রান্তা হয়ে যায়। সে তো তাকে পরিত্যাগ করে তার পিতার সাথেই মদীনায় চলে যেতে পারত, কিন্তু তা সে করেনি। সে যে প্রাণাধিক! এ দুর্বল লোকটি তার স্বামী! এ ঈমানহীন লোকটি তার স্বামী! অথচ সে তো তাকে এখনো ছেড়ে যায়নি! এখন কি হবে তার? মক্কার কোরেশরা অর্থের বিনিময়ে হয়ত তাদের আত্মীয়দের ছাড়িয়ে নেবে। কিন্তু তার ললাটে কি চন্দ্র উদয় হবে?

প্রিয়তমা স্ত্রী কি তার জন্য কিছু করবে? হয়ত করবে। সে তো তার খালাম্মা– আম্মা খাদিজার মেয়ে। খালাত বোন। আম্মা খাদিজা তো মুহাম্মদের পদতলে সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বিপদে তাঁকে রক্ষা করেছেন! ছায়ার মত ঘিরে রেখেছেন! যয়নব, সে তো তার-ই মেয়ে! স্বর্ণ ঈগল! নিশ্চয় সে তার স্বর্ণের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করবে।

www.pathagar.com

মক্কার লোকেরা একে একে রাসূলের দরবারে বন্দী মুক্তির জন্য ফিদিয়া পাঠাতে লাগলো। যয়নব ভাবছে, কি পাঠাবে মদীনায়। কি বিনিময় করবে প্রিয়তম স্বামীর সাথে। মদীনার রাষ্ট্র নায়ক মহানবী। সে তো তারই মহান পিতা।সে তো তার জামাতাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু তা সে করতে যাবে কেন? সবাই মুক্তিপণ দেবে। অথচ রাসূলের জামাতা বলে এমনিতেই খালাস পেয়ে যাবে! না, এ হয়না। সে জানে তার পিতা দয়ালু কিন্তু ন্যায় বিচারক। সাধারণ মুসলিমের জন্য যে কানুন- তার জামাতার জন্যও তাই প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া সে তার প্রাণপ্রিয় পিতাকে খাঁটো করবে কেন? অতএব যয়নব ফিদিয়া দেবে। কিন্তু কি সে ফিদিয়া? নিশ্চয়ই সে ফিদিয়া হতে হবে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মূল্যবান। রাসূলের জামাতার মূল্য কি কম! তাই সে মনে মনে ভাবছে– রাসূলের প্রিয় জিনিসটিই সে ফিদিয়া দেবে। যেই ভাবনা সেই কাজ। দেবর রবিকে ফিদিয়া দিয়ে মদীনায় পাঠালেন।

রাসূল রবির হাতে হারটি দেখে চমকে গেলেন? এ হার সে পেলো কোথায়? নিশ্চয় এটা যয়নবের কাজ। এতো তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজার গলার মহামূল্যবান হার! সহধর্মিনী, প্রথম মুসলিম, দু:খ-সুখের সাথী প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতি বিজড়িত এ হার। এ হারের মূল্য পৃথিবীর যে কোন সম্পদের চেয়ে মহা মূল্যবান। এ যে অমূল্য রতন। না, এ হার, রাসূলের স্ত্রীর গলার হার, এটা সাধারণের সম্পদ হতে পারে না। অন্যের হাতের স্পর্শ পেতে পারে না। বায়তুল মালের সম্পদ হতে পারে না। এ হার যয়নবের গলায়ই মানায়। এ যে তার মায়ের দেওয়া উপঢৌকন! একি ফেরত নেওয়া যায়!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বললেন, এ হার পাঠিয়েছে যয়নব, আমার কন্যা। হারটি তার মায়ের নিদর্শন। ইচ্ছে করলে হারটি তোমরা ফেরত পাঠাতে পারো। মক্কা গিয়ে আবুল আছ যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেবে, এটাই তার ফিদিয়া।

অপূর্ব সমাধান। মানুষের বিনিময়ে মানুষের মুক্তি, যয়নব মুসলিম।সে দারুল হরবে থাকবে কেন? সে তার পিতার রাষ্ট্রে, দারুল ইসলামে ফিরে আসবে। প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজার কণ্ঠ হার পরে নয়নের পুতলি যয়নব তাঁর-ই ছায়াতলে ফিরে আসবে।

মহামূলবান এই হারের বিনিময়ে যয়নব তার স্বামীকে পেল আর মহানবী পেল তার কন্যাকে।

www.pathagar.com

প্রবন্ধ

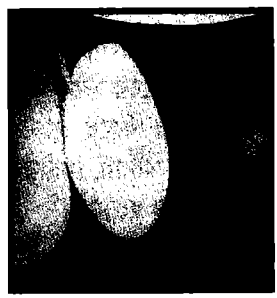

www.pathagar.com

মহানবীর আদর্শ ও সূরাতুন-নাম্‌ল : নন্দিত জীবনের অপরিহার্য দিক নির্দেশনা

মুহম্মদ সিরাজ উদ্দীন

মানব ইতিহাসের শুরু থেকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের হেদায়াতের জন্যে আসমানী কিতাব ও সহীফা নাযিল করেছেন এবং নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। এ প্রক্রিয়ায় মক্কা নগরী এবং তার নিকটতম অঞ্চলে বিভিন্ন নবী ও রাসূলের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা প্রত্যেকে ইসলামের আলোকিত পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। এঁদের অনেকেরই সংবাদ মক্কাবাসীর কাছে নানা সূত্রে পৌঁছেছে। কা'বায়, জমজমে, সাফা-মারওয়ায়, আরাফাতে, মীনায়, সিরিয়ায়, জর্দানে, ফিলিস্তিনে এঁদের সংগ্রামী জীবন ও কর্মের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।

আরবের রূপকথায় ও কবিতায় এঁদের কর্মমুখর জীবনকাহিনী নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এমনকি নিকটতম অতীতে তাদেরই ভূ-খণ্ডে হযরত ইবরাহীম (আ:) তাঁর দুই পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ:) ও হযরত ইসহাক (আ:) এবং স্ত্রী হাজেরা ও সারাকে নিয়ে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করেছেন।

মক্কার অধিবাসীগণ ছিল আল্লাহ তা'আলায় বিশ্বাসী। তাই আবরাহা কর্তৃক কা'বা আক্রান্ত হলে অসংখ্য দেব-দেবীকে বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর কাছেই তারা একে রক্ষার জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে। কা'বার খাদেম হিসেবে তামাম দুনিয়ায় তারা ইজ্জত লাভ করেছে। তারা ভাল করেই জানত যে, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ। পানি বর্ষণ ও ফসল উৎপাদন তাঁরই কাজ। যমীনকে বসবাসের যোগ্য তিনিই করেন। তাঁরই সৃষ্টি সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত। একই নদীর পানি প্রবাহে. দুটি স্বতন্ত্র স্রোতধারার সৃষ্টি করে উভয়ের মধ্যে ভেদরেখা তিনিই টানেন। তারা জানত যে, ব্যাকুল ও অস্থির চিত্তের ফরিয়াদ শ্রবণকারী একমাত্র আল্লাহ। জলে ও স্থলে তিনিই পথ প্রদর্শক এবং সুশীতল বায়ুকে বৃষ্টির আগমনী বার্তাসহ আল্লাহই পাঠান। সৃষ্টির সূচনা এবং পুনরাবৃত্তি, আসমান ও যমীন হতে রিযিক দান তাঁরই

www.pathagar.com

কাজ। তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করার উদ্দেশ্যে প্রণীত চুক্তিনামার শুরুতে তারা লিখেছে: 'বিছমিকা আল্লাহুম্মা' (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ১০০)। বদরের যুদ্ধে যাওয়ার আগেও তারা আল্লাহর কাছেই জয়-পরাজয়ের ফায়সালার ভার অর্পণ করেছে। পুত্র সন্তানের নাম রেখেছে 'আবদুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী করার জন্যেই মক্কাবসীকে আহবান জানিয়েছিলেন। তবে যেসব কারণে তারা তাঁর এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো:

ক. ইসলাম মূর্খ ও বর্বর জাতির বিশ্বাস ও প্রথা বিরোধী।

খ. কুরাইশ সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব ধনসম্পদ ও সন্তান নির্ভর ছিল। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্ব ছিল নৈতিকতা নির্ভর।

গ. কা'বা আক্রমণকারী আবরাহা খ্রীস্টান ছিল। ইসলাম ধর্মের সাথে খৃস্ট ধর্মের কতিপয় বিষয়ে আংশিক মিল থাকায় তারা ইসলামকে শত্রুর ধর্ম মনে করে।

ঘ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত প্রাপ্তিকে বনু উমাইয়া বনু হিশামের বিজয় মনে করত। কারণ উভয় গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিনের দুশমনী ছিল। তাই বনু উমাইয়ার আবু সুফিয়ান বদর ছাড়া মক্কা বিজয়পূর্ব সকল যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মক্কা বিজয়, আবু সুফিয়ানসহ বনু উমাইয়া গোত্রের কতিপয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ এবং কয়েকজন নেতার বিভিন্ন রণাঙ্গনে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আরবের এ দুটি প্রাচীন গোত্রের দ্বন্দ্বের আপাত: অবসান ঘটলেও রাসূল (সা:)-এর ইন্তেকালের পর; বিশেষত: হযরত ওসমান (রা:)-এর শাহাদাতের পর উভয় গোত্রের সেই প্রাচীন দ্বন্দ্ব পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

ঙ. কুরাইশ নেতাদের মারাত্মক চরিত্রহীনতা ও স্বার্থপরতা ইসলাম কবুলের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

চ. আহ্‌লে কিতাবীগণ বনু ইসরাইলী হওয়ায় তারা বনু ইসমাইলী নবীর নবুওয়ত ও রিসালাত বিরোধী ছিল। তাই কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণকারী নবীর বিরুদ্ধে মুশরিকদের দুশমনীকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তাঁকে নাজেহাল করার জন্যে নানা কৌশল ও অবান্তর প্রশ্ন কাফেরদের জুগিয়ে দেয়।

ছ. ইসলাম মদ, জুয়া, গোত্রীয় দ্বন্দ্ব, ব্যাভিচার, মূর্তি পূজা, হত্যা, লুণ্ঠন, জুলুম, অসহিষ্ণুতা, অশ্লীলতা ও উশৃঙ্খলতা বিরোধী হওয়ায় ইসলামের শান্তি ও শৃঙ্খলার, নীতি ও নৈতিকতার দাওয়াত মেনে নেওয়া কাফেরদের জন্যে

www.pathagar.com

অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

জ. কুরাইশগণ ছিল সমাজ সংস্কার ও সংশোধন বিরোধী।

ঝ. ইসলামের বিজয়ে মুশরিকদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের অবসান ঘটার ভয়।

ঞ. উপরন্তু, আখিরাতে অবিশ্বাস ছিল তাদের নৈতিক বিপর্যয় এবং ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার একটি অন্যতম কারণ।

এতদসত্ত্বেও চরম জাহেলিয়াতে ডুবে থাকা অবস্থায় তারা ছিল সাহসী, স্বাধীনতাপ্রিয়, বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী, বুদ্ধিমান, আত্মমর্যাদা সচেতন, কর্তব্যনিষ্ঠ, উদার, কাব্যামোদী, অতিথিপরায়ণ এবং দেশপ্রেমিক। কিন্তু তাওহীদ, আখিরাত ও রিসালাতে অবিশ্বাস এবং উপরোক্ত কারণগুলো তাদের এসব দুর্লভ গুণাবলীকে ম্লান করে দেয়।

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদেরকে আল্লাহর প্রতি নির্ভেজাল ও নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য প্রদর্শনের আহ্বান জানালেন তখন তাঁর উপর তারা ক্ষিপ্ত হয়। তাঁর সঙ্গীদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায়। সাহাবীদের কাউকে হত্যা করে, কাউকে নির্যাতিত অবস্থায় মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য করে। কারো ব্যবসা বাণিজ্য কেড়ে নেয়। কাউকে হিজরত করতে বাধ্য করে। কেউ হন গৃহবন্দী। কেউ তাদের হাতে আগুনে জ্বলেন, কেউ পানিতে ডুবেন, কেউ উত্তপ্ত বালুতে শুয়ে থাকতে বাধ্য হন। কেউ হন কর্মহীন। অথচ একজন নবী, একজন সংস্কারক, একজন আদর্শ সংগঠক, একটি জীবন বিধান, একটি সুশৃঙ্খল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাদের জন্যে ঐসময় ছিল অপরিহার্য।

এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে নওমুসলিমদের বিশ্বাস ও আচরণে, বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিকতায়, ধৈর্য ও সাহসিকতায় আরবের বুকে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে তা জাহেলিয়াতের প্রাণপুরুষ আবু জাহেল, আবু লাহাব, উৎবা ও শাইবাদের জন্যে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ওরা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল, ওদেরই সমাজের হযরত আবু বকর (রা:), হযরত ওসমান (রা:), হযরত মাছআব (রা:) বা হযরত আম্মার (রা:)-এর মত প্রধান, অপ্রধান ব্যক্তিগণ ইসলামের সংস্পর্শে এসে দিন দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক সৎ, যোগ্য, নির্ভীক, চরিত্রবান, দৃঢ়চেতা ও আত্মত্যাগী হয়ে উঠছে এবং সাধারণ মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তাদের নির্যাতন উপেক্ষা করে ইসলামী বিপ্লবের পতাকা সুমুন্নত করছে। ক্রীতদাস হযরত বিলাল (রা:) তাঁর মনিব উমাইয়া বিন খালফের বিরুদ্ধে, হযরত আবু জান্দাল (রা:) এবং তাঁর ভাই হযরত আব্দুল্লাহ (রা:) তাঁদের মুশরিক পিতা সুহাইল বিন আমরের বিরুদ্ধে, হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা:) তাঁর চাচা খুয়ালিদের বিরুদ্ধে, হযরত মাছআব (রা:) আপন জন্মদাত্রীর বিরুদ্ধে,

www.pathagar.com

হযরত লুবাইনা (রা:) তাঁর মনিব ওমর বিন খাত্তাবের বিরুদ্ধে, এমনকি ওমরের আপন বোন এবং ভগ্নিপতিও তাঁর আদর্শের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। নির্যাতনকারীগণ আরও প্রত্যক্ষ করল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ সমকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, আবু লাহাব, আবু জাহেল, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা অথবা আছ ইবনে ওয়ালেদ, উৎবা ইবনে রাবিয়াহ, আসওয়াদ ইবনে মাতলাব, অথবা আসওয়াদ ইবনে আবদ ইয়াগুস, আখনাফ ইবনে খালফ বা উকবাহ ইবনে আবি মুইত-এর মত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী না হয়েও ইসলামী বিপ্লবের সংস্পর্শে এসে কঠিন ঈমানী পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ের এ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলো কাফিরদের মনে ক্রোধের আগুন যেমন জ্বালিয়ে দেয়, তেমনি তাদেরকে উৎকণ্ঠিত, বিস্মিত, বিচলিত, চিন্তিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে করে তোলে। তারা বুঝতে পারে, জাহেলিয়াতের ভঙ্গুর সমাজ ব্যবস্থা আর অধিক দিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এভাবে একটু একটু করে জাহেলিয়াতের মাটি পায়ের তলা থেকে সরতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনের দাওয়াত থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে সত্যের দুশমনগণ কখনো তাঁর সাথে, কখনো তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে, কখনো নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেছে। মতৈক্যে উপনীত হওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এভাবে আপোষ এবং প্রতিরোধের প্রচেষ্টা পাশাপাশি চলেছে। তাদের ব্যর্থতা এবং মুসলমানদের সাফল্য অবশেষে তাদেরকে অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। ইসলামী আন্দোলনের এ চরম সংকটকালে মুষ্টিমেয় মুসলমান বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দ্বীনের দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। কাফিরদের নির্মম অত্যাচার, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য এবং আল্লাহর ভালবাসা মুসলমানদেরকে জাহেলী সমাজের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। কাফিরগণ এরূপ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি গণক, কবি, যাদুকর, পাগল, ভুত বা জ্বিন প্রভাবান্বিত ব্যক্তি ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস চালায়। কখনো তাঁকে সুন্দরী নারী, রাজত্ব বা ধন-সম্পদ দিয়ে প্রলুব্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কখনো প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত থেকে বিরত রাখার চক্রান্ত করে। এ দু:সহ পরিস্থিতিতে হযরত খাব্বাব ইবনুল ইরত (রা:) একদিন কাবাঘরের ছায়ায় বিশ্রামরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! অত্যাচার ও যুলুমের তো সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আপনি কি আল্লাহর নিকট দু'য়া করবেন না? একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

www.pathagar.com

মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে যারা ঈমানদার ছিলেন তাঁদের উপর তো এ অপেক্ষাও কঠিন দু:সহ যুলুম অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁদের দেহের অস্থি মজ্জার উপর লোহা নির্মিত চিরুনি চালানো হত। তাঁদের মাথার উপর দিয়ে করাত টানা হত। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তাঁরা দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করতে প্রস্তুত হতেন না। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তাঁর কাজকে সম্পন্ন করবেনই। এমনকি এমন এক সময়ও আসবে যখন একজন লোক 'ছানায়' হতে 'হাযরা মাউত' পর্যন্ত নির্ভয়ে সফর করতে পারবে এবং তখন সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া করছো।" (হাদীসে বুখারী)

এরূপ পরিস্থিতিতে নির্যাতন, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, আখিরাত ও রিসালাত নিয়ে সন্দেহ-সংশয়, ঈমান না আনার জন্যে নিত্য-নতুন ওজর-আপত্তি, মিথ্যা মাবুদ ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি, ইসলামের দুশমনী এবং মুসলমানদেরকে নির্জীব, প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন, কোনঠাসা, আশ্রয়হীন ও নির্মূল করার জন্যে কাফিরদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সহায়-সম্বল, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং কর্তৃত্বহীন মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র দল। স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে এভাবে নির্যাতিত ও উপেক্ষিত হওয়া ছাড়া প্রতিরোধের হাতিয়ার তুলে নেয়ার কোনো উপায় বা অনুমোদনই তাঁদের ছিল না। এই অন্ধকারময় পরিবেশে শুধু ইয়াসরাবের দিক থেকেই এক অস্পষ্ট আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। মদীনার 'আওস' এবং 'খাজরাজ' গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কোনো প্রকার আভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই তাঁদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করে। কিন্তু এ সামান্য সূচনার মধ্যে ভবিষ্যতের যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত ছিল তা কোনো স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ দেখতে পেত না। বাহ্যদৃষ্টিতে মানুষ এতটুকুই দেখতো যে, ইসলাম একটি দুর্বলতম আন্দোলন মাত্র। তার পশ্চাতে কোনো বস্তু ও বস্তুনিষ্ঠ শক্তির সামান্য সাহায্য-সহযোগিতা ক্রিয়াশীল নেই। তার নেতা এমন এক লোক, যে জন্ম থেকেই ইয়াতীম, নিরাশ্রয় ও অভিভাবকহীন। দুর্বল প্রকৃতির কয়েকজন অসহায়, নিরাশ্রয়, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন লোক নিজেদের জাতীয় বিশ্বাস ও আদর্শ পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে মাত্র। এর ফলে তারা স্বীয় সমাজ থেকে এভাবে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেভাবে পত্র-পল্লব বৃন্তচ্যুত হয়ে বৃক্ষ থেকে দূরে মৃত্তিকায় লুটিয়ে পড়ে।" (তরজমায়ে কুরআন মজীদ; পৃষ্ঠা: ১৯১-১৯২)

প্রতিনিয়ত বাতিলের সুপরিকল্পিত ও কঠিন কঠোর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত এই মুসলিম জামাতের জন্যে সে মুহূর্তে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল:

ক. কুরআনের মর্মোপলব্ধি এবং এর ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার।

www.pathagar.com

খ. মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও গুণগত মানোন্নয়ন।

গ. কাফিরদের নির্যাতন এবং শত প্ররোচনার মাঝেও ধৈর্যধারণ এবং আত্মকর্মসূচীর উপর সুদৃঢ় থাকা।

ঘ. প্রতিপক্ষের অবান্তর প্রশ্ন এবং অবাঞ্ছিত দাবীর যুক্তিসঙ্গত জবাব দান।

ঙ. মুশরিকদের ভুল ধারণা বিশ্বাস অত্যন্ত জোরালো যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে নিরসনের চেষ্টা করা।

চ. গাফলতে নিমজ্জিত মানুষকে কিয়ামত এবং হাশরের ভীতিকর এবং বিভীষিকাময় বর্ণনার মাধ্যমে জাগ্রত ও সচেতন করে তোলা এবং এর মাধ্যমে পরকালের অনুভূতি তীব্রভাবে জাগিয়ে দেয়া। উদ্দেশ্য: সংশোধন, ভীত-সন্ত্রস্ত করা নয়।

ছ. প্রতিপক্ষের জনবল, ধনবল, অস্ত্রবল, প্রভাব প্রতিপত্তির সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার মুখোশ উন্মোচন।

জ. ইসলামী শিষ্টাচার এবং প্রশাসনিক শিক্ষা প্রদান।

ঝ. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদেরকে ইসলামের দুশমনদের মোকাবেলায় হতোদ্দম বা নিরাশ না হওয়ার জন্য হিদায়াত দান।

ঞ. নি:স্ব নওমুসলিমদের দারিদ্র্য বিমোচন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াতের এ বিশেষ অধ্যায়ে সূরা 'শুয়ারা', 'নাম্‌ল' ও 'ক্বাছাছ' পর পর নাযিল হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) ও যাবির ইবেন যায়েদ (রা:) বর্ণনা করেন: "প্রথমে 'সূরা 'শুয়ারা' এর পর 'নামল' এবং পরে 'ক্বাছাছ' নাযিল হয়।"

'শুয়ারা', 'নাম্‌ল' ও 'ক্বাছাছ' এ সূরাত্রয়ীর মধ্যে একাধিক বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মিল রয়েছে। উপরোক্ত তিনটি সূরায় আলোচিত কোনো কোনো কাহিনী ও বিষয় বিচ্ছিন্নভাবে অসম্পূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত; কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সম্পূর্ণ। এ কারণে তিনটি সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য সতর্ক পর্যবেক্ষণে না এনে আলাদাভাবে কোনো একটি সূরার মর্মোদ্ধার পুরোপুরি সম্ভব নয়। এর প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলো বিবেচ্য:

(ক) তিনটি সূরার শুরুতেই হুরুফে মুকাত্তাআতের ব্যবহার রয়েছে; যা কুরআনের দুশমনদের জন্যে এক জটিল অভেদ্য সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার সৃষ্টি করছে এবং কুরআনকে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য দান করেছে।

(খ) তিনটি সূরায় ব্যবহৃত হুরুফে মুকাত্তাআতের মধ্যে প্রায় বিস্ময়কর মিল রয়েছে। যেমন: শুয়ারায় 'ত্বা-সীন-মীম', নাম্‌ল-এ 'ত্বা-সীন', এবং ক্বাছাছে 'ত্বা-সীন-মীম'।

(গ) তিনটি সূরায় ব্যবহৃত হুরুফে মুকাত্তাআতের পরপরই কুরআনের বৈশিষ্ট্য

www.pathagar.com

বর্ণিত হয়েছে। যেমন: "ত্বা-সীন-মীম। এ স্পষ্টভাষী কিতাবের আয়াত।" (শুয়ারা: ১-২)

"ত্বা-সীন। এ কুরআন এবং সুস্পষ্টভাষী কিতাবের আয়াত।" (নাম্‌ল: ১-২)

"ত্বা-সীন-মীম। এ সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত।" (ক্বাছাছ: ১-২)

(ঘ) তিনটি সূরাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়েছে এবং মক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য তিনটিতেই পুরোপুরি বিদ্যমান।

(ঙ) তিনটি সূরাতেই রয়েছে বেজোড় রুকু। যেমন: শুয়ারায় ১১, নামলে ৭ এবং ক্বাছাছে ১১।

(চ) সূরাত্রয়ীতে ঈমান আনার ক্ষেত্রে কাফেরদের ওযর-আপত্তি, টাল-বাহানা ও হঠকারিতা আলোচিত হয়েছে।

(ছ) শিরকমুক্ত জীবনের প্রতি তিনটি সূরাতেই আহ্বান জানানো হয়েছে।

(জ) তিনটি সূরাতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রয়োজনীয় হিদায়াত, উৎসাহ ও শান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

(ঝ) তিনটি সূরাতেই ইসলামের দাওয়াত গ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তি ও জাতির করুণ, শোচনীয় পরিণতি এবং পরকালে জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে।

(ঞ) সূরা 'নাম্‌ল'-এর ৮৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে: "তারা কি বুঝতে পারতো না যে, রাতকে তাদের প্রশান্তি লাভের জন্যে বানিয়েছিলাম এবং দিনকে করেছিলাম উজ্জ্বল। এতেই প্রচুর নিদর্শন ছিল মুমিনদের জন্যে।"

এ ইঙ্গিতবহুল তাৎপর্যপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে সূরা ক্বাছাছের ৭১-৭৩ আয়াতে। যেমন: "(হে নবী! ওদেরকে) বলুন, তোমরা কি কখনও চিন্তা করেছো যে, আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জন্যে বর্ধিত করে দেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ মা'বুদ আলো এনে দিতে পারবে? তোমরা কি শুনতে পাও না? তাদেরকে জিজ্ঞেসা করো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জন্যে দিন বানিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ রাত এনে দিতে পারবে, যেন তোমরা শান্তি লাভ করতে পার: তোমরা কি এসব কথা ভেবে দেখ না? সেই আল্লাহর রহমত ছিল বলেই তিনি তোমাদের জন্যে রাত ও দিন বানিয়েছেন যেন তোমরা (রাতে) শান্তি লাভ করতে পার এবং (দিনের বেলা) তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান কর। হয়তো তোমরা শুকরগুজার হবে।"

সূরা শুয়ারার ১৪ আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে, নবুওয়তের দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করে হযরত মুসা (আ:) আল্লাহর কাছে আরজ করলেন:

www.pathagar.com

"ফিরাউনের জাতির প্রতি কৃত একটি অপরাধের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে রয়েছে। সে কারণে আমি ওখানে গেলে আমাকে হত্যা করবে বলে ভয় পাচ্ছি।" পরে হযরত মুসা (আ:) যখন ফিরাউনের দরবারে গেলেন, তখন ফিরাউনের উক্তি: "আমরা কি তোমাকে আমাদের ঘরে একটি বালক হিসেবে লালন-পালন করিনি? তুমি আমাদের নিকট কয়েক বছর পর্যন্ত অবস্থান করলে, পরে তুমি যা করার করে চলে গেলে।" (আয়াত ১৮)

কিন্তু সেখানে এ দুটি কাজের কোনো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। সূরা 'ক্বাছাছে' এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। অনরূপভাবে সূরা নাম্‌লের সূচনায় বলা হয়েছে: হযরত মূসা (আ:) তাঁর পরিবার পরিজনকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আকস্মিকভাবে তিনি আগুন দেখতে পান। "কিন্তু এই সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। এ সফরটি কি রকম ছিল, কোত্থেকে তিনি আসছিলেন এবং কোথায় যাচ্ছিলেন- এসবের বিস্তারিত বিবরণও সূরা নাম্‌লে নেই। সূরা ক্বাছাছে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।" ('তাফসীরুল কুরআন', ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সূরা ক্বাছাছের ভূমিকা।)

সূরা নামলে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সূচনা বক্তব্য (১-৬ আয়াত), উপসংহার (৯১-৯৩ আয়াত) এবং দুটি ভাষণ। প্রথম ভাষণ ৭-৪২ আয়াতে এবং দ্বিতীয় ভাষণ ৪৩-৯০ আয়াতে।

এ সূরার সূচনায় বলা হয়েছে: কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ঈমান, সালাত কায়েম, যাকাত আদায় এবং সর্বোপরি পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং সে মর্মে জবাবদিহিতা করতে প্রস্তুত ব্যক্তি ও জাতিই শুধু কুরআনের হিদায়াত ও সুসংবাদ লাভের অধিকারী। কিন্তু পরকালে অস্বীকৃতিই হচ্ছে কুরআন থেকে হিদায়াত ও সুসংবাদ লাভের ক্ষেত্রে মস্ত বড় বাঁধা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "প্রকৃত কথা এই যে, যারা পরকাল মানে না তাদের জন্যে আমরা তাদের কাজকর্মকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছি। এ কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে। এরা সেই লোক যাদের জন্যে অত্যন্ত খারাপ শাস্তি রয়েছে। আর পরকালে এরাই সর্বাধিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (আয়াত: ৪-৫)

এ সূচনা বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে প্রথম ভাষণে তিন শ্রেণীর লোক-চরিত্রের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্ত হচ্ছে: ফেরাউন, সামুদ জাতির সরদার ও লূত জাতির খোদাদ্রোহী লোকদের চরিত্র। পরকাল অস্বীকৃতি এবং নফসের দাসত্বই তাদের কর্মতৎপরতার সার কথা। কোনো নিদর্শন দেখেও তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না। শুধু তাই নয়, যারা তাদেরকে কল্যাণ ও মঙ্গলময় পথের নির্দেশ করতো তাদেরকেও তারা দুশমন মনে করতো। তারা নিজেদের সব রকমের দুষ্কৃতি ও অনাচারের উপর মজবুত হয়েছিল, যদিও তার জঘন্যতা সম্পর্কে কোনো বুদ্ধিমান

www.pathagar.com

মানুষেরই মনে একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না। তারা এতদূর গাফিল হয়েছিল যে, খোদার আযাব এসে তাদেরকে গ্রাস করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্তও তাদের হুঁশ হয়নি।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হলো হযরত সুলায়মান (আ:)-এর। আল্লাহ তাঁকে এতবেশী সম্পদ, রাষ্ট্র-ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করেছিলেন যে, মক্কার কাফের সরদারগণ তা ধারণা পর্যন্ত করতে পারতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করার তীব্র অনুভূতি তাঁর ছিল এবং তিনি যা কিছু লাভ করেছিলেন তা সবই আল্লাহর দান বলে নি:সন্দেহে বিশ্বাস করতেন, এ জন্যে তাঁর মাথা সবসময়ই আল্লাহর নিকট নত হয়ে থাকত; অহংকার ও দাম্ভিকতার লেশমাত্রও তাঁর চরিত্রে কখনো স্থান পায়নি।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত হলো সম্রাজ্ঞী সাবার চরিত্রের। আরব ইতিহাসের এক প্রখ্যাত সম্পদশালী জাতির উপর রাজত্ব করছিলেন এ নারী। এঁর নিকট সেসব কার্যকারণ বর্তমান ছিল যা যে কোনো লোককে দাম্ভিকতায় নিমজ্জিত করতে পারতো। মানুষ সাধারণত যেসব জিনিসের কারণে গৌরব ও অহংকারে মেতে ওঠে, তা আরবদের তুলনায় তাঁর ছিল অনেক অনেক বেশী। তাছাড়া তিনি ছিলেন এক মুশরিক জাতির সদস্যা। যেমন পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুসরণের কারণে, তেমনি নিজের জাতির লোকদের উপর স্বীয় আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখার জন্যেও শিরক্-এর ধর্ম ত্যাগ করে তাওহীদী দ্বীন কবুল করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু প্রকৃত সত্য যখন তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, তখন তা কবুল করতে কোনো বাধাই তাঁকে বিরত রাখতে পারেনি। কেননা তাঁর গোমরাহী ছিল শুধু এক মুশরিক জাতির পংকিল পরিবেশে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে। লালসার দাসত্ব ও নফসের গোলামীর কোনো রোগই তাঁকে আক্রান্ত করেনি। আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার তীব্র অনুভূতি তাঁর মনকে সব সময়ই কাতর করে রাখতো।

দ্বিতীয় ভাষণে সর্বপ্রথম বিশ্ব-প্রকৃতির কতিপয় সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান মহাসত্যের দিকে ইঙ্গিত করে মক্কার কাফিরদের নিকট একের পর এক প্রশ্ন করে বলা হয়েছে: বল, এসব মহাসত্য কি শিরক্ প্রমাণ করে- যাতে তোমরা নিমজ্জিত হয়ে আছ, না এ আল্লাহর তাওহীদের সাক্ষ্য দেয়, যার দাওয়াত কুরআন মজীদে তোমাদের নিকট পেশ করা হচ্ছে? অত:পর কাফিরদের আসল রোগ নির্দেশ করে বলা হয়েছে, যে জিনিসটা তাদেরকে অন্ধ বানিয়ে রেখেছে, যার কারণে তারা সবকিছু দেখতে পেয়েও কিছুই দেখে না, সবকিছু শুনতে পেয়েও কিছুই শুনে না- সে রোগ হচ্ছে পরকাল অস্বীকার করা। এই পরকাল অস্বীকৃতিই তাদের জীবনের কোনো একটি বিষয়েও কোনোরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বাকী রাখেনি। কারণ তাদের ধারণা ছিল,

www.pathagar.com

যখন শেষ পর্যন্ত সবকিছু মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবে এবং বৈষয়িক জীবনের সমস্ত তৎপরতা একেবারে নিষ্ফল হয়ে যাবে তখন মানুষের জন্যে হক ও বাতিল সমান হয়ে যাবে। মানুষের জীবন-ব্যবস্থা ন্যায় ও সত্য আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না, সে প্রশ্ন তাদের নিকট এ কারণেই কোনো গুরুত্ব লাভ করতে পারেনি। কিন্তু এ আলোচনার উদ্দেশ্য তাদের মনে নৈরাশ্য সৃষ্টি নয়। এও নয় যে, এরা যখন চরম গাফিলতিতেই নিমজ্জিত হয়ে আছে তখন এদের দাওয়াত দেয়াই অর্থহীন। আসলে গাফিলতিতে নিমজ্জিত মানুষগুলোকে জাগ্রত ও সচেতন করে তোলাই এর মূল লক্ষ্য। এ কারণে ষষ্ঠ ও সপ্তম রুকুতে পর পর এমন সব কথা বলা হয়েছে যা লোকদের মনে পরকালের অনুভূতি তীব্রভাবে জাগিয়ে দেয়। এ বিষয়ে গাফিলতি অবলম্বিত হলে তার পরিণাম যে অত্যন্ত মারাত্মক হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। এ দিনের আগমন সম্পর্কে তাদের মনে এমন এক দৃঢ় বিশ্বাস জাগানো বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ নিজের চোখে না দেখেও প্রকৃত অদৃশ্য সত্যকে বুঝতে সক্ষম হবে।

উপসংহারে এক আল্লাহর বন্দেগী গ্রহণের জন্যে কুরআনের মূল দাওয়াত অতীব সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত জোরালোভাবে পেশ করে মানুষকে সাবধান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ দাওয়াত কবুল করা তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণকর। আর এ প্রত্যাখান করা তোমাদের নিজেদের জন্যেই ক্ষতিকর। একে মেনে নেয়ার জন্যে যদি তোমরা সে সব নিদর্শন দেখার অপেক্ষায় বসে থাকো যা সামনে উপস্থিত হওয়ার পর তা না মেনে কোনো উপায়ই থাকে না, তাহলে মনে রেখো, তা হবে চূড়ান্ত ফায়সালা গ্রহণের অন্তিম মুহূর্ত। তখন এ মেনে নেওয়ায় এর কোনো ফলই পাওয়া যাবে না।"

(তরজমায়ে কুরআন মজিদ, সূরা 'আন নামলের' ভূমিকা।)

শিক্ষণীয় বিষয়

কুরআন থেকে শুভসংবাদ এবং হিদায়াত লাভ করার জন্যে অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে এরূপ ঈমানের অধিকারী হওয়া যা–

ক. সালাত কায়েম (আল্লাহর হক),

খ. যাকাত (বান্দার হক, দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচী) আদায় এবং

গ. পরকালে দৃঢ় বিশ্বাসের (আল্লাহ ও তাঁর বান্দার হকের জন্যে জবাবদিহিতার) উপর নিজেকে কায়েম রাখা এবং এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে সর্বদা সচেতন করে। (আয়াত: ১-৩)

* পরকালে অবিশ্বাসীর কাজকর্মকে আল্লাহ তা'আলা চাকচিক্যময় বানিয়ে দেন। এতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (আয়াত:৪-৫)

www.pathagar.com

* আল্লাহ নবী রাসূলদের বন্ধু। (আয়াত: ১০)
* পাপী ন্যায় ও সুন্দর কাজের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত লাভ করতে পারে। (আয়াত: ১১)
* নৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। (আয়াত: ১৪)
* শাসন, কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার অধিকারীদের উচিত সুলায়মান (আ:)-এর মত নিজেদের শক্তি সামর্থকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, সংযমী হওয়া এবং নিজেদেরকে আলোকিত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করা। (আয়াত: ১৯)
* প্রজা বা কর্তৃত্বাধীনের খোঁজ খবর রাখা বাদশাহ, শাসক বা মালিকের জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য। (আয়াত: ২০-২১)
* শয়তানই কাফিরের কাজকর্মকে চাকচিক্যময় করে দেয়, সিরাতুল মুসতাকীম থেকে বিচ্যুত করে এবং আল্লাহর বন্দেগী থেকে দূরে রাখে। (আয়াত: ২৪)
* যে কোনো জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ অপরিহার্য। তবে অন্যায় বা অযৌক্তিক পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়। (আয়াত: ৩২-৩৩)
* যাচাই বাছাই না করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাদশাহ বা শাসকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনুচিত। (আয়াত: ২২-২৮)
* দূতের মাধ্যমে প্রেরিত সংবাদ বা ফরমান লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। (আয়াত: ২৯-৩০)
* ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত দ্বীনের দায়ীর কাছে কোনো ধন-সম্পদই মূল্যবান নয়; সবই তুচ্ছ। (আয়াত: ৩৬)
* কিতাবের জ্ঞানই মূল শক্তি। (আয়াত: ৪০)
* ভাল এবং কল্যাণের জন্যে তাড়াহুড়া করা অনুচিত। (আয়াত: ৪৬)
* শুভ ও অশুভের মূল মাপকাঠি একমাত্র আল্লাহই নির্ধারণ করেন। (আয়াত: ৪৭)
* কাফিরদের সকল চক্রান্তই আল্লাহ সুকৌশলে ব্যর্থ করেন। (আয়াত: ৪৯-৫১)
* জ্ঞানীরাই ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। (আয়াত: ৫২)
* মুমিন এবং পরহেযগারকে আল্লাহ তাঁর গযব থেকে বাঁচান। (আয়াত: ৫৩)
* নবী, রাসূল বা মর্দে মুমীনকে যারা নির্মূল করতে চায় মূলত তারাই নির্মূল হয়। (আয়াত: ৪৯-৫৩)
* অত্যন্ত শক্ত প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় হযরত মূসা (আ:) হযরত সালেহ (আ:), হযরত লূত (আ:) এবং হযরত সুলায়মান (আ:)-এর মত হিম্মতের সাথে লড়ে যাওয়ার জন্যে মুমীনকে সদা তৎপর থাকতে হবে। (আয়াত: ৫৭-৫৮)
* জান-মাল এবং ইজ্জতের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থেকেও দ্বীনের দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রাখতে হয়। (আয়াত: ৫৭-৫৮)

www.pathagar.com

* ফিরাউন, ক্বওমে সালেহ (আ:) ও ক্বওমে লুত (আ:) অসৎ নেতাদের পরমার্শক্রমে নবী রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু সাবার রানী সভাসদদের অসৎ পরামর্শ উপেক্ষা করে সিরাতুল মুসতাকীম খুঁজে পেয়েছে। (আয়াত: ৩২-৪৪)
* মানুষের সিজদা তথা বন্দেগীর যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। (আয়াত: ৩১)
* রাজা, বাদশাহ বা শাসকের কর্তব্য মানুষকে শুধু এক আল্লাহর গোলাম বানানো; নিজের দাস নয়। (আয়াত: ৩১)
* আল্লাহ মানুষের শোকরের মুখাপেক্ষী নন। আত্মকল্যাণের জন্যে প্রত্যেকের উচিত আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হয়ে যাওয়া। (আয়াত: ৪০)
* ইবলিসী বা কুফরী, জাহেলী বা মুশরিকী সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সাহচর্য থেকে দ্রুত অব্যাহতি লাভের পন্থা উদ্ভাবন ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। (আয়াত: ২২-২৬, ২৯-৩৫, ৪২-৪৪)
* সঠিক মূলনীতির উপর থাকার জন্যে সঠিক কর্মপন্থার পাশাপাশি আল্লাহর সাহায্য কামনা এবং নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকা অপরিহার্য। (আয়াত: ২৮-২৯)
* মুশরিকী বা জাহেলী সমাজ চালু রাখার অনুমতি যে কোনো মূল্যবান উপঢৌকন বা সম্পদের বিনিময়ে দেয়া যায় না। (আয়াত: ৩৬-৩৯)
* দুনিয়ার বুকে প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতিকে আল্লাহ পাক তাঁর ওয়াহাদানিয়াত কবুল করার জন্যে যে সময় ও সুযোগ দিয়ে থাকেন তার সদ্ব্যবহার করা অপরিহার্য। (আয়াত: ৪৪)
* রাজত্ব, খিলাফাত, শাসন ক্ষমতা-এ সবই আল্লাহর দান। মুমিন এ জন্যে হযরত সুলায়মান (আ:)-এর মত আল্লাহর শোকর আদায় করে। আর ফাসিক, মুনাফিক, কাফির একে প্রজা বা অধীনস্থদের উপর জুলুমের হাতিয়ার বানিয়ে নেয়। (আয়াত: ৪০)
* আল্লাহর জমীনে দ্বীন কায়েমের জন্যে তবলীগে দ্বীনের পাশাপাশি হযরত সুলায়মান (আ:) -এর মত সর্বাত্মক জিহাদের কর্মসূচী থাকাও অপরিহার্য। (আয়াত: ২৯-৩১,৩৬-৩৭)
* আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের অবাঞ্ছিত বা অশুভ শক্তি মনে করা এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। (আয়াত: ১৩-১৪, ৪৮, ৫৬-৫৮)
* পরিবার গঠন এবং মানব প্রজননের শাশ্বত প্রক্রিয়া পরিহার করে যারা কৃত্রিম ও অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হয় এবং এ জঘন্য কাজে বাধা দানকারীদের উপর চড়াও হয় তারা আল্লাহর গযবে ধ্বংস হওয়ার উপযোগী। (আয়াত: ৫৪-৫৮)
* অস্বাভাবিক ও অবৈধ উপায়ে যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করে নারীর প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রদর্শন মূর্খতারই বহি:প্রকাশ। (আয়াত: ৫৫)

www.pathagar.com

* প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের সূচনায় আল্লাহর হাম্‌দ এবং তাঁর নেক বান্দাদের প্রতি সালাম পেশ করা সুন্নত ও মুস্তাহাব। (আয়াত: ৫৯)
* সৃষ্টিক্ষমতা ও কুশলতায়, ব্যবস্থাপনা ও ফরিয়াদ শ্রবণে, পথ প্রদর্শনে ও রিযিক দানে, গায়েবের জ্ঞানে এবং যমীনকে আবাসযোগ্য করার ক্ষেত্রে আল্লাহই একক এবং শ্রেষ্ঠ। তাঁর তুল্য কেউ বা কোনো কিছুই নেই এবং হতে পারে না। (আয়াত: ৫৯-৬৬)
* ইসলামের দুশমনদের হঠকারিতা, ষড়যন্ত্র ও শঠতা দেখে দ্বীনের মুজাহিদদের কুণ্ঠিত হওয়া বা সংকোচবোধ করার কোনো কারণ নেই। (আয়াত: ৭০)
* হিদায়াত লাভের অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে অন্তর, শ্রুতি এবং স্মৃতিশক্তিকে কাজে লাগানো এবং সত্যের অনুসন্ধানে সদা তৎপর থাকা। (আয়াত: ৮০-৮১)
* মহাবিপর্যয় এড়ানোর জন্যে সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎকাজে বাধা দানের কর্মসূচী অব্যাহত রাখা অপরিহার্য। (আয়াত: ৮২)
* মানুষ তার বুদ্ধি-বিবেককে হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছে কি না সে জন্যে হাশরের ময়দানে আল্লাহর কাছে জাবাবদিহি করতে হবে। (আয়াত:৮৪)
* মানুষ আত্ম-যুলুমের কারণে আখিরাতে আযাবের স্বাদ আস্বাদন করবে। (আয়াত: ৮৫)
* দিনের ঔজ্জ্বল্যে এবং রাতের প্রশান্তির বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে ঈমানদারদের জন্যে অনেক শিক্ষণীয় উপাদান নিহিত রয়েছে। (আয়াত: ৮৬)
* কিয়ামতের ধ্বংস ও বিপর্যয়ে মুমিনগণ আতংকমুক্ত থাকবেন, কাফেরগণ হবে শংকিত ও বিচলিত। (আয়াত: ৮৯)
* আখিরাতে একমাত্র আমলের ভিত্তিতেই মানুষের মূল্যায়ন হবে। (আয়াত:৯০)
* সকল বিরুদ্ধতা, নির্যাতন ও বৈরি পরিবেশে ইসলামের উপর অবিচল থাকা এবং কুরআনের দাওয়াত দেয়া মুমিনের জন্যে অপরিহার্য। (আয়াত: ৯১-৯২)
* মানুষের উচিত নিজের কল্যাণের জন্যেই আল্লাহর আনুগত্য করা। (আয়াত:৯২)
* মানুষ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে না বিদ্রোহ করে তার খরব তিনি পুরোপুরিই রাখেন। (আয়াত: ৯৩)
* সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা, কুরআনের দাওয়াত দেওয়া, মানুষকে সচেতন ও সতর্ক করা এবং প্রয়োজনে এ জন্যে জান ও মাল আল্লাহর পথে নির্দ্বিধায় উৎসর্গ করা প্রতিটি মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য। (আয়াত: ৯১-৯২)

হে আল্লাহ! এই 'সূরাতুন্-নাম্‌লের' শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর উপর আমাদেরকে পরিপূর্ণ আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অর্থনৈতিক আদর্শ

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

পৃথিবীতে যুগে যুগে অনেক চিন্তাবিদ, সংস্কারক ও বিপ্লবীর আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু তাদের একজনের আদর্শের সাথে অন্যের আদর্শের কিছু ক্ষেত্রে অমিল এবং অন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল দেখা যায়। এ ধরনের আদর্শের নেতাগণ সমাজে যে পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করেন, তার দ্বারা ব্যক্তির অভ্যাস ও আচরণে এবং বাস্তব জীবন-দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ, চূড়ান্ত এবং বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হয় না। সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা প্রশ্নে ক্যাপিটালিজম ও কম্যুনিজমের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে। কিন্তু জীবনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার প্রশ্নে এই দুই আদর্শের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। মানব রচিত মতবাদ মাত্রই সীমাবদ্ধতার অধীন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবী ও রাসূল ছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শের ভিত্তিতে তিনি একটি সর্বাত্মক বিপ্লব বা total revolution, সার্বিক রূপান্তর বা total transformation এবং সামগ্রিক পরিবর্তন বা total change -এর প্রবর্তন করেন। তিনি মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সর্বাত্মক বিপ্লব সাধন করেছেন, তাদের মধ্যেকার দৃঢ়মূল অভ্যাসগুলি বদলে দিয়েছেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার-বিবেচনার মানদণ্ড এবং চিন্তার প্রক্রিয়া-পদ্ধতি, সমাজ কাঠামো, আর্থিক বিন্যাস, কল্যাণ ও স্বার্থের ধারণা, বিশ্বদৃষ্টি, জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি সব কিছুতে পরিবর্তন সাধন করেছেন। শরীয়াহর বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রক শক্তির অধীনে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ, নৈতিক আচরণ ও অভ্যাস, তাদের খাদ্য গ্রহণ ও পানাভ্যাস, বিবাহ ও তালাক, ক্রয় ও বিক্রয় সব কিছুকে বিন্যস্ত করেছেন। তাদের সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের আলোকে ঢেলে সাজিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সার্বাত্মক বিপ্লবের উৎস এবং ভিত্তি হলো ওহি বা আল-কোরআন। আল-কোরআনই তার অর্থনীতিরও উৎস এবং ভিত্তি। আল্লাহর বিধানের আলোকে তার প্রদর্শিত ও প্রতিষ্ঠিত সেই অর্থনীতিকেই আমরা ইসলামী অর্থনীতি নামে অভিহিত করছি।

অর্থনীতির আধুনিক ব্যাখ্যা ও ইসলামী অর্থনীতি

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রকে পৃথক অর্থনীতি হিসাবে স্বীকার করার কারণ হলো সম্পদে

www.pathagar.com

ব্যক্তির মালিকানা সম্পর্কে এদের আলাদা ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। সম্পদে ব্যক্তির মালিকানা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এই দুই অর্থনীতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আধুনিক বিবেচনাতেও ইসলামী অর্থনীতির আলাদা অবস্থান স্বীকৃত।

ক. পুজিবাদী ব্যবস্থায় মালিকানার নীতি হলো:

১. সম্পদ অর্জন ও ভোগের ব্যাপারে ব্যক্তি নিরংকুশভাবে স্বাধীন;
২. সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ কোন নৈতিক শৃংখলার বিধান গ্রাহ্য করে না;
৩. ব্যক্তি-মালিকানা নিরংকুশ হবার দরুন এবং নৈতিক শৃংখলার অনুপস্থিতির কারণে সুদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মেরুদণ্ড বা ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।
৪. পুঁজিবাদের ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মোটিভেশন বা মূল প্রেরণা হিসাবে কাজ করে ব্যক্তিস্বার্থ। পুঁজিবাদী দর্শন অনুযায়ী ব্যক্তিস্বার্থই ব্যক্তিকে দক্ষভাবে কাজ করতে উৎসাহ যোগায়।

খ. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়

১. ব্যক্তির মালিকানা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত;
২. মালিকানা রাষ্ট্রের;
৩. ব্যক্তি সামর্থ অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করবে;
৪. ব্যক্তি-মালিকানা অস্বীকৃত হবার কারণে সমাজতান্ত্রিক সমাজে আভিধানিক অর্থে সুদের কোন প্রয়োজন নেই।

গ. ইসলামী ব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা

বিশ্ব জগত ও তার মধ্যকার সকল সম্পদের নিরংকুশ মালিক আল্লাহ তায়ালা। মানুষের জীবিকা ও অর্থনীতির সমুদয় উপায় উপকরণ তিনিই প্রাকৃতিক বিধানের ওপর সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তার একচ্ছত্র মালিকানাধীন সম্পদ হালালভাবে অর্জন ও ব্যবহারের জন্য তার সৃষ্ট মানুষকে মনোনীত ও নিযুক্ত করেছেন। মানুষ এই সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম ও বিধান মেনে চলবে।

সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারের ব্যাপারে ইসলামের নৈতিক শৃংখলাগুলো হলো:

১. মানুষ সম্পদ ব্যবহার করবে ইহকালীন ও পরকালীন হাসানাহ বা সুন্দর এবং ফালাহ বা কল্যাণকে আহরণ করার জন্য;
২. তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হবে আদল বা ন্যায় বিচার এবং ইহসান বা দয়া প্রতিষ্ঠা;
৩. তারা মারুফ বা কল্যালমূলক ইন্সটিটিউশন কায়েম করবে এবং এভাবে তারা নিজেদের জীবনকে সকল বোঝা-বন্ধন থেকে মুক্ত করবে।

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনৈতিক মূলনীতি ও নৈতিক শৃংখলার সার কথা হলো:

১. সম্পদ অর্জনে অবৈধ পথ অনুসরণ করা যাবে না। প্রতারণা বা অন্য কোনভাবে অন্যের হক নষ্ট করা চলবে না এবং অন্য কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা যাবে না।

২. সম্পদ ব্যবহারে হালাল-হারামের নীতি মানতে হবে। হালাল খাতে ও হালাল পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত করতে হবে।

৩. সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহার করা চলবে না।

৪) সম্পদে একক ব্যক্তির একচেটিয়া কর্তৃত্ব বা উত্তরাধিকার বা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত রাখা যাবে না, বরং সম্পদ বন্টন ও বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ইসলামী অর্থনীতির এই নৈতিক শৃংখলার বিধানকে আধুনিক ইসলামী অর্থবীতিবিদগণ জুলুম ও শোষণমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক ভারসাম্যমূলক অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পরিশোধ পদ্ধতি বা Filter Mechanism নামে অভিহিত করেছেন।

সাধারণ অর্থনীতির 'অর্থনৈতিক মানুষ' ও ইসলামী অর্থনীতির 'ইসলামী মানুষ'

বস্তুবাদী অর্থনীতিতে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ নিয়েই শুধু আলোচনা করা হয়। আর সেই অর্থশাস্ত্রের ভাষায় মানুষ হলো অর্থনৈতিক মানুষ। কিন্তু ইসলাম মানুষের সার্বিক আচরণ অবিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করে। এই ইসলামী পরিভাষায় মানুষ হলো ইসলামী মানুষ।

অর্থনৈতিক মানুষদের সাথে ইসলামী মানুষের পার্থক্য হলো:

ক. ইসলামী মানুষ ভোক্তা হিসাবে কিংবা উৎপাদক হিসাবে সার্বভৌম নয়, সার্বভৌমত্ব শুধুই আল্লাহর।

খ. ইসলামী মানুষ ইহকালীন ও পরকালীন উভয় প্রয়োজনে বিশ্বাসী এবং উভয় জগতের কল্যাণ ও তৃপ্তি আহরণের প্রত্যাশী, যা শুধু অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা অসম্ভব।

গ. ধর্মনিরপেক্ষ তথা বস্তুবাদী অর্থনীতিতে বস্তুগত উপাদানই মানব কল্যাণের একমাত্র উপকরণ। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে মানব কল্যাণ কেবল বস্তুগত লক্ষ্যের মধ্যে সীমিত নয়। ইসলামী মানুষ পণ্য বা সম্পদ ও সেবা পেলেই শুধু তৃপ্ত হয় না। ভোগের তৃপ্তির চাইতে ত্যাগে সে কখনো বেশী তৃপ্তি আহরণ করে, যার কোন ব্যাখ্যা বস্তুবাদের কাছে নেই।

ইসলামী মানুষের আচরণের ফলে সমাজে সীমিত সম্পদ নিয়ে অসীম চাহিদা পূরণের সংকট জটিল হয় না। অর্থনৈতিক আচরণে নৈতিক শৃংখলার নীতি ও হারাম-হালালের সীমা মেনে চলা এবং বাহুল্য বিলাসিতা বর্জন ও অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দানের প্রেরণার কারণে ইসলামী মানুষের চাহিদার একটা

www.pathagar.com

সীমা থাকে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যক্তির সকল অর্থনৈতিক আচরণের প্রেরণা বা মোটিভেশন হলো ব্যক্তিস্বার্থ। কিন্তু একজন ইসলামী মানুষ শুধু ব্যক্তি স্বার্থে কাজ করে না। তার সামনে মোটিভেশন হলো আল-কোরআনের সেই আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে: "যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন ব্যবসা আশা করে যাতে কখনো লোকসান হয় না।"

ইসলামে আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন

আর্থ-সামাজিক কাঠামো পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতির দুটি প্রধান কর্মকৌশল হলো সুদ-প্রথার বিলোপ সাধন ও যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন।

১. সুদ-প্রথার বিলোপ সাধন

সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধিকারী সকল আর্থিক কাজের বিরুদ্ধে ইসলামের ব্যাপক প্রতিরোধের একটি বিশেষ উদাহরণ হলো রিবা বা সুদের বিরুদ্ধে ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি। এর কারণ:

ক. সুদ একচেটিয়া মুনাফাখোরীর একটি মাধ্যম আর মুনাফখোরী সুদ তথাকথিত নিরঙ্কুশ বর্তমান মালিকদের হাতে সমাজের বিপুল মানুষের সম্পদ পুঞ্জিভূত করে।

খ. সুদ সম্পদ বন্টন ও বিকেন্দ্রিকরণের পথে বাঁধা দেয়। সুদ প্রথা সুদের আয় থেকে বিত্তবানদের ব্যয় নির্বাহের যে সুযোগ দেয়, তা এ কারণেই ইসলাম অনুমোদন করে না।

গ. সুদ ব্যবসায়ীর নৈতিকতা নষ্ট করে, তাকে শাইলক বানায়।

ঘ. উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন হবার কারণে সুদ কর্মস্পৃহা নষ্ট করে।

ঙ. সুদের ফলে পণ্যের ওপর একটি বাড়তি মূল্য যোগ হয়। ফলে পণ্যের দাম বাড়ে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস এবং মজুরের প্রকৃত মজুরী এর ফলে কমে যায়।

চ. সুদের প্রসারের ফলে সমাজে মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্র, উৎপাদন হ্রাস, আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেয়।

২. যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন

সমাজের দরিদ্র জনগণের সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত করার শোষণ-যন্ত্ররূপী সুদ নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ইসলাম সমাজের ধনী মানুষের সম্পদ অভাবী ও বঞ্চিতদের মধ্যে সঞ্চালিত ও প্রবাহিত করার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার বিধান করেছে যাকাত প্রবর্তনের মাধ্যমে। যাকাত হলো ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় এবং ইসলামী অর্থ কাঠামোর এক অনন্য ভিত্তিস্তম্ভ। যাকাত হলো সমাজের সম্পদকে যথাযথ মানব কল্যাণে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা। ধনীদের সম্পদ দরিদ্রদের মাঝে বাধ্যতামূলকভাবে প্রবাহিত করার এমন আরেকটি ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোন

www.pathagar.com

মতবাদ, চিন্তা বা দর্শনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আহলে নেসাবদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে তা নেসাব পরিমাণের কম সম্পদের অধিকারী তথা দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষদের মাঝে বন্টন ও বরাদ্দ করার একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা ইসলামী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যাকাত ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য পূর্ব শর্ত।

যাকাতের বৈশিষ্ট্য

১. এটি কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয়, বরং বাধ্যতামূলক লেভি। বছরে একবার যাকাতের রিটার্ণ তৈরী করে সে অনুযায়ী যাকাত পরিশোধ করা ফরয বা বাধ্যতামূলক। এটি সম্পদের বাধ্যতামূলক পুনর্বন্টনের অনন্য প্রক্রিয়া যা মানুষে মানুষে সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা।

২. যাকাতের খাত ও হার অপরিবর্তনীয়। যাকাত দাতা যাকাতের ভোক্তা নন। অন্য দিকে অন্যান্য করের খাত ও হার পরিবর্তনযোগ্য এবং করদাতা করের ফসল ভোগ ও ব্যবহার করতে পারেন।

৩. একটি মুসলিম দেশে অন্যান্য কর আদায়ের অভিন্ন কাঠামোতেই যাকাত আদায় সম্ভব। যাকাত আদায়ের পাশাপাশি অন্যান্য কর আদায়ের কাজও চলতে পারে। তবে কর প্রদানকারীর জন্য যাকাতের টাকা রিবেট সুবিধা পাবে। একজন মুসলিম দ্বৈত করের সম্মুখীন হবেন না।

ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার পর রাসূল (সা.) ঘোণষা করেন: "যদি কেউ সম্পত্তি রেখে মারা যায়, তবে তা তাদের উত্তরাধিকারীরা পাবে; আর যদি কেউ এতিম বা বিধবা রেখে মারা যায় তবে তার উত্তরাধিকারী আমি।"
এই ঘোষণা থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট নীতি পাওয়া যায়।

নাগরিক চাহিদা পূরণের তিন স্তর

ইসলামী রাষ্ট্রে সম্পদ প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন এবং সম্পদ ভোগের অগ্রাধিকার নিরূপণের দায়িত্ব সরকারকে পালন করতে হয়।
ইমাম শাতিবী ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য অগ্রাধিকার নিরূপণের তিনটি স্তর উল্লেখ করেছেন। যথা:

ক. জরুরিয়াত: অত্যাবশ্যকীয় বা life saving চাহিদা;
খ. হাজাত: মৌলিক প্রয়োজনসমূহ;
গ. তাহসানিয়াত: উৎকর্ষ সাধন বা জীবন-মানের উন্নয়ন;

রাষ্ট্র সম্পদ প্রাপ্তির আলোকে প্রথমে নাগরিকদের জরুরী প্রয়োজনসমূহের যোগান নিশ্চিত করবে, এর পরের ধাপে মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ করবে। সমাজের সকল মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ মিটানোর পরই রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য আরাম বৃদ্ধিকারী উপাদানসমূহ যোগান দেয়ার কথা বিবেচনা করবে।
দেশের উৎপাদন, বন্টন, আমদানী-রফতানীসহ সকল বাজেটারী মাধ্যমে এই

www.pathagar.com

ধারাক্রম অনুসরণ করা হলে পৃথিবীর দরিদ্রমতম দেশেও মানুষ তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। পৃথিবীর এ যুগের উন্নয়ন অর্থনীতির সকল প্রবক্তাই এখন একথা বলছেন যে, অভাব ও দারিদ্রের মূল কারণ সম্পদের ঘাটতি নয়, মূল সমস্যা হলো সম্পদ বন্টনের। দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত সেন বলেছেন: "দুর্ভিক্ষের জন্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা নয়, সম্পদের ওপর মানুষের অধিকারহীনতাই দায়ী।"

ইসলামী সরকারের দায়িত্ব নাগরিকদের আর্থিক ও আত্মিক কল্যাণ

ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারের অর্থনৈতিক ভূমিকা শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, আর্থিক দারিদ্র দূরীকরণ ও বেকার সমস্যা সমাধানের মতো বস্তুগত প্রয়োজন পূরণে সীমিত থাকবে না। নাগরিকদের ইহজাগতিক কল্যাণের সাথে সাথে পরকালীন মুক্তির পথও যাতে প্রশস্ত হয় সেদিকে ইসলামী রাষ্ট্রকে মনোযোগী হতে হবে। ইসলামী সরকারের জবাবদিহিতা আখেরাত পর্যন্ত বিস্তৃত। সে কারণে ফোরাতের তীরে একটি কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায় সে জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নিজেকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি মনে করেন।

বর্তমান বিশ্ব ও রাসূল (সা.)-এর অর্থনৈতিক আদর্শ

সম্পদ বন্টনের সমস্যার কারণে সারা বিশ্বের সিংহভাগ মানুষ এখন দারিদ্র সংস্কৃতির মাঝে বাস করছে। পৃথিবীর অধিকাংশ সম্পদ মুষ্টিমেয় হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে পড়েছে। তার পাশাপাশি সম্পদের ওপর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আওয়াজও জোরদার হচ্ছে। অর্থনীতিবিদগণ বিশ্বের বিদ্যমান দারিদ্র পরিস্থিতিকে "দোজখ"-এর সাথে তুলনা করছেন এবং দারিদ্র দূরীকরণের জন্য একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া বা Multidimensional Process তারা তালাশ করছেন। Denis Goalet নামক একজন অর্তনীতিবিদ বলেছেন, বিশ্বকে দারিদ্রের বর্তমান দোজখ থেকে উদ্ধার করার জন্য এমন একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে, যা বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোর খোল-নৈচা পাল্টে দেবে, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি করবে এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এবং কাঠামো ও কৌশলের ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন নিশ্চিত করবে।

বিশ্বের অর্থনৈতিক চেহারা আমূল পাল্টে দেয়ার এই বিপ্লবী প্রত্যাশা পূরণের সকল যোগ্যতা বৈশিষ্ট্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অর্থনৈতিক আদর্শ তথা ইসলামী অর্থনীতিতে বিদ্যমান, এ আলোচনায় তা প্রতিফলিত হয়েছে বলে আশা করি।

লেখক: প্রখ্যাত গবেষক, প্রাবন্ধিক ও ইতিহাসবিদ।

www.pathagar.com

রাসূলে খোদার মিশন, আমাদের বিশ্বাস ও বিজ্ঞাননির্ভর আজকের প্রেক্ষিত

মাসুদ মজুমদার

একটা সময় আসবে যখন মানুষ যুক্তি দিয়ে বুঝতে চাইবে। বিজ্ঞান দিয়ে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করবে। যৌক্তিকতা থাকুক কিংবা নাই থাকুক মানবিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ভুলে যাবে। বিপর্যয়, সত্য মিথ্যার ধরণ ও সংজ্ঞা পাল্টিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হবে। যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সব মিলিয়ে যথেষ্ঠ 'উন্নত' পরিবেশ পরিস্থিতি পৃথিবীর দেশে দেশে বিজ্ঞান প্রযুক্তির জয়জয়কার লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মকে কিংবদন্তী, সনাক্তকালীন ও অচল ভাবা হবে। মানুষ যখন এমনি পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে সভ্যতার দাবীদার সাজবে তখন ঠিক 'বিশ্বাস'-এর অপমৃত্যু ঘটবে? তৌহিদ, আখেরাত, রেসালাত নিয়ে ভাববার প্রয়োজন অনুভূত হবে না– এমন একটি জিজ্ঞাসা পৃথিবীর সেরা সেরা মনীষীদের কথায় জট পাকিয়ে দিয়েছেলো।

হানা আসনোর চিন্তাবিদরা ঘটনার গভীর বিশ্লেষণের দিকে নজর দিলেন। অসংখ্য চিন্তানায়ক ভেবে-চিন্তে অভিমত দিলেন– বিজ্ঞান কখনো ওহী জ্ঞানের সীমানা স্পর্শ করবে না, মানবিক সীমাবদ্ধতা থেকে মানুষ কখনো মুক্তি পাবে না। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি দাজ্জালের মত আর্ভিভূত হবে কিন্তু চিরায়ত সত্য-মিথ্যার দেয়াল ভাঙতে পারবে না, ঘুরে ফিরে মানুষ আল্লাহর চূড়ান্ত এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে। ইতিহাস এভাবেই ভাঙ্গা-গড়ার পটভূমি ব্যাখ্যা করেছে।

এই সময়ে শেষ ও মহানবীর জীবন অধিকতর আলোচিত হবে। প্রতিকূলতার ভেতরও মানুষ বিশ্বাসের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। জীবনের অসঙ্গতিগুলো আবার বিশ্বাস দিয়ে সাজিয়ে তোলা হবে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে এড়িয়ে যায়, আত্মস্থ করে মেঠালিক গুণাবলী সম্পন্ন একদল মানুষ রাসূলে খোদার মিশনকে এতটা বাস্তবভাবে উপস্থাপন করবে যে, 'আধুনিক' মানস মনের অজান্তেই মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওতের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে– এই কি সেই সময়? এমন একটি ছোট্ট জিজ্ঞাসার নিরিখে সামান্য আলোকপাতই আমাদের লক্ষ্য।

বিজ্ঞান মানুষকে প্রচুর দিয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা দিতে পারেনি। জ্ঞানের বিশাল উৎস হলেও বিজ্ঞান জীবনের আংশিক ব্যাখ্যাই দিতে পারে। জন্মের কার্যকারণ বা উদ্দেশ্য নিয়ে বিজ্ঞান ভাবে না। সার্বিক প্রকৃতি ও চিন্তাধারা, নৈতিক ও

www.pathagar.com

মানবিক বিষয়ে বিজ্ঞান কোন জবাব দেয় না। অধিকন্তু পুরো বিজ্ঞান মানুষের সামগ্রিক চিন্তাশক্তির ফসল হলেও সীমাবদ্ধতার বাতাডোরা বন্দী। এই কারণে বিজ্ঞান তাওহীদ ও রিসালাত নিয়ে ভাবতে চায় না, জান্নাত-জাহান্নামকে উহ্য রাখতে চায়। আল্লাহর অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্বের পরিধি নিয়ে বিজ্ঞানের উৎসহ আছে কিন্তু উত্তর সেই। ওহী নিয়ে বিজ্ঞান ভাবতে বসলে বড়জোর ধ্যান লব্ধ জ্ঞানের কথা যাবে, ধ্যান সাধনায় বিজ্ঞানের উৎসাহ আছে কিন্তু এর সাথে ওহী কিংবা ইলহামকে এক করে দেখতে সাহস করে না। বিজ্ঞানের এই খণ্ডিত অবয়ব মগজে রাখলে বিশ্বাস নিয়ে বিব্রত হতে হয় না। বিকৃতির তো প্রশ্নই ওঠে না।

ধরা যাক ওহী নিয়ে বিজ্ঞান ভাবতে বসলো, বিজ্ঞানের কাছে জিবরাইল (আ:) এর অস্তিত্ব কাল্পনাতীতই থেকে যাবে। এই জন্য বিশ্বাসের জন্য বিজ্ঞান সহায়ক, কিন্তু বিশ্বাস বিজ্ঞাননির্ভর নয়। পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানী নবীদের অস্তিত্ব সময় কাল, সমাজ বিনির্মাণ, জন্ম মৃত্যু অস্বীকার করেনি, করবেও না। কিন্তু বিজ্ঞান দিয়ে বিশ্বাসে আসার কোন সুযোগ নেই।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন শাখাই আত্মার ঠিকানা খুঁজে পায়নি। সেই বিজ্ঞানকে আত্মার তিন অবস্থা কিংবা নফসকে খুঁজতে দিলে বিভ্রান্তি অনিবার্য। হাশর অথবা কিয়ামতের জন্য বিজ্ঞানের কাছে হাত পেতে কী লাভ!

আল্লাহ'র রাসূল (সা.) ষষ্ঠ শতকের কোন একসময় জন্ম নিয়েছিলেন, পরবর্তী শতকে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, তিনি নিরক্ষর কিন্তু জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর প্রজ্ঞা, মনীষা, পরিশুদ্ধ জীবনাচার, পরিশীলিত জীবনবোধ, সভ্যতাকে মানবিকতার উৎকর্ষের সেই স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে আজকের সমাজ বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীসহ বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখা তাঁকে ভাবতে আগ্রহী, কিন্তু কেন?

এই আগ্রহের কারণ মাইকেল হার্টের সূচীনির্ভর তালিকা প্রণয়ন নয়, মানবিক বিবেচনায় মানুষ যখনই একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের অবয়ব কল্পনা করে তখনই দৃষ্টিটা ঐ ব্যক্তিত্বের কাছে গিয়ে ঠেকে যায়। বিজ্ঞানকে আচরণবিধির ভেতর আনতে গেলেই রাসূল ভাবনা এসে পড়ে। রোমান ক্যাথলিক, কিংবা প্রোটেস্টেন্টরা যেখানে অন্ধ সেখানটায় গিয়ে বিজ্ঞান হোঁচট খেয়ে বাঁক ঘুরে যায়, সেখানে রাসূল ভাবনা বিজ্ঞানকে হাত বাড়িয়ে ডাকে, আত্মস্থ করে। বিজ্ঞানময় কোরাআনকে হাত ধরাধরি করে চলতে বলে, এই গভীরতা পাশ্চাত্য আজ ভালো ভাবে বোঝে।

হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর সহীফা, দাউদ (আ:) এর যবুর , মুসা (আ:) এর তাওরাত, ঈসা (আ:) এর ইঞ্জিল এর ওপর সংস্করণ নিয়ে কোন মন্তব্যের প্রয়োজন নেই, বাইবেলের সব ক'টি সংস্করণই মানুষের হাতে হয়েছে। কোরান শুধু বলছে এইসব সংস্করণ বিকৃতি-বিভ্রান্তি দিযে ভরে দেয়া হয়েছে। অখণ্ড অবস্থা ও বিনা বিচারে পরম বিশ্বাসে আমরা নাযিলকৃত এমন কিতাবের ওপর নির্ভর করতে পরিনা, কিন্তু এর অধিকৃত অবয়বের উপর বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ। এর একটি হচ্ছে বিশ্বাসগত দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার, অপরটি হচ্ছে অধিকৃত ওহীর আলোকে বিকৃতির বিশ্বাস। অপরাপর আহলে কিতাবীদের সাথে আমাদের বিশ্বাসগত ফারাকটা

www.pathagar.com

এখানেই। অতীতের সকল নবী-রাসূল আমার, আমাদের এই বিশ্বাসের ব্যপ্তি আর অপরাপর আহলে কিতাবীদের বিশ্বাসের গণ্ডি বিজ্ঞান কি দিয়ে ব্যাখ্যা করবে?

ইচ্ছার স্বাধীনতা ও ভাগ্য, পাপের শাস্তি ও হেদায়েত প্রাপ্তি নিয়ে ওহী ভেবেছে, বিজ্ঞান ভাবেনি, যদি ভাবতো তাহলে কি পেতো? চট জলদি বিজ্ঞান বলবে কবর থেকে লাশ তোল, আমরা দুটো লাশের ফারাক খুঁজবো, কেন মানুষ বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়। দু'রকম হয়। এর বেশি কিছু? নিশ্চয়ই নয়।

লাশ তোলার প্রয়োজন নেই। প্রথমেই এমন কোন পাল্লায় তুলে আশ্বাসটা মাপতে চেষ্টা করুন, কোন জবাব পাবেন না, ওহীর বাইরে এই বিশ্বাস মাপবার যন্ত্র মানুষের হাতে নেই।

ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়ে, প্রকৃতির ভেতর নিয়ম রেখে আল্লাহ মানুষকে বলে দিয়েছেন, তোমরা আমার জন্য, আর সকল সৃষ্টি তোমার জন্য। তোমরা ইচ্ছে করলে মাটি ভেদ করে পাতালে হারিয়ে যেতে পার না, পারবে না নি:সীম নীলিমায় লীন হয়ে যেতে। জন্ম-মৃত্যুর বাগডোর ডিঙ্গাতে পারবে না। নিয়তিকে হাতের মুঠোয় পাবে না, বিজ্ঞান সেই আচরণ বিধির সীমা ডিঙ্গাতে পারেনি। বিশ্বাসের জগতে হাত দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

মানুষের সাম্প্রতিক জীবন কি বিশ্বাস তাড়িত নয়? বিজ্ঞান বিশ্বাসকে কখনো ধ্বসিয়ে দেয়, কখনো খসিয়ে দেয়, অধিকাংশ সময় ভ্রান্তির ঝটাজালে জড়িয়ে দেয়, বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়, যদি বিশ্বাসটা নির্ঘাত হয়, বিজ্ঞানের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ, প্রগতি সেখানে অন্ধ, উত্তর আধুনিকতাও সেখানটায় থমকে যায়।

এ জন্য বিশ্বাসের শক্তি বিজ্ঞান শক্তির বিবেচনায় আলাদা এবং অধিকতর শক্তিময়। প্রসঙ্গটা এখানেই, নবী-রাসূল (সা.)রা তাহলে কোন বিশ্বাস লালন করতেন? যার ওপর নির্ভর করে তাঁরা বলতেন, এক হাতে চাঁদ অপর হাতে সূর্য দাও, তাতেও বিশ্বাসের ভেতর পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করবে না। রাসূল (সা.)-এর সেই বিশ্বাস কি এই যুগে ছোঁয়া যায়, ধরা যায়! স্পর্শ ছাড়াও অনুভব করা যায়? হ্যাঁ, যায় বৈকি! বিজ্ঞানের জৌলুস ও ফ্লাড লাইটে সেটেলাইট নেটওয়অর্কের দৌরাত্বের ভেতর বসে যারা বিশ্বকাপ-এর শেষ খেলাটা উপভোগ করেছেন, তারা বিজয়ী ব্রাজিল দলের খেলোয়াড়দের বিশ্বাসটা মাপুন। 'ত্রিত্ববাদী যিশুর সন্তানদের' বিশ্বাসগত দিকটা কি কম উপভোগ্য ছিলো। কেউ কি এর ভেতর ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ অথবা প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রত্যক্ষ করেছেন? আমার ধারণা কেউ পাননি। যে বিশ্বাস খেলার মাঠেও আড়ষ্ঠ হয় না, সেই বিশ্বাস যেমনটিই হোক আমার শ্রদ্ধাটা সেখানে অকুণ্ঠ, এই আচরণ যদি বিশ্ববাসী সেনেগাল, তুরস্ক কিংবা অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে পেতো, তাহলে কি প্রতিক্রিয়া হতো! সেই মন্তব্য উহ্য থাকুক।

প্রসঙ্গটা টেনেছি এই জন্য যে, বিশ্বাসকে বিজ্ঞান ডিঙ্গাতে পারে না, আধুনিকতার ভেতরও যেটি আড়ষ্ট নয়। জীবনোধকে সহজেই বিশ্বাস রাঙিয়ে দেয়, সেই

www.pathagar.com

বিশ্বাসের উৎস ওহী। সেই ওহী রেসালাতকে অনিবার্য করে সেই অনিবার্যতার পরম্পরায় রাসূলে খোদার অধিষ্ঠান বিশ্বাসকে শুধু পূর্ণতা দেয় না, আত্মপ্রত্যয়ের সেই স্তরে নিয়ে যায়, যেখানে দাঁড়িয়ে শুধু কালেমা তাইয়্যেবা ও কালেমায়ে শাহাদাত ছাড়া আর কিছুই উচ্চারণ করা যায় না। অন্তত যুক্তি এবং প্রয়োজন-এর ভিন্নটা বলে না।

যারা বিজ্ঞান দিয়ে আমার বিশ্বাসটা আড়াল করে, আমার 'মডেল কনসেপ্টকে' বিভাজন করে, আমার অস্তিত্ব ও উপস্থিতিকে 'সভ্যতার' সাথে সাংঘর্ষিক করে তারা এই কাজটি করে ঠাণ্ডা মাথায়। কারণ রাহমাতুল লিল আলামীনের পরিচয় পুঁজিবাদ, সমাজবাদকে বর্তমান প্রেক্ষিতে অচল করে দেবে, সাম্রাজ্যবাদের বিদায়ী ঘন্টা বেজে ওঠবে। সভ্যতাকে ঠিকঠাক ঘুরিয়ে দেবে। মজলুম প্রতিবাদী হবে, প্রতিশ্রুত ঈসা মসিহ'র আগমন ও ইমাম মাহদীর উপস্থিতির প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করবে। এটা ধনতন্ত্র ও জড়বাদ কামনা করে না।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক শূন্যতা, সামাজিক ধ্বস, সাংস্কৃতিক দেউলিয়াপনা পীঠটা এখন দেয়ালের শেষ প্রান্তে, এমনি মুহূর্তে মানুষ বিশেষত নতুন প্রজন্ম বিশ্বাস কিনতে চায়। যে বিশ্বাস স্থিতি দেবে, স্বস্তি দেবে, পৃথিবীকে করবে বাসযোগ্য, সর্বোপরি সভ্যতাকে দেবে উৎকর্ষ। এটা ইসলামের নবী ছাড়া আর কারো হাতে নেই, এর যেমন বিকল্প নেই, তেমনি লাগসই অন্য কোন উপমাও নেই। তাহলে বিশ্বাস কেনার এই হাঁটে বিশ্বাসের সংঘাত অনিবার্য। এটাকে কেউ সভ্যতার সংঘাত বললে আমি আপত্তি করবো না। জালেম-মজলুমের লড়াই ভাবলে, বলবো না যথার্থ নয়, কিন্তু সত্য-মিথ্যার সংঘাত যে শুরু হয়েছে সেটা জোর দিয়ে বলবো।

আটলান্টিকের ওপারে কি ঘটলো, হিন্দুকুশে কিংবা খাইবার গিরিশৃঙ্গে কি হচ্ছে, আর্যাবর্তে কেন অস্থিরতা, কৃষ্ণা-কাবেরী কেন রক্তস্নাত, ফোরাতের তীরে আবার কিসের আহাজারী, ফারান সিনাই অথবা জেরুজালেমের কান্নার কারণ কী– এইসব প্রশ্নের জবাব ঐ একটিই, এই সময় একই সাথে মজলুমরা যেমন জালেমের অত্যাচারে জর্জরিত, তেমনি প্রতিবাদীও। ইতিহাস সাক্ষী, মুক্তিকামী মজলুম যখন প্রতিবাদী হয়, মুক্তির দাবীকে শাহাদাতের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে, তখনই একটি সভ্যতার প্রসব বেদনা শুরু হয়। বর্তমান ধ্বংসের ভেতর সেই সৃষ্টি-সুখের উল্লাস আছে, মাতম আর আহাজারীর উত্তর শান্ত্বনার অভয়বাণীও আছে। রাসূলে করীম (সা.) এই সময়ের ইঙ্গিত দিয়েই বলেছেন, কোন কুরবানীই বৃথা যাবে না, মেপে মেপে আল্লাহ এর প্রতিদান দেবেন। কাউকে দেবেন, শাহাদাতের নজরানা দিয়ে, কাউকে দেবেন জালেমের ওপর বিজয় দিয়ে।

লেখক: প্রখ্যাত কলামিস্ট, সম্পাদক, সাপ্তাহিক বিক্রম।

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজ গঠন : প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন

আবু তাহের মোহাম্মদ সালেহ

বাংলাদেশে জনসংখ্যার শতকরা পঁচাশি ভাগ মুসলমান। এত অধিক সংখ্যক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সমাজে ইসলামী নীতিমালা বাস্তবায়নে জনসমর্থন পাওয়া যায় না। সমাজে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড ক্রমাগত ভাবে বেড়ে চলেছে। কিন্তু ইসলামী সংগঠনগুলো এর প্রতিরোধে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না।

দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশ অশিক্ষিত। এদের জীবনযাত্রার মান দারিদ্র সীমার নিচে। ফলে দারিদ্র বিমোচনের নামে এনজিও নামের বিভিন্ন সংস্থা এখানে কাজ করছে। শহরে কি গ্রামে সর্বত্রই এদের অবাধ পদচারণা। বিভিন্ন কর্মসূচীর নামে এরা প্রথমেই মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড বৈষয়িক উন্নয়নের পথে বাঁধা হিসেবে চিহ্নিত করে সাধারণ মানুষকে প্রগতিবাদী করার নামে ধর্মহীন করার চেষ্টা করে।

এরা নারী সমাজের উন্নয়নের নামে বেহায়াপনাকে উসকিয়ে দিচ্ছে। তথাকথিত উন্নয়নের ধারায় একত্রিত হয়ে নারীরা ঘর-সংসার বিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতা ভোগ করছে। ফলে তাদের সন্তানেরা পারিবারিক বন্ধন মুক্ত হয়ে বখাটেপনার সুযোগ পাচ্ছে।

সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের লোকদের মধ্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি মমত্ববোধ আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ইসলামের সঠিক শিক্ষা নেই। নামাজ-রোজার কিছু কিছু অনুশীলন থাকলেও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ তাদের জানা নেই। এদের জন্য ইসলামী শিক্ষার উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাও নেই। সমাজের পুরুষ লোকেরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কিছু কিছু ওয়াজ-নসিহত শোনার সুযোগ পেলেও মহিলাদের দ্বীন শেখার কোন উপায় নেই। কারণ তারা শুক্রবারে মসজিদেও যায় না কিংবা কোন ওয়াজ

www.pathagar.com

মাহফিলে যাওয়ারও সুযোগ পায় না। ছোট বেলায় মক্তবে কিংবা মা-দাদী নানীদের কাছে শুনে শুনে এরা নামাজ-রোজার কিছু কিছু নিয়মনীতি শিখলেও দ্বীন সম্পর্কে বেশি কিছু জানতে পারে না।

সমাজের নিম্ন পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার মূল কেন্দ্র হচ্ছে মক্তব ও মসজিদ। এসব মক্তব ও মসজিদের প্রায় সবগুলোই ব্যক্তিগত ও স্থানীয় উদ্যোগে স্থাপিত হয়। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত থাকে। উপযুক্ত সম্মানীর অভাবে যোগ্য শিক্ষক ও ইমাম পাওয়া যায় না। তাছাড়া এসব শিক্ষক ও ইমাম সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এসব কারণে তারা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ জনসমক্ষে উপস্থাপন করতে পারে না।

সমাজের মানুষ দুনিয়ার সফলতা, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার এবং পরকালের সহজ মুক্তির জন্য পীর-ফকিরের দরবারে ও মাজারে ধর্ণা দিয়ে থাকে। এদেশে পীর-দরবেশের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়ে থাকলেও বর্তমানে ঐ ধারা সমাজে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে না।

বর্তমান সমাজে দুই ধরনের পীর দেখা যায়। এক ধরনের পীর যারা ইসলামের নাম নিয়ে নানা প্রকার অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে। এরা ভণ্ড পীর নামে পরিচিত।

অপরদিকে শরীয়তী পীর নামে পরিচিত লোকেরাও সমাজে তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। পীর সাহেবদের দরবারে কিছু তসবিহ-তাহলীল এবং জিকির-আজকার-মশক করা ছাড়া সাধারণ মানুষ এখানে আর কিছু পায় না। ইসলামী সমাজ গঠনে এদের কোন পরিকল্পনা নেই। নেই কোন বিশেষ কর্মসূচী। ফলে মুরিদদের মধ্যে যারা সমাজের উঁচু শ্রেণীর বিত্তশালী তারাই পীর সাহেবের চারপাশে ঘিরে থাকে। এরা পীর-ভাই পরিচয়ে বৈষয়িক ব্যাপারে পরস্পরের সহযোগিতা নিয়ে নিজের ভাগ্য উন্নয়নের কাজে লিপ্ত থাকে। কার্যসিদ্ধির জন্যে এ শ্রেণীর লোকেরা পীরের দরবারের বড় রকমের নজর-নেওয়াজ দিয়ে মানুষকে পীরের প্রতি আকৃষ্ট করে।

অপরদিকে সাধারণ মুরিদগণ পীর-সাহবের সিন্নি-সালাদ ও উরসের আয়োজনে নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে দু'জাহানের কল্যাণ পেতে চায়। ইসলামের মৌলিক কোন শিক্ষা এখান থেকে লাভ করার সুযোগ থাকে না।

তাবলীগ জামাত সমাজে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে কাজ করছে। তাবলীগ জামাত মানুষকে ইসলামের যে দাওয়াত দিচ্ছে তাতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ কোন রূপ নেই। ইসলামের খণ্ডিত রূপ অনুশীলনের কারণে মূলত: জীবন বিমুখতাই এখানে বড় হয়ে দেখা দেয়। তাবলীগী নেসাবে ব্যাপক সওয়াবের কথা থাকলেও ইসলামের আলোকে জীবন-জীবিকার কোন সমাধান এখানে নেই। ফলে বিশ্ব ইজতেমা এবং

www.pathagar.com

আখেরী মুনাজাতে লোক সমাগম আশানুরূপ হলেও সমাজে ইসলাম বিরোধী নিয়ম-নীতির সয়লাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। এদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোন কর্মসূচী না থাকায় মানুষ জীবন সমস্যার কোন সমাধান এখানে খুঁজে পায় না। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের অসংখ্য সমস্যাকে এড়িয়ে চলার কারণে ইসলামী সমাজ গঠনে এদের কোন ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই।

জামায়াতে ইসলামী সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে ময়দানে কাজ করছে। কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে তাদের সাংগঠনিক মজবুতি এখনো বাড়েনি। জামায়াতের কার্যক্রম কার্যত: শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন পেশাজীবির মধ্যে কার্যক্রম চালু থাকলেও অশিক্ষিত-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে জোরালো সাংগঠনিক কোন কার্যক্রম চোখে পড়ার মত নয়।

শিক্ষিত লোকেরা মূলত: সুবিধাবাদী শ্রেণীর লোক। এরা ঘরোয়া বৈঠক, বক্তব্য-বিবৃতিতে যতটা পারঙ্গম, মিটিং-মিছিলে ততটা পলায়ন পর। ভোটার তালিকায় এদের অনেকেরই নাম থাকে না। তাছাড়া ভোট দেওয়ার ঝামেলায় এরা যেতে চায় না।

জামায়াতের কর্মীদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত চাকুরীজীবি। ইসলামী সমাজ গঠনের প্রচেষ্টায় যে ত্যাগের প্রয়োজন তা চাকুরীজীবী মানুষের কাছে সব সময় পাওয়া যায় না। চাকুরীর কঠোর বিধি-বিধান আন্দোলনের দাবীকে উপেক্ষা করে। ফলে দোলাচলবৃত্তির কারণে সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে এদের খুবই কষ্ট হয়।

যে সব লোক ছাত্র জীবনে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে জীবনের মায়া ত্যাগ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর তাদের অনেকেই ঝিমিয়ে যায়। চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মিলাতে গিয়ে তারা আন্দোলনের চেয়ে কর্মজীবনের সফলতাকে প্রাধান্য দেয়। ছাত্র জীবনে আন্দোলন করতে গিয়ে যে ক্ষতি তাদের হয়ে যায় তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য তারা অধিক তৎপর থাকে। ফলে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা শিথিল হয়ে পড়ে।

দুনিয়ার যে কোন আন্দোলনের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সমাজের নিম্ন পর্যায়ের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরাই বেশি কুরবানী দিয়ে থাকে। সমাজ বা শাসক পরিবর্তনে এদের ভূমিকাই মূখ্য। শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা মূল নেতৃত্বে থাকলেও গণজোয়ার সৃষ্টি না হলে কোন নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভব হয় না।

গণতান্ত্রিক সমাজে নেতার যোগ্যতার চেয়ে ভোটার সংগ্রহের যোগ্যতার উপরই নির্ভর করে জয়-পরাজয়। শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা বাধ্যবাধকতা না থাকলে ভোটার তালিকায় নাম আছে কিনা তা দেখার সময় পায় না। আবার ভোটার হলেও

www.pathagar.com

ভোট কেন্দ্রের ঝক্কি-ঝামেলার কারণে অনেকে ভোট দিতে যায় না। ফলে ভোটের আন্দোলনে এদের ভূমিকা গৌণ।

অপরদিকে সাধারণ জনগণ তার পছন্দের প্রার্থীর জন্য জীবন বাজি রেখে ভোট সংগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজের ভোট তো দেয়ই, পারলে জাল ভোট দিয়েও পছন্দের প্রার্থীকে জয়ের মুখ দেখাতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে থাকে। অনেক সময় সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তির নির্দেশে এরা ভোট প্রার্থীর পক্ষে কাজ করে থাকে।

যুদ্ধের ময়দানে সাধারণ সৈনিকদের কুরবানীর মাধ্যমেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। সেনাপতি কমাণ্ডারদের ভূমিকা সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করার মধ্যেই সীমিত থাকে।

প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের নিয়েই ইসলামী সমাজ গঠন করেছিলেন। এজন্য সমাজপতি এবং ধনীক শ্রেণীর লোকেরা রাসূল (সা.)-এর সমালোচনা করেছে।

অতীতে আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তনের জন্য যেসব আন্দোলন হয়েছে সেগুলো সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততার কারণে সম্ভব হয়েছে। পঞ্চাশের দশকের ভাষা আন্দোলন বিশ্ব ইতিহাস সৃষ্টির ধারায় একটি রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মাধ্যমে একাত্তরের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। নব্বইয়ের দশকে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন করে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটিয়েছে। এর পরবর্তী সরকারগুলোর পতনের ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ জন-জোয়ার বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে।

অতীতের সেইসব ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সমাজকে অধ:পতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের আলো জ্বালাতে হবে। ইসলাম ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে এ অধ:পতন ঠেকানো যাবে না। এ জন্য চাই তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন।

ইসলামী আন্দোলনের লোকেরা শিক্ষিত শ্রেণীর শহুরে লোক হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষদের নিত্যদিনের সমস্যার সাথে একাত্ম হতে পারে না। সমাজের টাউট বাটপার লোকেরা এদের চারপাশে ঘুর ঘুর করে। এরা জনগণের সমস্যাকে পুঁজি করে ফায়দা হাসিল করে। ফলে সমাজের নেতৃত্ব তাদের হাতেই থেকে যায়। ভোটের সময় এদের কথাই জনগণ শোনে। এ অবস্থায় পরিবর্তনের জন্য সমাজের নিম্নপর্যায়ে সংগঠিত ইসলামী নেতৃত্ব চাই।

বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে বিধায় এদের মধ্যে দারিদ্র বিমোচনের কর্মসূচী নিয়ে কাজ করতে হবে। সাথে সাথে সহজ পদ্ধতিতে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। শিশুদের জন্য মক্তবে উপযুক্ত ইসলামী

www.pathagar.com

শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নারী সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। একজন মায়ের মধ্যে ইসলামের আলো জ্বালাতে পারলে নিশ্চিতভাবে একটি পরিবারকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে।

মসজিদে যোগ্য এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত ইমাম নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে তারা ওয়াজ নসিহতের সাথে সাথে সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারে। বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মক্ষম লোকদের মধ্যে দ্বীনের উপলব্ধি ঘটাতে হবে। এর জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক সহজ কর্মপদ্ধতি তৈরি করতে হবে। অডিও-ভিডিও ক্যাসেটের মাধমে ইসলামের শিক্ষা তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

এমনিভাবে স্থান-কাল-পাত্রের প্রেক্ষিতে বিশেষ কর্মসূচী প্রণয়ন করে জনগণের মন জয় করার মাধ্যমে ইসলামী সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হবে। এর জন্য তৃণমূল পর্যায়ে ত্যাগী কর্মীবাহিনীর মাধ্যমে গণসংগঠন গড়ে তোলা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইসলামী আন্দোলনের কাছে এটাই সময়ের দাবী।

লেখক: সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

www.pathagar.com

আদর্শ মহামানব
হযরত মুহাম্মদ (সা.)

ইকবাল কবীর মোহন

দুনিয়ায় আজ অবধি অগণিত মানুষ এসেছে। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যে সব পরম শ্রদ্ধেয় ও সত্যনিষ্ঠ নবী রাসূলের আগমন হয়েছিল তাদের মধ্যেও মুহাম্মদই (সা.) শ্রেষ্ঠতম মানব ও নবী। তিনি ছিলেন গোটা বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য আদর্শ মানুষ এবং উত্তম আদর্শ। তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমত হিসেবে আগমন করেছিলেন। গোটা মানবতাকে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতেই আগমন ঘটেছিল শেষ নবী মুহাম্মদের (সা.)। নবী ছিলেন মানুষের পথ প্রদর্শক, কল্যাণকামী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।

মহান আল্লাহতায়ালা আল কুরআনে মুহম্মদ (সা.) সম্পর্কে তাই বলেছেন, 'তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রাসূল (দূত) এসেছে। তোমরা বিপদাপন্ন হও তা তার নিকট অসহ্য। সে তোমাদের সবার হিতাকাংখী। বিশ্ববাসীদের জন্য পরম স্নেহশীল।' (সূরা তওবা: ১২৮-১২৯)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন, 'আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। (আল সাবা: ২৮)

রাসূল (সা.)কে উত্তম আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা আহযাব: ২১০)

আল্লাহতায়ালা আরো ঘোষণা করেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে পাঠ করে। তোমাদের পবিত্র করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেয়। (আল বাকারা: ১৫১)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমন এক সময় দুনিয়ায় আগমন করেন যখন গোটা দুনিয়া

www.pathagar.com

ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকচ্ছটা নির্বাপিত হয়ে সভ্যতা ক্ষয়িষ্ণু এক ইন্দ্রিয় সেবায় পর্যবসিত। আসমানী কিতাবধারী ধর্মগুলো স্বার্থান্ধ ও চরিত্রহীন নেতা ও পুরোহিতদের বিকৃত মনোবাসনা ও ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ারে পরিণত। ধর্ম ও সুনীতি বিকৃত, অবহেলিত। বৃহত্তম মানবগোষ্ঠী সমাজপতি ও রাষ্ট্র শাসকদের হুকুমের গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ। নারী জাতি বাজারের পণ্য হিসেবে বিবেচিত এবং মানুষ রক্তপাত ও হানাহানির চরম বিশৃংখলায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সেই সময়ে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল আরো বেশি ভয়াবহ। এমন সময় মানবতাকে জীবনের আলো দেখাতে, সমাজকে সুশৃংখল ও বাসোপযোগী করে তুলে একটি মানবিক ও শান্তিময় সত্যনির্ভর সমাজ কায়েম করতে আগমন ঘটে মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.)। মহান আল্লাহ তাঁকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন সকল মহৎগুণ ও যাবতীয় যোগ্যতার আঁধার হিসেবে। জ্ঞান, দক্ষতা, দূরদর্শিতা, সংস্কারমনস্কতা, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠাসহ যাবতীয় গুণের সমাবেশ ঘটেছিল নবীজীর চরিত্রে। তিনি ছিলেন দূরদর্শী সংস্কারক, বীরযোদ্ধা, নিপুণ সেনানায়ক, সফল ব্যবসায়ী, আদর্শ স্বামী, স্নেহশীল পিতা, সত্যনিষ্ঠ বিচারক, বিশ্বস্ত বন্ধু, দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক, আদর্শস্থানীয় সমাজপতি, অভিজ্ঞ কুটনীতিক এবং অসাধারণ অর্থনীতিবিদ। মহানবীর এ বর্ণিল জীবন এবং বহুমুখি যোগ্যতা, দক্ষতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব মহান আল্লাহতায়ালা যেমন নিজে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, তেমনি তাঁর সহচর সাহাবীরা এবং তার ঘনিষ্ঠজন, এমনকি তার শত্রুরাও অকপটে স্বীকার করেছেন।

মক্কার কাফের কুরাইশরা নবীজীকে ছোটবেলা হতেই 'আল আমীন' বা বিশ্বাসী বলে মান্য করত। তাঁকে সত্যাশ্রয়ী মানুষ ও আমানতদার মনে করতো বলেই তারা তাঁর কাছে আমানত রেখে নিশ্চিন্ত থাকতো। মক্কায় যেখানে বেহায়াপনা, উলঙ্গপনার জোয়ার বইছিল সেখানে মুহাম্মদকে (সা.) কখনও তার ধারে কাছে পাওয়া যায়নি। এটা ছিল নবীজীর নবুয়ত পূর্ব অবস্থা। তখন আরবে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, নারী-পুরুষ উলঙ্গ হয়ে কাবাঘর জেয়ারতের রেওয়াজ ছিল। তখনকার দিনে একসময় কাবাঘর মেরামতের কাজ চলছিল। বালক মুহাম্মদ পাথর টানছিলেন কাবা মেরামতের কাজে। খুব কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। অনেকেই বলছিল, পরনের কাপড় ভাঁজ করে কাঁধে রেখে পাথর টানতে, যেমন অন্যান্য অনেকেই তা করছিল। একজন এসে নবীর কাপড় টেনে খুলে কাঁধে দিতে চাইল জোর করে। এ অবস্থায় মুহূর্তেই নবীজী জ্ঞান হারালেন লজ্জায়। এ ছিল নবীজীর মহান চরিত্রের নমুনা।

নবীজী যখন নবুয়ত পেলেন এবং ইসলামের কথা প্রচার শুরু করলেন তখন মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী কুরাইশরা তা মানতে চাইল না। তারা বলতো, জানি তুমি মিথ্যা বলছো না, তবে বাপ দাদার ধর্ম ছেড়ে নতুন ধর্ম মানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মক্কা যখন বিজিত হল তখন কাফের কুরাইশরা পালাতে শুরু করে দিল। কেননা, তারা ভেবেছিল নবীজীকে তারা বহুবার মেরেছে, দেহ রক্তাক্ত করেছে,

www.pathagar.com

দেশ থেকে তাড়িয়েছে, তিনি অবশ্যই আজ প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু না। সেদিন একটি মানুষও খুন হয়নি। কোন ঘর লুণ্ঠিত হয়নি। কোন মানুষ জুলুমের স্বীকার হয়নি। বরং নবীজী সবাইকে ক্ষমা করলেন। মাফ করে দিলেন। এ ছিল নবীজীর মহান আদর্শ। নবীজীর আদর্শের সংস্পর্শে এসে দুনিয়া সত্য, ন্যায়, সুন্দর ও পবিত্রতায় অভিষিক্ত হল। গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল তার আদর্শ। আরবের হানাহানি, জাতিভেদ, দাসপ্রথা, অশ্লীলতা, মিথ্যা প্রতারণার যুগের অবসান হল চিরতরে। তখন দুনিয়ায় এমন এক রাজত্ব কায়েম হল যা বিশ্বের মানুষ এর পর আজ পর্যন্ত দেখেনি।

তাইতো বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ বলেছেন, 'যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন আদর্শ ও মতবাদসম্পন্ন মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক নায়কের শাসনাধীনে আনা হত, তবে একমাত্র মুহাম্মদই (সা.) সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতারূপে তাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।'

পাশ্চাত্য মনীষী টমাস কার্লাইল নবী মুহাম্মদকে (সা.) শ্রেষ্ঠতম উল্লেখ করে বলেছেন, 'জগতের আদিকাল হতে এ আরব জাতি মরুভূমির মধ্যে বিচরণ করে বেড়াত এক অজ্ঞাত, অখ্যাত মেষ পালকের জাতি হিসেবে। তারপর তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এমন একটি বার্তাসহ সেখানে এক ধর্মবীর পয়গম্বর প্রেরিত হল আর ম্যাজিকের মত সেই অখ্যাত জাতি হয়ে উঠল জগত বিখ্যাত, দীনহীন জাতি হয়ে উঠল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি। তারপর এক শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিমে গ্রানাডা হতে পূর্বে দিল্লী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হল আরবের আধিপত্য। সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীর এক সর্ববৃহৎ অংশের উপর আরবদেশ মহাসমারোহে এবং বিক্রমের সাথে তার দ্যুতি বিকিরণ করেছে।'

বর্তমান পৃথিবীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য প্রকাশনা Encyclopedia Britanica মহানবী (সা.) সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, 'জগতের সকল ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে মুহাম্মদই(সা.) হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা সফলকাম।'

ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান মহানবী (সা.) সম্পর্কে তার অনুভূতি বর্ণনা করে বলেছেন, 'মুহাম্মদের (সা.) ধর্মই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়।'

বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষী Jhon Devenport বলেছেন, 'কোন ধর্মনেতা বা বিজয়ীর জীবনই বিস্তৃতি ও ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের সাথে তুলিত হতে পারে না।'

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমন এক মহামানব ছিলেন যিনি সকল ত্রুটি বিচ্যুতির উর্ধ্বে। সকল পাপ-পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। যাবতীয় দুর্বলতা ও কুসংস্কার হতে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র। তাই পবিত্র কুরআনের আলোকে যে সমাজ মহানবী (সা.) রচনা করেছিলেন তা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বোতভাবে গ্রহণীয় এবং কল্যাণকর।

www.pathagar.com

মহানবী (সা.) তার জীবদ্দশায় মানুষের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দিক নির্দেশনা এবং চলার পাথেয় বাতলে দিয়েছেন। মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যেখানে রাসূলের (সা.) দিক-নির্দেশনা নেই। কথা, চলা, ব্যবহার, স্বাস্থ্য, পরের অধিকার, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব, রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী, বৈদেশিক সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি কোনটাই নবীজীর দিক-নির্দেশনার বাইরে নেই। পৃথিবীর এমন কোন আদর্শ, এমন কোন নেতা নেই যার মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পথ চলার আলোকবর্তিকা পাওয়া যাবে। তাইতো তাঁর নিকট অবতীর্ণ ধর্ম ইসলামকে আল্লাহ বলেছেন, 'একমাত্র দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।'

মহানবী (সা.) দুনিয়ার কোন শিক্ষক বা শিক্ষালয়ের ছাত্র বা অনুসারী ছিলেন না। তিনি যে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলো পেয়েছিলেন তা স্বয়ং তাঁর এবং আমাদের প্রভু ও মালিক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত। তাই তা ছিল পরিপূর্ণ, নির্ভুল ও কালজয়ী। তাইতো জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে মহানবী (সা.) যে উৎসাহ ও নির্দেশনা দিয়ে গেছেন তা আজ পর্যন্ত কোন মনীষী, কোন মহামানবের মুখে উচ্চারিত হয়নি। তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন ফরজ।' জ্ঞানীর মর্যাদাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বকে আরো মহীয়ান করেছেন মহানবী (সা.)। তিনি বলেছেন, 'জ্ঞানার্জনে ব্যবহৃত মসী শহীদের রক্তের চাইতেও মূল্যবান।' জ্ঞানার্জনে মনোযোগী হয়ে মুসলমানরা যাতে শ্রেষ্ঠতম আদর্শকে মহীয়ান করে তুলতে পারে তার জন্য তিনি দূর দূরান্ত গিয়ে হলেও জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশেও যাও।' জ্ঞানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান দান করেন।' জ্ঞান অর্জনকে জান্নাতের পথে অগ্রসর হবার সহজ পথ বলে উল্লেখ করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার জন্য পথ চলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন।' ইলম হাসিলে যারা ব্যাপৃত তাদের কাজকে গুরুত্ব দিয়ে নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে।' ইলম অর্জনকারী দ্বীনের মর্মকথা যেমন সহজে বুঝে এবং সে অনুযায়ী আমল করার সুযোগ পায় তেমনি তার জন্য আল্লাহর রহমতের দ্বারও খুলে যায়। দুনিয়ার সবাই, এমনকি ফেরেশতারাও তাঁর জন্য কল্যাণ কামনা করতে থাকে। এ প্রসংগে নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'আর ফেরেশতারা জ্ঞান অর্জনরত ছাত্রদের জন্য নিজের ডানা বিছিয়ে দেন। আর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে এমনকি পানির মাছও আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।'

ইলম অর্জনে জ্ঞান পিপাসার্ত মুসলমানরা নবীজীর নির্দেশ, উৎসাহ ও প্রেরণায় একদিন নিরলস চেষ্টা চালিয়েছিল। তাই এক সময় আকাশের নীলিম রহস্য,

www.pathagar.com

সমুদ্রের গভীরতায় লুকানো তত্ত্ব, পদার্থের সীমাহীন শক্তি, রোগ জটিলতা সমস্যা ও জীবনের নানান জটিল বিষয়ে তারা নব নব অবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিল। ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় মুসলমানরা অর্জন করেছিল সাফল্য। আজকের যে আধুনিক বিজ্ঞান তার ভিত্তিমূল তৈরী করেছিল মুসলমানরাই।

বিশিষ্ট মনীষী Robert Brifo এ কথারই স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে, 'আধুনিক বিজ্ঞান শুধুমাত্র চমকপ্রদ আবিষ্কার বা যুগান্তকারী তত্ত্বকথার কাছে ঋণী নয়, আধুনিক বিজ্ঞান তার অস্তিত্বের জন্যই মুসলমানদের নিকট চির ঋণী।'

উপমহাদেশের প্রখ্যাত নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞানের অবদানকে স্বীকার করে বলেছেন, 'প্রাচীনকালে মিশর, চীন বা ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার কোন নিদর্শন আমরা পাই না। প্রাচীন গ্রীসে এর ছিটেফোটা লক্ষ্য করা যায়। রোমেও এটি অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু আরবদের এ অনুসন্ধিৎসা ছিল। সুতরাং তাদেরকেই আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা যায়।'

একটি আধুনিক এবং কল্যাণকামী আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের ব্যাপারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে নীতি ও ব্যবস্থার প্রবর্তন করে গেছেন তা আজও বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলোর কোনটাই নবীজীর আদর্শ ব্যবস্থার সাথে তুলনীয় নয়। এক্ষেত্রেও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির প্রবর্তক। আদর্শ শাসন পদ্ধতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্থিতি ও উন্নতি, মানুষের অধিকার সংরক্ষণ এবং মানবাধিকার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে নবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) দিক-নির্দেশনা অনন্য ও কালজয়ী আদর্শ। তিনি তার মদীনা সনদ এবং বিদায় হজ্বে মানবাধিকার, সাম্য, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্বের যে সুষম ঘোষণা দিয়েছেন তা আজ চৌদ্দশত বছর পরও আধুনিক পৃথিবী প্রণয়ন করতে পারেনি। মহানবীর মদীনা সনদ সম্পর্কে (Charter of Medina) পাশ্চাত্য মনীষী Willaim More বলেন, 'It reveals the man (the Prophet) in his real greatness, a mastermind not only of his own age, But of all ages;

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পবিত্র কুরআনের সূরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর বাণী, 'বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই' অথবা সূরা কাসাসের ৭০ নং আয়াতে বর্ণিত মূলনীতি 'তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, দুনিয়া ও আখিরাতের সব প্রশংসা তারই। বিধান তারই। তোমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে' –এর আলোকে যে জীবন পদ্ধতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়নীতি ঘোষণা করেছেন তা অনন্য, অসামান্য। ইসলামী এ আইনকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে।

বিখ্যাত মনীষী Admond Bark এর ভাষায়, 'মুসলিম আইন মুকুটধারী সাম্রাজ্য হতে সামান্যতম প্রজা পর্যন্ত সকলের জন্য সমনাভাবে প্রযোজ্য। ইহা এমন একটি আইন যা জগতের সর্বোত্তম পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং সর্বোৎকৃষ্ট আইন শাস্ত্রের সহিত ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।'

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসকদের জবাবদিহীতা, দায়িত্ব, কর্তব্য এবং নীতিপরায়ণতার যে নীতি মহানবী (সা.) নির্দেশ করে গেছেন তা অসামান্য। শাসককে বিনয়ী, ন্যায়বান, সদাচারী হতে এবং অন্যায় অশ্লীলতা ও সীমালংঘন হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহতায়ালা। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে, 'যে সকল মুমিন তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তুমি বিনয়ী হও।' (সূরা শুয়ারা: ২১৫)।

আল্লাহতায়ালা আরো বলেছেন, 'এবং বস্তুত আল্লাহ, তোমাদেরকে ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তিনি নিষেধ করেছেন অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ ও সীমালংঘন। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।' (সুরা নাহল: ৯০)

ইসলাম রাষ্ট্রের শাসককে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা ইনসাফ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।' (সূরা হুজরাত: ৯)

শাসকদের দায়িত্ব সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' অন্যায়কারী শাসকের জন্য জান্নাত হারাম ঘোষণা করে নবী (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তার কোন বান্দাকে প্রজাসাধারণের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর সে যদি তার সাথে প্রতারণা করে, তবে সে যে দিনই মরুক, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।' কোন শাসককে স্বৈরাচারী না হবার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে নবী (সা.) বলেছেন, 'স্বৈরাচারী শাসক সে ব্যক্তি যে জনগণের প্রতি কঠোর ও অত্যাচারী। কাজেই তুমি সতর্ক থাকবে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না হও।' শাসক বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্বের প্রজাদের চাহিদা ও সেবা নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়ে নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'যাকে আল্লাহ মুসলমানদের শাসক নিযুক্ত করেন এবং সে তাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও দারিদ্রাবস্থা দূর করার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না আল্লাহও কিয়ামতের দিন তাঁর প্রয়োজন, চাহিদা ও দারিদ্র পূরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।' ন্যায়পরায়ণ শাসককে কিয়ামতের দিন আল্লাহ রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। এক হাদিসে নবী করীম (সা.) উত্তম শাসকের নমুনা পেশ করে বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক ও ইমাম তারা যাদের তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদের ভালবাসে।'

একটি সুশীল, উন্নত ও কল্যাণকামী সমাজ তথা রাষ্ট্রগঠনে নবী করীম (সা.) সে সমাজের মানুষের অধিকারগুলো যেভাবে নিশ্চিত করেছেন তা অনন্য। তিনি সামাজিক স্থিতি, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যেসব মূলনীতি ঘোষণা করেছেন তার কোন তুলনাই নেই।

উঁচু-নীচু, ছোট-বড় ভেদাভেদ তুলে দিয়ে নবী করীম (সা.) মানুষের মর্যাদা এবং সম্মানকে নিশ্চিত করেছেন। বিদায় হজ্বের ভাষণে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলিমের ভাই। সুতরাং কেউ কারো প্রতি অবিচার করো না।

www.pathagar.com

অনারবদের উপর আরবদের এবং আরবদের উপর অনারবদের প্রাধান্যের কোন কারণ নেই। সমস্ত মানুষ আদম হতে এবং আদম মাটি থেকে উৎপন্ন।'

সমাজ থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, জুলুম, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, চুরি, ডাকাতি, খারাবি ইত্যাদি নির্মূল করে একটি আদর্শ ও সর্বোৎকৃষ্ট শান্তির সমাজ কায়েমে মহনবী (সা.) যে নির্দেশাবলী জারী করেছেন তা পৃথিবীর কোন ধর্ম, মতবাদ বা সনদে সে ভাবে পরিপূর্ণ গৃহীত হয়নি। সমাজের ভাংগন, বিশৃংখলা এবং অধ:পতন এড়াতে তিনি এসব মানবীয় দোষত্রুটিগুলোকে ত্যাগ করার সাথে আখেরাতের মুক্তি, কল্যাণ ও দুনিয়ার শান্তির জন্য গ্যারান্টি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। বিদায় হজ্বের শেষ ভাষণে নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পরের সাথে ঝগড়া ও বিবাদে লিপ্ত হয়ো না।' নরহত্যা, চুরি ও ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করে তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন, 'শিরক করো না। অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না। চুরি করো না। ব্যভিচার করো না।' জুলুম অত্যাচার থেকে দূরে থাকতে নবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা জুলুম থেকে দূরে থাক। কেননা, জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোয়ায় পরিণত হবে।'

তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণের জমিতে জুলুম করবে কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।' মিথ্যার পরিণতি দোযখ হিসেবে ঘোষণা করেছেন নবী (সা.)। তিনি বলেছেন, 'মিথ্যাচার পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার মানুষকে দোযখে নিয়ে যায়।'

হিংসা-দ্বেষ মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় এবং পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। সমাজে সৃষ্টি করে বিশৃংখলা ও ক্রমেই সমাজ হয়ে উঠে অস্থিতিশীল।

তাই নবী করীম (সা.) এই দুষ্টতা বা দোষ হতে বেঁচে থাকার জন্য বলেছেন, 'তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। কেননা হিংসা মানুষের ভাল গুণগুলো এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যেমন আগুন শুকনো কাঠ বা ঘাস ভস্ম করে ফেলে।' ধোকা-প্রতারণা সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।'

এর সাথে গীবত, পরচর্চা, পরনিন্দা, কাউকে অবজ্ঞা করা, ঝগড়া ফাসাদ করা, গর্ব অহংকার করা ইত্যাদিকেও আল্লাহ যেমন নিষিদ্ধ করেছেন মহানবীও (সা.) এগুলোকে ঘৃণিত কাজ বলে এ থেকে বিরত থাকার তাগিদ দিয়েছেন। গীবত সম্পর্কে সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাই এটাকে ঘৃণা করবে।'

নবী করীম (সা.) গীবত সম্পর্কে বলেছেন, 'যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে সে-ই সর্বোত্তম মুসলমান।' নবী করীম (সা.) অন্যত্র বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিসের (জিহ্বা) নিশ্চয়তা দিতে পারবে আমি তার বেহেশতের জন্য জামিন হতে পারি।'

www.pathagar.com

চোখলখুরী সম্পর্কে নবী (সা.) বলেছেন, 'চোখলখোর বা কুটনামীকারী কখনো বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না।' কোন মুসলমানকে অবজ্ঞা বা অবহেলা না করার জন্য রাসূল (সা.) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির খারাপ হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করে।'

সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য ওয়াদা পূরণের প্রতি যত্নবান হওয়ার জরুরী। তা না হলে ভুল বুঝাবুঝি এবং সামাজিক অনাস্থা ও পারস্পপরিক বিরোধ ও অশান্তির জন্ম হতে পারে। ওয়াদা রক্ষার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা ওয়াদা পূর্ণ কর। কেননা ওয়াদা সম্পর্কে তোমাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে'। (সূরা বনী ইসরাইল-৩৪)

এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যার মধ্যে ৪ টি দোষ পাওয়া যাবে সে মুনাফিক, তার একটি হলো যখন সে ওয়াদা করে তা সে ভংগ করে।'

গর্ব বা অহংকার পতনের মূল। এটা ব্যক্তি বিশেষের যেমন পতন ঘটায় তেমনি সমাজ বা রাষ্ট্রের পতনকেও তরান্বিত করে। এ থেকে বাঁচার জন্য নবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা বিনয়ী হও, যাতে তোমাদের কেউ কারো প্রতি বাড়াবাড়ি না করে এবং কেউ কারো কাছে গর্ব করতে না পারে।'

রাসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ (সা.) দু:খী মানুষ, গরীব, এতীম, অভাবীদের প্রতি ছিলেন সহনশীল এবং রহমতময়। তিনি তাদের অধিকার সংরক্ষণে ছিলেন সদা সতর্ক। আমাদের আধুনিক সমাজ বা রাষ্ট্র যে সব মানুষকে ঘৃণা করে এবং তাদের গ্রাস কেড়ে নেয় তাদের প্রতি রহমদীল এবং যত্নবান হবার জন্য নবী করীম (সা.) মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। নবীজীর এ আদর্শিক চেতনার কারণেই গোটা দুনিয়ার ছোট বড়, আমীর-ফকীর, আশরাফ-আতরাফ সব ধরনের মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসে জড়ো হয়েছিল, খুঁজে পেয়েছিল প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা। দুর্বল, নি:স্ব ও গরীব লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার জন্য আল্লাহপাক কুরআনে বলেছেন, 'আর তাদের দিক থেকে অন্যদিকে তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না।' (সূরা আল কাহাফ: ২৮)

নবী (সা.) নি:স্ব-দুর্বল সম্পর্কে বলেছে, 'নি:স্ব মুসলমান ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক উত্তম।'

বিদায় হজ্বের ভাষণে নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'কোন দুর্বল মানুষের উপর অত্যাচার করো না, গরীবের উপর অত্যাচার করো না।'

ইয়াতীম ও নি:স্বদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'অতএব তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর ব্যবহার করো না এবং যাঞ্চাকারীদের ধমক দিও না।' (সূরা দোহা: ১০)

রাসূলও (সা.) এ ব্যাপারে ইয়াতীমদের প্রতি তার মমত্ব প্রকাশ করে বলেছেন, 'ইয়াতীমের লালনকারী ও আমি বেহেশতে একত্রে থাকবো।'

আল্লাহর নবী (সা.) প্রতিবেশী এবং অমুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে মহান

www.pathagar.com

ভূমিকা পালন করেছেন তা দুনিয়ার মানুষকে শুধু বিস্মিতই করেনি, পৃথিবীতে এনে দিয়েছিল এক সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব। তিনি দাস-দাসী ও গোলামদের অধিকারের ব্যাপারেও ছিলেন সমভাবে সচেতন। প্রতিবেশীর অধিকার এবং ক্রীতদাস ও গরীবদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তার সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করো। নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকিনদের প্রতি এবং নিকট প্রতিবেশীর প্রতি, দূর প্রতিবেশীর প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করো।' (সূরা নিসা: ৩৬)

এ সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি পূর্ণ মোমেন নয় যে দু'বেলা পেট ভরে আহার করে, আর তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে।'

নবী করীম (সা.) আরো বলেছেন, 'যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরপদ নয় সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।' একটি সুন্দর ও সুসম্পর্কমূলক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ স্থিতিশীল সমাজ নির্মাণে প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালনে মহানবীর সেকি অসাধারণ হেদায়ত! ক্রীতদাস অথবা চাকর-বাকরদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণেও নবীজী ছিলেন সচেতন।

তিনি বলেছেন, 'কোন নাক কাটা হাবশী গোলামকেও যদি তার যোগ্যতার জন্য তোমাদের আমীর বা শাসক বানানো হয়, তবে তার অনুগত থাকবে।'

তিনি আরো বলেছেন, 'গোলাম বা চাকর তোমাদের ভাই। কাজেই তোমরা যা আহার করবে তাই তাদের খাওয়াবে। তোমরা যা পরিধান করবে তাই তাদের পরাবে।'

সমাজের স্থিতি ও সংহতির জন্য সমাজে যারা অমুসলিম, সংখ্যালঘু বা বিধর্মী তাদের প্রতিও কোন অন্যায় আচরণ না করে সমঝোতা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন মহানবী (সা.)। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত কোন অমুসলমান নাগরিককে অত্যাচার করবে বা তার প্রাপ্য কম দেবে কিংবা তার উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করবে বা তার মনতুষ্টি ছাড়া তার কোন বস্তু হস্তগত করবে তবে আমি এরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদী হবো।'

কি অপূর্ব মহানবীর বাণী। আজকের তথাকথিত সুসভ্য পাশ্চাত্য কিংবা ধর্ম নিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী মনীষী বা রাষ্ট্র নায়কের আছে কি এমন কোন মনোভাব, যাদের রাষ্ট্রে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হিসেবে নিরাপদ! সেটা তো কল্পনাই করা যায় না। বরং সেখানে মুসলমান সংখ্যলঘুরা নির্যাতিত নিপীড়িত এবং রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে উদ্বাস্তু কিংবা বিতাড়িত। আর মুসলিম দেশগুলোতে সংখ্যালঘুদের অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটাই মহানবীর (সা.) বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব।

আমরা আজকাল নারী মুক্তির জন্য, নারীদের অধিকারের জন্য উচ্চকিত হই। নারীদের অধিকারের জন্য অবদান রাখায় আমরা অনেকে স্মরণ করি Kate Millet,

www.pathagar.com

Germaine Greer, Mary wilston কিংবা Margarate sanger এর নাম। অথচ তারা যে নারী মুক্তির কথা বলেছেন, যে সমাজের নারী মুক্তির চেষ্টা করেছেন সে সমাজে নারী মুক্তি তো আসেই নি বরং নারীদের তারা টেনে এনে তুলে দিয়েছে নর পিশাচদের ভোগ্যপণ্য রূপে, তাদের করেছে নগ্ন বিকৃত। পণ্য সামগ্রী হিসেবে ঠেলে দিয়েছে প্রতিযোগিতামূলক অমানবিক শ্রম কষ্টের পথে। যার ফলে নারীরা অহরহ হারাচ্ছে সম্ভ্রম, লুণ্ঠিত হচ্ছে তাদের সতিত্ব, ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে তাদের স্নেহময়ী মাতারূপী মাতৃত্ব। অথচ মহানবী (সা.) অনেক পূর্বেই নারীদের মুক্ত করে মাতা ও ভগ্নির মর্যাদা দিয়েছিলেন। মহানবী নারীদের মুক্তি এমন এক সময় করলেন যখন তাদেরকে পাপের বোঝা মনে করা হত, নারীদের সম্ভোগের সামগ্রী বলেই শুধু ব্যবহার করা হত। মেয়েদের জীবিত কবর দেয়া হত, কোন সম্পদ বা সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার মেনে নেয়া হত না। ইসলামের আগমনের সাথে সাথে নারীদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন মহান আল্লাহতায়ালা। কন্যা সন্তানদেরকে যখন ঘৃণার চোখে দেখা হত তখন আল্লাহ্ বললেন, 'তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।' (সূরা শুরা: ৪৯) নারী ও পুরুষের সমান অবদানকে বুঝানোর জন্য আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার।' (সূরা হুজরাত: ১৩)

মহান আল্লাহ কন্যা সন্তানকে অবজ্ঞা না করার জন্য সতর্ক করে বলেছেন, 'তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনোকষ্টে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে লোকসমাজ হতে নিজেকে লুকায়। সে ভাবে, হীনতা সত্ত্বেও সে ওকে রাখবে, না মাটিতে পুতে দেবে। সাবধান! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা কত নিকৃষ্ট। (সূরা নাহল : ৫৯-৫৯)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) নারীদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর বাণীগুলো মানুষকে শুনালেন। তিনি নারীদের মুক্তি, সম্মান ও মর্যাদার জন্য আল্লাহ প্রদর্শিত গাইড লাইনের আলোকে আরো বললেন, 'কারো যদি কন্যা সন্তান ভুমিষ্ট হয় আর তাকে যদি সে পুতে না ফেলে, তাকে যদি অপমানিত না করে এবং তাকে উপেক্ষা করে যদি সে পুত্র সন্তানের পক্ষপাতিত্ব না করে তবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।' নারীদের অধিকার নিশ্চিত করতে গিয়ে মহানবী (সা.) বিদায় হজ্বের ভাষণে ঘোষণা করলেন, 'হে জনমণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের উপরও তাদের তেমন অধিকার আছে।'

নারীদের অধিকারকে নিশ্চিত করতে তিনি বায়তুলমালে 'নারী পুরুষের সমান অধিকার' এবং স্ত্রী কর্তৃক অর্জিত সম্পদে 'স্ত্রীর একারই অধিকার' সংরক্ষণ

www.pathagar.com

করেছেন। স্ত্রীর সারা জীবনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তিয়ে নারীর মর্যাদাকে বাড়িয়েছেন মহানবী (সা.)। নারীদের সাথে কোন দুর্ব্যবহার যেন না করা হয় তার জন্য মহানবী (সা.) বললেন, 'তোমরা পরস্পর পরস্পরকে নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করবে। কেননা তারা তোমাদেরই অংশ। তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছো।' মহানবী (সা.) নারীকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল ঘটনা। পাশ্চাত্য মনীষী Prierre Crite এর ভাষায় 'মুহম্মদ (সা.) সম্ভবত: পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ নারীমুক্তির প্রবক্তা ছিলেন।'

এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহানবী (সা.) মানুষকে দিক নির্দেশনা দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, ও ব্যক্তিগত পর্যায়েই শুধু নয়, তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দিক নির্দেশনা দিয়ে মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ সাধনের পথকে উন্নত করেছেন। মানব জীবনে অর্থনৈতিক বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জীবন চলার পথে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রাসূলে করীম (সা.) এর অর্থনৈতিক দিক-নির্দেশনার মুলনীতি ছিল, সকল নাগরিকের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। সবার জন্য সুবিচার ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। ক্ষতি, বিপর্যয় ও জুলুমের পথকে বন্ধ করা, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা, অভাবী ও দুখী মানুষের অধিকারকে সুনিশ্চিত করা। জীবিকা অর্জনের ব্যাপারে শ্রমের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'নিজস্ব শ্রমে অর্জিত রিযিকের চাইতে উত্তম রিযিক আর নেই।' আরো বলেছেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার পাওনা মিটিয়ে দাও।' ব্যবসায় একচেটিয়া পুঁজিকে নিরুৎসাহিত এবং সম্পদে সম অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'সে সব লোকদের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও যারা সোনা, রূপা পুঞ্জিভূত করে অথচ তা আল্লাহর পথে খরচ করে না।' (তওবা: ৩৪)

আল্লাহ আরো বলেছেন, 'তাদের ধন সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।' (আল যারিয়াত: ১৯)

অর্থ ব্যবস্থাপনায় মানুষ যাতে জুলুম নিপীড়নের স্বীকার না হয় সে জন্য মহান রাব্বুল আলামীন সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।' (বাকারা: ৩৮)

সুদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'সুদ দাতা, সুদ গ্রহীতা, সুদের দলিল লেখক, হিসাব রক্ষক এবং সাক্ষীদের উপর অভিসম্পাত'।

সুদ বিহীন এবং শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত হালাল রুযী রোযগারের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আল্লাহ মহানবীর (সা.) এর মাধ্যমে কায়েম করেছিলেন তাতে দুনিয়ায় এমন এক অর্থ ব্যবস্থা কায়েম হয় যেখানে সমাজে যাকাত গ্রহণ করার মত একটি লোকও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

ইসলামের অর্থনীতি যাকাতভিত্তিক এক সুষম অর্থব্যবস্থা। এর ফলে কারো আকাশ ছোঁয়া ধনী হবার সুযোগ যেমন নেই তেমনি সমাজে বঞ্চিত ও অর্থহীন মানুষের সমাবেশ থাকার সম্ভাবনাও নেই। এ সমাজ হয় এক সুখী সমাজ। যে সমাজে ধনী গরীবের ব্যবধান খুবই কম। যাকাত সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'যাকাত মুসলিম সমাজের ধনীদের নিকট হতে আদায় করা হবে এবং সে সমাজের গরীবের মধ্যে বণ্টন করা হবে।' এতে সমাজ হয়ে উঠে আত্মনির্ভর ভারসাম্যপূর্ণ এবং বলিষ্ঠ।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শের কয়েকটি ছিঁটেফোটা দিক নিয়ে উপরে আলোচনা করা হল মাত্র। মানব জীবনের সার্বিক বিষয়াবলী নিয়ে নবী মুহম্মদ (সা.) প্রণীত ও নির্দেশিত বিধান ও নির্দেশনা সম্বলিত হাজার হাজার বই রচিত হয়েছে। তার কথা, কাজ ও আদেশ নিষেধের বিধান নিয়ে লিখতে গেলে এর কোথায় যে শেষ হবে তার হিসেব করা অসম্ভব। কোন মনীষী কিংবা দার্শনিকের পক্ষে এত ব্যাপক বিস্তৃত ও পরিপূর্ণ একটি জীবন বিধানের পরিবেশনা কল্পনাই করা যায় না। তিনি তাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। সর্বশ্রেষ্ঠ আইন ও বিধানের প্রবর্তক। একজন সর্বসেরা রাষ্ট্রনায়ক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক। মুহাম্মদ (সা.) সবচেয়ে উত্তম স্বামী, পিতা ও বন্ধু। তিনি মানবতার মুক্তিদূত। মুহম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী এবং অনাগত বিশ্বের মুক্তির কাণ্ডারী। তাই তো আজও দুনিয়ায় যে মানুষের প্রতি প্রতিনিয়ত দরূদ, সম্মান ও সালাম পেশ হয় তিনি একমাত্র মুহাম্মদ (সা.)। যার ভালবাসায় মানুষ মদীনায় ছুটে যায় দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে, তিনি প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)। যার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় হাসি মুখে জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাখো মানুষ, তিনি নবী মুহম্মদ (সা.)।

সেরা নবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে মনীষী Alfred the Lamartin এর অমর সেই উক্তিটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তাহলো 'দার্শনিক, বাগ্মি, ধর্ম প্রবর্তক, আইন প্রণেতা, মতবাদ বিজয়ী ধর্মমতের এবং প্রতিমাবিহীন উপাসনা পদ্ধতির পুনরায় সংস্থাপক, বিশটি পার্থিব সাম্রাজ্যের এবং একটি ধর্মসাম্রাজ্যের সংস্থাপক মুহম্মদ। যে সমস্ত মাপকাঠি দ্বারা মানবীয় মাহাত্ম পরিমাপ হয়ে থাকে সেগুলোর প্রত্যেকটির আলোকে বিবেচনা করা হলে আমরা একথা সহজে জিজ্ঞাসা করতে পারি, কোনো মানব কি তাঁর অপেক্ষা মহত্তর ছিল?

আমরা আজকের ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ, অনাচার-অত্যাচার জর্জরিত আর রক্তপাত হানাহানিতে ক্ষতবিক্ষত দুনিয়ার মানুষ 'রাহমাতুল্লিল আলামীনের' 'উসওয়াতুন হাসানা' বা সর্বোত্তম আর্দশের দিকে যদি ফিরে যেতে পারি তাহলেই কেবল প্রকৃত মুক্তি, শান্তি, নিরাপত্তা খুঁজে পেতে পারি। আল্লাহ মানবতাকে, বিশেষ করে মুসলিম জাতিকে সেভাবে জেগে উঠার তৌফিক দিন। আমিন।

www.pathagar.com

ঢাকার স্থান নামে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রভাব

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

স্থান নামের ইসলামী ঐতিহ্য সৃষ্টির আদিকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। বেহেশত থেকে আদি পিতা হযরত আদম (আ.)কে বর্তমান শ্রীলংকার যে স্থানে পৃথিবীর ছোঁয়া দেন সে পর্বত শৃঙ্গটি আজও আদমশৃঙ্গ নামেই পরিচিত। আদি পিতার পদচিহ্ন সেখানে আজও নাকি অক্ষয় হয়ে আছে।

হযরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়া (আ.) দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর আরব দেশের আরাফা ময়দানে পুনরায় একে অপরের সান্নিধ্যে আসেন। আরাফা শব্দের অর্থ চিনতে পারা। হযরত আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.) দীর্ঘ সময়ের বিচ্ছিন্নতার পর যে স্থানটিতে পুনরায় একে অপরকে চিনতে পারেন সেই স্থানটিই 'চিনতে পারা' অর্থাৎ 'আরাফা' নামে নামকরণ হয়।[১] পুনরায় চিনতে পারার এ দিনটি ছিল জিলহজ্ব মাসের নয় তারিখ। হাজী সাহেবগণ পবিত্র হজ্ব পালনের সময় ৯ই জিলহজ্ব তারিখে এ আরাফাত ময়দানে আজও মিলিত হয়ে থাকেন।[২] হযরত আদম (আ.) কেবল প্রথম মানবই নন, তিনি প্রথম নবীও বটে। তাঁর এ এ ঐতিহাসিক পুনর্মিলন ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানের নাম 'আরাফা' সৃষ্টির ফলে স্থান নাম সৃষ্টির ইতিহাসেরও সুপ্রাচীন উদাহরণ পাওয়া গেল।

প্রসঙ্গক্রমে একটি আরবী প্রবাদের কথা উল্লেখ করতে হয় ঃ

"মান আরাফা নাফছাহু- ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু।" অর্থাৎ, যে নিজেকে চিনেছে সে তার রবকেও চিনেছে।

আরাফা সংক্রান্ত ব্যাপারে তফসীরে আনওয়ারু তনজিল বা তফসীরে বায়যাবীর বরাত দিয়ে 'কাবা শরীফের ইতিহাস' গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ "হযরত ইব্রাহিম (আ.)কে জিব্রাইল (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তোমার হজ্বব্রত পালনের আহকামগুলির পরিচয় পাইয়াছ কি? হযরত ইবরাহিম (আ.) বলিলেন "হা"। অর্থ রাবি বলিতেছেন যে, ঐদিন হইতেই এই ময়দানের নাম আরাফা ময়দান করা

www.pathagar.com

হইয়াছে। আবার টীকায় বলা হয়েছে, হযরত ইবরাহিম (আ.) বলেনঃ 'আরফ্তু' অর্থাৎ "আমি পরিচয় পাইয়াছি বা চিনিয়াছি"। এ আরফ্তু অর্থাৎ "আমি চিনিয়াছি" শব্দ থেকেই আরাফাত শব্দের উৎপত্তি।

হাজীদের কাছে ছাড়াও আরাফাত আজ সারা বিশ্ববাসীর কাছে একটি পরিচিত পবিত্র ও জনপ্রিয় স্থান নাম।

অন্যান্য নবীগণের নাম এবং স্মৃতিময় ঘটনাকে কেন্দ্র করেও পৃথিবীর স্থানে স্থানে স্থান-নাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬২২ ঈসায়ী সালের ২ জুলাই শুক্রবার মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে পৌছান।[৪] ঐ সময় পর্যন্ত মদীনার নাম ছিল ইয়াসরিব। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনে ইয়াসরিব বাসীগণ শহরের নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'মদীনাতুন্নবী' বা নবীর শহর।

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী বলেন- " The People of Yathreb received the Prophet and his Meccan disciples, who had abandoned home for the sake of their faith, with great enthusiasm; and the ancient name of the city was changed to Medinat Un Nabi," The city of Prophet" or shortly Medina, which name it has borne ever since."[5]

এভাবেই হযরত আদম (আ.)-এর ধারায় শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সংশ্লিষ্টতায়ও 'মদীনা' নাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থান-নামের সূচনা হয়।

সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে নবী পাক (সা.)-এর সংশ্লিষ্টতায় বহু স্থান-নাম হয়েছে এবং আগামীতেও হতে থাকবে ইনশাল্লাহ।

সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের সন্নিকটে রয়েছে 'নবী' নামে একটি স্থান-নাম। এ স্থানে ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী (রহ.) ৬৬১ হিজরী সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইমাম নববী নামে বেশী প্রসিদ্ধ। তাঁর নামটির শেষে 'নববী' পদবীটি 'নবী' নামক স্থান-নামের পরিচায়ক।[৬] এ 'নবী' নামক স্থান নামটিও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্মারকেই রাখা হয়। উল্লেখ্য, ইমাম নববী (রহ.) বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ রিয়াদুস সালেহীনসহ বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা।

আমাদের বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম জন অধ্যুষিত দেশ। এ দেশের সংস্কৃতির সাথে ইসলামের নিবিড় বন্ধন গড়ে উঠার ফলে এখানকার স্থান-নামগুলোতেও এ প্রভাব ব্যাপ্ত হয়।

বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষী F.B. Bradley Burt তাঁর Romance of an Eastern capital (১৯০৬) নামক গ্রন্থে উপমহাদেশের স্থান-নাম বৈশিষ্ট্যে ধর্মের প্রভাবের কথা বলেন। তাঁর মতে "ভারতীয় শহরগুলোর উৎপত্তির সন্ধান করলে পুন: পুন: এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যাবে যে, কতকগুলো ক্ষুদ্র গ্রাম ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়ে একটিমাত্র বিরাট পল্লীতে পরিণত হয়েছে এবং এই সব গ্রামের সবচেয়ে যেটি বড়

www.pathagar.com

ছিল তার উপাসনালয়ের নামে গোটা পল্লীটার নাম হয়েছে।"[৭]

ব্রাডলি বার্টের এ মন্তব্যের প্রতিফলন আমরা আমাদের দেশের স্থান-নামগুলোতে লক্ষ্য করে থাকি। আমাদের দেশের অনেক স্থানের নাম এ দেশে আগত ইসলাম প্রচারকগণের নাম থেকে নামকরণ হয়েছে।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ দেশের কোটি কোটি মানুষের অন্তরে মনমানসে সদা বিরাজ করেন। এ কারণেই জনসংস্কৃতিতেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক গবেষক মরহুম সৈয়দ মুর্তাজা আলী এ বিষয়ে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে "মুসলমান শাসন আমলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্মৃতিতে অনেক স্থানের নামকরণ হয়। সিলেট এবং ঢাকার 'নবীগঞ্জ', কুমিল্লার 'নবীনগর', সিলেটের 'রসূলগঞ্জ' এবং যশোহরের 'মোহাম্মদপুর'-এর নামকরণ হয়েছে হযরত মুহম্মদের (সা.) নাম থেকে। সিলেটে এবং ঢাকা জেলায় দু'টি 'কদমরসূল' গ্রাম আছে। প্রবাদ আছে, হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর পদচিহ্ন এই সব স্থানে স্থাপিত হয়েছিলো।"[৮]

বাংলাদেশের বৃহত্তর পরিধিতে স্থান নামে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রভাব নিরূপণ বক্ষমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট নয়। মসজিদের শহর খ্যাত বাংলদেশের রাজধানী শহর ঢাকার স্থান-নামে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রভাব এবং সংশ্লিষ্টতা নির্ণয়ের একটি প্রয়াস চালানো হয়েছে এ লেখায়। স্থান-নাম গবেষণার প্রক্রিয়ায় প্রথমে সূচীকরণ এবং ক্রম পর্যায়ে যেসব নামগুলোর উৎপত্তির ইতিহাস লেখা সম্ভব সেগুলোর বিবরণ এখানে পেশ করা হলো। অবশিষ্টগুলো সম্পর্কেও ক্রমান্বয়ে লেখার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

ঢাকার স্থান-নাম গবেষণায় দেখা যায়, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নামে এখানকার স্থান-নামের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। বৃহত্তর ঢাকাকে আলোচনায় টানলে অবশ্য এর প্রাচীনত্ব চারশো বছরের সীমানাকে ছাড়িয়ে যায়। রাজধানী শহর হিসেবে ঢাকার বয়স আগামী ২০০৮ সনে চারশো বছর পূর্ণ হবে। তবে পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১) এবং বাংলাদেশ আমলের (১৯৭২-২০০২)-এ পর্যন্ত ঢাকার স্থান-নামে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রভাব পড়েছে বেশী। অবশ্য মোগল আমলে এবং ইংরেজ আমলেও নবী পাক (সা.)-এর সংশ্লিষ্টতায় কিছু নামের স্মৃতি এ মহানগরী ধারণ করে আছে।

এবার ঢাকার যেসব স্থান-নামে মহানবী (সা.)-এর প্রভাব বা সংশ্লিষ্টতা রয়েছে সেগুলোর সূচীকরণ করা যাক।

১. কদম রসূল
২. হোসেনী দালান
৩. ইমামগঞ্জ

www.pathagar.com

৪. পরগনা রসূলপুর
৫. নবীগঞ্জ
৬. কদম রসূল (গেণ্ডারিয়া)
৭. মোহাম্মদপুর
৮. আহমদনগর (পাইকপাড়া, মীরপুর)
৯. আল আমিন রোড (গ্রীন রোড)
১০. রসূলপুর (কামরাঙ্গীর চর)
১১. রসূলপুর (যাত্রাবাড়ী, দনিয়া)
১২. মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটি
১৩. আহম্মদ বাগ
১৪. আল আমিন রোড (ডেমরার কোনা পাড়ায়)
১৫. রসূলবাগ
১৬. নবীনগর
১৭. নবীপুর লেন
১৮. নবীবাগ (কামরাঙ্গীর চর)
১৯. মোহাম্মদিয়া হাউজিং লিমিটেড
২০. মোহাম্মদনগর

সূচীভূক্ত নামগুলো থেকে এযাবৎ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবার বিষয়ভুক্ত কিছু স্থান-নামের বিবরণ পেশ করা যাক:

১. কদম রসূল

নারায়ণগঞ্জের বিপরীত দিকে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে কদম রসূল অবস্থিত। বাহারিস্তান-ই-গায়বি নামক ইতিহাস গ্রন্থের লেখক মির্জা নাথানের মতে, "এক সওদাগর কর্তৃক আরব দেশ থেকে আনিত এ পদচিহ্নটি মাসুম খাঁ কাবুলী খরিদ করে তা এখানে স্থাপন করেন।"[৯] ইংরেজ লেখক ব্রাডলি বার্ট তার রোমান্স অব এন ইস্টার্ণ ক্যাপিটাল গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "আর একটু উজানে নারায়ণগঞ্জ বাঁ হাতে রেখে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে একটা বিরাট ফটকের মধ্যে রসূলের পদচিহ্নবাহী কদম রসূল।"[১০]

আবার তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা গ্রন্থের লেখক মুনশী রহমান আলী তায়েশ বলেন, "কদম রসূলের দরগাহ নারায়ণগঞ্জের বিপরীত দিকে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত। এটি একটি প্রসিদ্ধ দরগাহ এবং এতে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পদচিহ্ন রক্ষিত আছে। দীওয়ান মনওয়ার খান সর্বপ্রথম এ দরগাহ বাড়ি নির্মাণ করেন। তিনি দিওয়ান ঈসাখান মসনদ-ই-আলা-এর প্রপৌত্র।"[১১]

www.pathagar.com

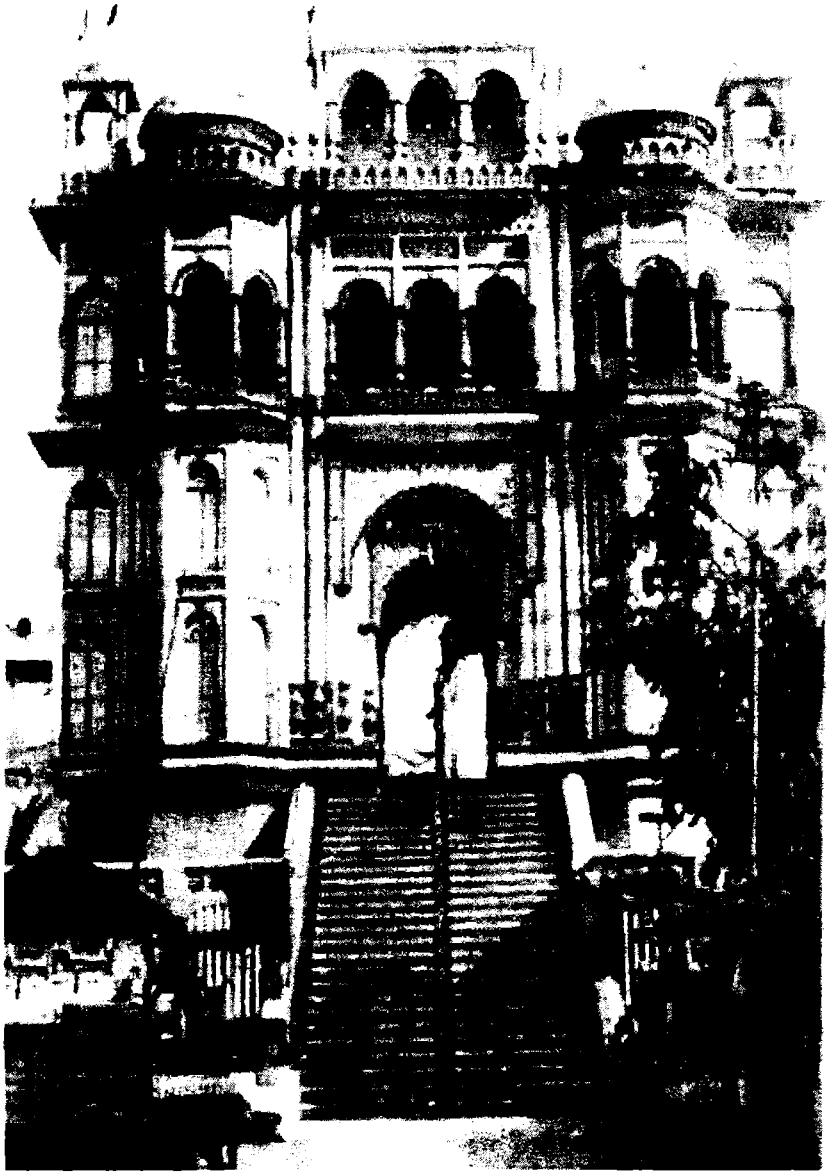

ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরে স্থাপিত 'কদম রসূল'-এর প্রবেশ দরওয়াজা।
ছবি: সোনারগাঁও-পানাম; এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর সৌজন্যে।

www.pathagar.com

নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র কদম বা পায়ের ছাপযুক্ত একটি পাথর এ স্থানে থাকার কারণেই এ স্থানের নাম হয় কদম রসূল। মীর্জা নাথানের লেখায় নামটি কদম রসূল উল্লেখ থাকায় এটি যে আরও পূর্বে স্থাপিত হয়েছে সে ধারণা করা যায়। তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা গ্রন্থের ভূমিকার ফুটনোটে ঈসাখাঁর সেনাপতি মাসুম খান কাবুলী ১৫৮০ সালে এখানে কদম রসূল স্থাপন করেছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

লোকেরা পাথরে পায়ের ছাপযুক্ত এ কদম রসূলকে 'না'ল শরীফ' বলে থাকে এবং অনেকে এতে চুম্বন দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। রাজধানী ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম খান চিশতির (১৬০৮) সেনাপতি ইতিমাম খাঁ (ইতিহাস লেখক মীর্জা নাথানের বাবা) ইন্তেকাল করলে তাঁকে এ কদম রসূলে এনে সমাহিত করা হয়। ১৬২৪ সনে যুবরাজ সম্রাট শাহজাহান অল্প সময়ের জন্য ঢাকায় এলে কদম রসূল পরিদর্শন করেন এবং এর খাদেমকে ৫০০ রূপী দান করেন।[১২] বাদশাহ শাহজাহান তনয় শাহ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০) কদম রসূলের নামে ১৬৪২ সনে ৮০ বিঘা জমির জায়গীর দান করেন। এভাবে ঢাকার নবাব পরিবার পর্যন্ত চলে আসে রাষ্ট্রীয়ভাবে কদম রসূলের দেখাশোনার দায়িত্ব। এখনও প্রতিদিন বাংলাদেশের নানা অঞ্চল থেকে লোকজন এ পবিত্র কদম রসূল পরিদর্শনে আসেন। প্রতি বছর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও ওফাতের মাস রবিউল আউয়ালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কদম রসূলে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে।[১৩]

স্থানটি উঁচু টিলার উপর হওয়ার কারণে মোগল আমলে দমদমা বা কামান দাগানোর প্রয়োজনে দূর্গ হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হবার প্রমাণ মিলে। নিবন্ধ লেখক নিজে একাধিকবার কদম রসূল পরিদর্শন করেছেন এবং এর উপর বিস্তারিত লেখাও প্রকাশিত হয়েছে।[১৪]

২. হোসেনী দালান রোড

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান ৬৩ নং ওয়ার্ডে হোসেনী দালান রোডের অবস্থান। প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর স্মরণে হোসেনী দালান নামে এখানে রয়েছে একটি প্রাচীন ইমামবাড়া।

জেমস টেলর ঢাকায় 'মুসলমানদের উপাসনার স্থান' শিরোনামের আলোচনায় হোসেনী দালান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন। তার ভাষায়: "মুসলমানদের প্রধান প্রধান উপাসনার স্থান হলো ইদগাহ ও হোসেনী দালান।" তিনি ঈদগাহ প্রসঙ্গ উল্লেখের পর বলেন: "পরবর্তীটি (হোসেনী দালান) মীর মুরাদ নামক জনৈক ব্যক্তি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। ইনি সুলতান মুহাম্মদ আজিমের আমলে নাওয়ারাহ মহালের দারোগা পদে এবং জনপূর্ত বিষয়ক কার্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন।

www.pathagar.com

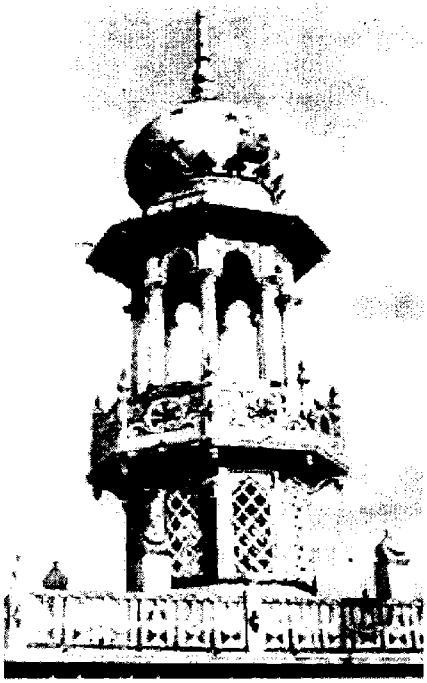

হোসেনী দালান মসজিদের মিনার,
সৌজন্যে: ড. সৈয়দ মাহমুদল হাসান;
ঢাকা দি সিটি অব মস্কস।

হোসেনী দালান সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, মীর মুরাদ স্বপ্নযোগে ইমাম হোসেনকে একটি 'তাজিয়াকান্না' বা শোকগৃহ উত্তোলন করতে দেখেন; ফলে তিনি বর্তমান অট্টালিকাটি গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং এর নামকরণ করেন হোসেনী দালান। মহররমের সময় উক্ত দালানের আলোকসজ্জা ও পবিত্র পর্ব উপলক্ষে গরীবদের খাওয়ানো ইত্যাদির ব্যায়ভার তিনি নির্বাহ করতেন। তৎকালে তার দ্বারা এ জন্য যে ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছিল, প্রদেশের পরবর্তী শাসনকর্তাগণ তা অব্যাহত রাখেন। বর্তমানে (১৮৩৮-৩৯) সরকার এই একই উদ্দেশ্যে নবাবকে বার্ষিক ২,৫০০/- টাকা মঞ্জুর করেছেন।"[১৫]

হোসেনী দালান নির্মাণের পরিচয়জ্ঞাপক শিলালিপির পাঠ এরকম:

'দার জামানে বাদশাহে বাওয়ে কার
আঁ-আজাম উশ্বান সাহে নামদার।
সাখ্তই মাতাস্ সারা সাই ইয়াদ মোরাদ
দারসানে পানজা ওয়াদো-ওয়াবর ইয়াক হাজার।
চুঁকে নামি হাস্ত জাতে পাকে পান্ জেতান
গোপ্ত ই তারিখে দালানে হোসায়নি য়াদগার।[১৬]

বিখ্যাত এ হোসেনী দালান থেকে আজও মহররম মাসে শোক মিছিল বের হয়। দূর-দূরান্তর থেকে সারা বছর লোকজন হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর স্মরণে নির্মিত এ দালান পরির্দশন করতে আসেন।

www.pathagar.com

ঢাকার নায়েব নাজিমগণ বিখ্যাত এ হোসেনী দালানকে কেন্দ্র করে নিমতলী প্রাসাদ থেকে শোক মিছিল করে এ হোসেনী দালানে যেতেন। হোসেনী দালান সংলগ্ন ঢাকার নায়েব নাজিম গণের কবর রয়েছে।[১৭] পরবর্তীতে নিমতলির দিক থেকে হোসেনী দালানগামী রাস্তাটি হোসেনী দালান রোড নামে নামকরণ করা হয়।[১৮] এটি এখন শুধু একটি রোডের নাম নয় বরং দালান সংলগ্ন গোটা এলাকাটিও স্থান নামের মর্যাদায় অভিষিক্ত।

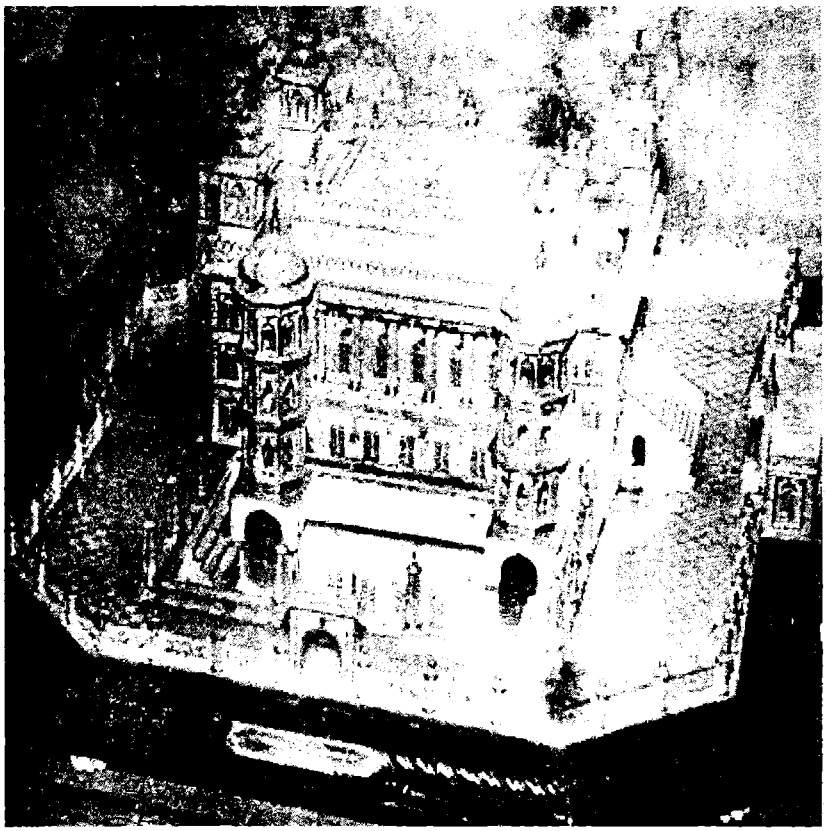

রূপার তৈরী (সিলভার ফিলিগ্রি মডেল) হোসেনী দালানের প্রতিরূপ;
আজিমুশশান হায়দার, এ সিটি এণ্ড ইটস সিভিক বডি।

৩. ইমামগঞ্জ

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান (রা.) এবং ইমাম হোসাইন (রা.)-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যেই ঢাকার ইমামগঞ্জ নামটি নিবেদিত। এ সঙ্গে আজিমুশশান হায়দার বলেন, "The name of Imamganj is to com-

www.pathagar.com

memorate the name of Hazrat Imam Hussain and Hazrat Imam Hasan."

ঢাকার নায়েব নাজিমগণ ছিলেন শিয়া। এ কারণে তাঁরা মুহররমের অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন শিয়া কর্মকান্ডে ব্যাপকভাবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ঢাকার কালেক্টার কর্তৃক কলকাতার বোর্ড অব রেভিনিউতে ১৭৯৬ সালে লেখা একটি পত্রে এ গঞ্জটি ঢাকার নওয়াব বা নায়েব নাজিমগণের অধীনে দেখা যায়। এ সময় ঢাকার নায়েব নাজিম ছিলেন নওয়াব নুসরৎ জং বাহাদুর (১৭৯৬-১৮২৩)। তিনি ঘোষণা করেন যে, ইমামগঞ্জ বাজার থেকে প্রাপ্ত আয় ধর্মীয় পর্বগুলোর ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত থাকবে।[১৯]

৪. পরগনা রসূলপুর (নবীগঞ্জ)

"আরবী ভাষায় রিসালাত শব্দের অর্থ হলো বাণীপত্র, পয়গাম ইত্যাদি। যিনি মানুষের জন্য আল্লাহর বাণী বা পয়গাম বহন করেন তিনিই রাসূল। সহিফা বা আসমানী কিতাব যেসব নবীগণের উপর নাজিল করা হয়েছে তাঁদেরকে বলা হয় রাসূল। পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মানবজাতিকে মুক্তির দিশা দেখানোর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী রাসূলগণের আগমন হতো। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন একাধারে নবী ও রাসূল।[২০] আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত শেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রভাব মুসলিম জনঅধ্যুষিত বাংলাদেশে ব্যাপক। এজন্য 'আমাদের নবী' বা 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' শব্দগুলো উচ্চারণের সাথে সাথে এদেশের মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সা.)কেই বুঝে থাকেন। খিযিরপুরের (বর্তমান নারায়ণগঞ্জ) নবীগঞ্জে ব্যাপকভাবে পরিচিত 'কদম রসূল' রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র কদম মোবারকের ছাপযুক্ত একটি পাথরের কারণেই নামকরণ হয়েছে। এ 'কদম রসূল' এলাকাটি যে পরগনায় অবস্থিত তার নাম রসূলপুর। সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর সাহেবের মতে, "Qadam Rasul is a pre-Moghal shrine in Dhaka district, situated by the river Lakhia, in the village called Nabiganj (opposite Khizirpur in Narayanganj) in pergonah Rasulpur."[২১] ড. সিরাজুল ইসলামের মতে পরগনা বলতে বুঝায় "A revenue district within Zamindari. The Smaller units of a Pargana were termed as *taraf, Joar, Mouja,* etc."[২২]

এ নামটি মুর্শিদকুলী খানের সময়ের পরগনা বিভাজনের সময়ের হতে পারে। ঢাকায় রসূলপুর নামে আরেকটি স্থান নাম রয়েছে কামরাঙ্গীর চর থানায়।

www.pathagar.com

৫. নবীগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ জেলার বিখ্যাত কদম রসূল নামের উৎপত্তি হয়েছে নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র পা বা কদম মোবারকের ছাপযুক্ত একখানা শিলা 'না'ল শরীফ' থেকে। ১৬৪২ সালে ঢাকার সুবাদার শাহ সুজা কদম রসূলের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মিটাতে ৮০ বিঘা জমির বিরাট এলাকা জায়গীর স্বরূপ দান করেন।[২৩] পরবর্তীতে গোটা জনপদটি নবী পাক (সা.)-এর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নবীগঞ্জ নামে নামকরণ হয়। বর্তমানে নবীগঞ্জ একটি পৌরসভা। কদম রসূলের ঠিকানা বা অবস্থান লিখতে গিয়ে লেখা হয়: "Qadam Rasul" "Nabigonj Municipal Area, P.S. Bandor, on the eastern Bank of the river Lakhy, opposite Narayangonj"[২৪] তবে কদম রসূল নামটি যতটা প্রাচীন সে তুলনায় নবীগঞ্জ নামটি খুব বেশী পুরনো নয়। কদম রসূল বক্ষে ধারনকারী নামটি 'নবীগঞ্জ' হওয়া ঐ সময়ের বিদ্বান ব্যক্তিগণের সরস গবেষণা বলতে হবে।

৬. কদম রসূল (গেন্ডারিয়া)

সারা উপ-মহাদেশে বিখ্যাত খিযিরপুর (নারায়ণগঞ্জের) নবীগঞ্জে অবস্থিত কদম রসূল ছাড়াও ঢাকা শহরের গেন্ডারিয়াস্থ রেল স্টেশন সংলগ্ন কদম রসূল নামে একটি স্থান নাম রয়েছে। এখানে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পায়ের ছাপযুক্ত একটি পাথর আছে এ বিশ্বাস থেকেই এলাকাটি কদম রসূল নামে নামকরণ হয়।[২৫] '৮৯ নম্বর ডিস্টিলারি রোড, ঢাকা-৪' এ ঠিকানায় ৫৪০ বর্গফুট আয়তনের মাদ্রাসাযুক্ত কদম রসূল মসজিদ নামে এখানে একটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে।[২৬]

৭. মোহাম্মদপুর

"নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে, ধনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে ও যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।"[২৭] (আল কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত -৭২)

"তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরন করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যানকে অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করব জান্নাতে যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত।"[২৮] (আল কুরআন, সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৯৫)

স্বয়ং আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন মজিদে হিজরতকারীদের প্রতি তাঁর করুণা এবং যারা তাদের আশ্রয় দান করে তাদেরকে পরস্পর বন্ধুরূপে উল্লেখ করেছেন।

উপ মহাদেশে দীর্ঘ ৬শত বৎসর মুসলিম শাসনের পর ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা চলে যায়। দীর্ঘ দুইশত বছরের যুলুম নির্যাতন এবং ইংরেজদের এদেশীয় হিন্দু এজেন্টদের নির্যাতনে অতীষ্ট মুসলমানরা দীর্ঘ লড়াই ও আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের ব্যানারে স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে

www.pathagar.com

খন্ডিতভাবে হলেও উপ-মহাদেশে নতুন করে মুসলিম শাসনের সূচনা করে। ভারতের শোষক ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এ বিষয়টি কোনক্রমেই বরদাশত করতে পারেনি। সে কারণেই ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা হাসিলের চূড়ান্তলগ্নে ১৯৪৬ ও ৪৭ সনে ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলগুলোতে পাইকারী হারে মুসলিম হত্যা শুরু করে। ফলে পাঞ্জাবের ও অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানগণ তদানিন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে এবং বিহার, উরিষ্যা ও কলকাতার মুসলমানগণ তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়। বাংলাভাষাভাষী মুসলমানরা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়লেও উর্দুভাষী বিহার প্রদেশের মুসলমানগণ গোত্রবদ্ধভাবে এক এক এলাকায় আশ্রয় নেয়। হিজরতকারী এসব মুসলমান মুহাজিরদের ব্যাপারে আল কুরআনের নির্দেশের আলোকে সরকার ও জনগণ তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তদানুযায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকার মোহাম্মদপুরে তাদেরকে সরকারীভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া হয়।[২৯]

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলাম প্রচারের স্বার্থে আল্লাহর ইশারায় স্বীয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মদীনাবাসী তাঁর এ ত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সেখানকার ইয়াসরিব শহরকে মদীনাতুন্নবী নামে নামকরণ করে। প্রিয় নবী (সা.)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারকেই হিন্দুস্তানের বিহার থেকে নিগ্রহের শিকার হয়ে পাকিস্তানে আসা মুহাজিরদের পুনর্বাসন এলাকার নামকরণ করা হয় মোহাম্মদপুর। স্থান-নাম গবেষক আজিমুশশান হায়দার মোহাম্মদপুর নামকরণ প্রসংগে বলেন, "Name given to a vast colony developed initially for the rehabilitation of displaced persons from India. Ariving out of once desolate land mass, it is now very much a part of the city. Initiated and built up through the planning of Mr. G. A. Madani it is named after Prophet Mohammad (peace be on him.)"[৩০]

ভারতে দীর্ঘদিনব্যাপী মুসলিম শাসনের স্মৃতিকে জাগরূক রাখার জন্য এ মোহাম্মদপুর এলাকার বিভিন্ন রাস্তার নামকরণও করা হয় সেখানকার রাজা বাদশাহগণের নামে।

মোহাম্মদপুর এলাকাটি এখন রাজধানী শহর ঢাকার একটি বর্ধিষ্ণু এলাকা। এটি বর্তমানে একটি থানার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

৮. আহমদ নগর

পাইকপাড়া মৌজায় এক সময়ে রন্ডপাড়া[৩১] নামে পরিচিত এলাকাটিই পরবর্তীতে আহমদ নগর নামে নামকরণ হয়। এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী মো: ছালেম উদ্দিন মাদবর (জ. ১৯২১) ১৯৬৫ সন থেকে ইউ. পি. মেম্বর ও পরে কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ৬০ কাঠা জমির

www.pathagar.com

৪০ কাঠাই তিনি স্কুলের জন্য দান করে দেন। তাঁর দেওয়া জমিতে পাইকপাড়া প্রাইমারী স্কুল (১৯৫৮) ও তাঁর পিতার নামে বশিরউদ্দিন হাইস্কুল ও বশিরউদ্দিন মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ছালেম উদ্দিন সাহেবের নামে গড়ে ওঠে ছালেম উদ্দিন মার্কেট। ষাটের দশকে এখানকার সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন এই ছালেম উদ্দিন মাদবর, হাজী আকবর আলী (মরহুম) ও জোবেদ আলী। ১৯৬৭ সনে স্কুল স্থাপনকে কেন্দ্র করে এলাকায় গড়ে ওঠে একটি যুবক সমিতি। সমিতির সভাপতি ছিলেন আক্কাছ আলী মাষ্টার ও সেক্রেটারী মো: সিরাজুল ইসলাম। সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন ছালেম উদ্দিন মাদবরের ছেলে আনোয়ার হোসেন। সমিতি রণ্ডপাড়া নামটি পরিবর্তন করে এলাকার একটি নতুন নামকরণের উদ্যোগ নেয়। সদস্যগণ মোট ৯টি নাম বিবেচনার জন্য পেশ করে। যেগুলো হলো: পূবালী, সোনালী, আহমদপুর, ইসলামপুর, কাজলিগাঁ ইত্যাদি। এ সময় এলাকায় বসবাসকারী রায়ের বাজার হাই ইংলিশ স্কুলের হেড মৌলভী আবদুর রকিব (জ. ১৯০০), পাগলা হুজুর নামে পরিচিত, ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্য নাম আহমদ-এর সাথে নগর যোগ করে এলাকার নতুন নাম আহমদ নগর রাখার প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সকলে একবাক্যে তার প্রস্তাবে সাড়া দেয়। এভাবে সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৬৭ সাল থেকে এলাকার নাম রাখা হয় আহমদ নগর।[৩২] পরবর্তীতে এ নামটি পৌরসভার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও গেজেটভুক্ত হয়। বর্তমানে এটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ১২ নং ওয়ার্ডভুক্ত এলাকা।

৯. আল আমিন রোড

গ্রীন রোড থেকে পূর্বগামী আল-আমিন জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তাটি আল-আমিন রোড নামে পরিচিত। ধানমন্ডি এলাকার সি. এস-১৯২ দাগের প্রায় একশ বিঘা জায়গার মধ্য ভাগে রাস্তাটির অবস্থান। বর্তমানে এটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৫০নং ওয়ার্ডভুক্ত। ব্রিটিশ আমলে হিন্দু প্রধান এ অঞ্চলটি শায়েস্তা খানের বংশধরদের জমিদারীর আওতাধীন ছিল বলে জানা যায়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এখানকার হিন্দুদের অনেকে অহেতুক ভারতে পাড়ি জমানোর হিড়িকের সময় উঠতি মধ্যবিত্ত মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের কাছ থেকে জায়গা ক্রয় করে এ এলাকায় বসতি শুরু করে। এদের মধ্যে সরকারী চাকুরিজীবি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকজন ছিল বেশী। ১৯৬০ সালে তারাই নিজস্ব জমি দান করে এ রাস্তাটির পত্তন করে। তৎকালীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট আলী আমজাদ খান এ রাস্তা নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা রাখেন। এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ডা. নাসিরুদ্দিন আহমদ ও চেয়ারম্যান সাহেবের উদ্যোগে এলাকাবাসীর সহিত পরামর্শক্রমে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সততা ও বিশ্বস্ততার পরিচয়বাহী বাল্য নাম- 'আল-আমিন' নামেই রাস্তার নামকরণের সিদ্ধান্ত হয়। এলাকাবাসী এ নামের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এলাকায় শান্তি-শৃংঙ্খলা

www.pathagar.com

এবং সততা ও বিশ্বস্ততার পরিবেশ বাজায় রেখেই বসবাস করছে। রাস্তাটির শেষ মাথায় অবস্থিত মসজিদটিও আল আমিন মসজিদ নামে পরিচিত। এটি গত শতকের সত্তুর দশকে স্থাপিত।[৩৩]

১০. রসূলপুর (কামরাঙ্গীর চর)

"আসামনীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও,
রহিমুদ্দীর ছোট্ট বাড়ি রসূলপুরে যাও।
বাড়ী তো নয় পাখির বাসা– ভেন্না পাতার ছানি,
একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি।"

কবি জসীম উদ্‌দীনের এক পয়সার বাঁশী কাব্যগ্রন্থের জনপ্রিয় কবিতা 'আসমানী'তে রসূলপুর নামের উল্লেখ রয়েছে।[৩৪] এ রসূলপুর ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত। তবে আমরা সে রসূলপুরের কথা বলছি না, আমরা বলছি ঢাকার কামরাঙ্গীর চরের রসূলপুরের কথা। বাংলাদেশের স্থান-নামের ইতিহাসে সারা দেশে রসূলপুর নামে বহু নাম রয়েছে। ঢাকার কামরাঙ্গীর চর থানার ২নং ওয়ার্ডেও রয়েছে রসূলপুর নামে একটি এলাকা। মোগল আমলে 'বাগে চাঁদ খান' নামে পরিচিত বিশাল এলাকাটিই একসময় কামরাঙ্গীর চর নামে পরিবর্তিত হয়। সে কামরাঙ্গীর চরের এ এলাকা বাংলাদেশ আমলে নামকরণ হয় রসূলপুর নামে। এ এলাকায় বসবাসকারী বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব এম. রহমত আলী (এম. আর. ট্যানারীর মালিক) নানা সমাজকল্যাণমূলক কাজে জড়িত। তিনি এলাকায় একটি জামে মসজিদ স্থাপনের মূল উদ্যোক্তা। ১৯৭৭ সালের দিকে তিনি স্থানীয় গন্যমান্য লোকদের সাথে পরামর্শ করে এলাকার একটি নতুন নামকরণের সিদ্ধান্ত নেন। সেই মোতাবেক মানবতার মুক্তিদূত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতির স্মরণে এলাকার নতুন নামকরণ করেন রসূলপুর। অল্পদিনের মধ্যেই নামটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও পরিচিতি অর্জন করে।[৩৫]

১১. রসূলপুর (দনিয়া)

যাত্রাবাড়ী থেকে দক্ষিণগামী ঢাকা নারায়নগঞ্জ রোডের পূর্বমূখী রাস্তা দনিয়া রোডে দনিয়া বাজারের বিপরীত দিকে একটি এলাকা মহানবী (সা.)-এর নামে নামকরণ করা হয়েছে রসূলপুর।[৩৬] ঢাকা শহরে রসূলপুর নামে আরেকটি স্থান-নাম রয়েছে কামরাঙ্গীরচরে।

১২. মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি

ঢাকা শহরে হাউজিং সোসাইটি ব্যবসা ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে মূলত বাংলাদেশ আমলে। ১৯৪৭ সালে ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর ঢাকা হয় পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী। ফলে নতুন করে ঢাকা প্রাণ ফিরে পায় এবং ব্যাপকহারে জনসমাগমের ফলে নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠতে শুরু করে।

www.pathagar.com

ঢাকার ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য তখন সরকারীভাবে উত্তরা, বনানী, শ্যামলী, পল্লবী ইত্যাদি স্যাটেলাইট টাউন স্থাপন করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকা হয় একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাজধানী। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর দেশে অরাজকতা, বিশৃংঙ্খলা, লুটপাট, রাহাজানি ইত্যাদি ব্যাপকহারে বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষের কারণে শহরে লোক সমাগম বেড়ে বহু নতুন বস্তির সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসার প্রেক্ষিতে সরকারী ও বেসরকারী নানা সংস্থা হাউজিং এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসা শুরু করে। মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি ব্যবসার পাশাপাশি প্রকল্পগুলোর নামকরণে ইসলামী ঐতিহ্য রক্ষারও তাগিদ অনুভব করে। বর্তমানে ঢাকার ৪৬নং ওয়ার্ডের মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি একটি এলাকার স্থান-নামে অভিষিক্ত।

প্রসঙ্গত বিনয়ের সাথে একটি কথা বলে রাখি যে, স্থান-নাম গবেষণা আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ না করায় আলোচনার কৌশল এবং কাঠামোগত বা পদ্ধতিগত কোন অসম্পূর্ণতা থাকতেই পারে। সকল বোদ্ধা পাঠক, লেখক, গবেষক, অনুসন্ধিৎসুগণের সমক্ষে নিবেদন থাকবে, যেন আলোচ্য বিষয়গুলোর ব্যাপারে কোন পরামর্শ থাকলে তা অকপটে পেশ করেন। এ ধরনের পরামর্শ বা আলোচনাকে আমরা বরাবরই স্বাগত জানাই। সূচীবদ্ধ স্থান-নামগুলোর যেগুলোর উৎপত্তির ইতিহাস পেশ করা হয়েছে সেগুলোসহ অন্য যে সব স্থান-নামের সূচিকরণ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও তথ্য সরবরাহ করলে পরবর্তীতে অবশ্যই রেফারেন্স অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তথ্য দাতার তথ্য-ঋণ স্বীকার করা হবে।

তথ্যসূত্র:

১. সৈয়দ গোলাম হুসায়ন খান তাবতাবায়ী, সিয়ারে মুতাখ্‌খিরীন, অনুবাদ: ড. এম. আবদুল কাদের, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৭৮, পৃ. ৩২২ ও ৩৫২।

২. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, হজ্জের ইতিহাস: ঐতিহ্য ও করণীয়, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০১।

৩. ফিরোজ আহমদ চৌধুরী, কা'বা শরীফের ইতিহাস, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৮৭, পৃ. ৬৭-৬৮।

৪. মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, চান্দ্রমাসের ইতিকথা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৮ পৃ. ৪৭।

৫. A Short History of the Saracens by Ameer Ali, (1st Edition 1889) 13th Edition, London Macmillan & Co. Ltd. New York St Martin's Press, 1961, p. 10-11.

৬. ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন্ নববী, রিয়াদুস সালেহীন, প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সপ্তম প্রকাশ-১৯৯৬, পৃ. ৯।

www.pathagar.com

৭. F. B. Bradley Burt, Romance of an Eastern Capital (1906) অনুবাদ: প্রাচ্যের রহস্য নগরী, রহীম উদ্দীন সিদ্দিকী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৭, পৃ. ৭৪।

৮. সৈয়দ মূর্তাজা আলী, বাংলাদেশের স্থানীয় নামের ইতিহাস, প্রকাশক: ম্যাগনাম ওপাস, ২০০১ পৃ. ১১-১২।

৯. মীর্জা নাথান, বাহারিস্থান-ই-গায়বী, ১ম খন্ড, অনুবাদ: খালেকদাদ চৌধুরী, প্রকাশক বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৮ পৃ. ১৯২, ২৮৭।

১০. F. B.Bradley Burt, Romance of an Eastern Capital, (1906), অনুবাদ: রহীম উদ্দীন সিদ্দিকী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৭ পৃ. ২৪৭।

১১. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারিখে ঢাকা, অনুবাদ: ডক্টর আ. ম. ম. শরফুদ্দীন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫, পৃ. ১৫, ২০, ২১৮-২২১।

১২. A.B.M. Hossain, Editor, Sonargaon-Panam, Asiatic Society of Bangladesh, 1997, P.95.

১৩. রশীদ উদ্দিন আহমদ, কদম রছুলের ইতিহাস, প্রকাশনায়: কদম রছুল মোতওয়াল্লী কমিটি, ১৯৮৮, পৃ. ১০-১৩।

১৪. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, নিবন্ধ-শহর ঢাকার অনেক ঐতিহাসিক স্থাপত্যের রূপকার বঙ্গবীর দেওয়ান মনোয়ার খান, সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ঈদুল ফিতর সংখ্যা, ২০০০ পৃ. ২৪৯-২৫২।

১৫. জেমস টেলর, টপোগ্রাফি অব ঢাকা (১৮৩৯) অনুবাদ: কোম্পানী আমলে ঢাকা, অনুবাদক, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮ পৃ. ৬২।

১৬. যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ (১৩১৯) দ্বিতীয় সংস্করণ-১৪০৬, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা-৭০০ ০০৯ পৃ. ২৪৩।

১৭. Azimusshan Haider, A City and its Civic Body, 1966, P. 7.

১৮. Azimusshan Haider, Dacca: History and Romance in Place Names 1967. P. 34.

১৯. Azimusshan Haider, Dacca: History and Romance in Place Names, 1967, P. 48.

২০. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, আমাদের সাংবাদিকতার ঐতিহ্য, দৈনিক সংগ্রাম, বর্ষপুর্তি সংখ্যা, ৬ মার্চ ২০০০।

২১. Syed Muhammad Taifoor, Glimpses of old Dhaka (1952) revised and Enlarged Second Edition (Bangladesh), published by Lulu Bilquis Banu, Leila Arjumund Banu, Malka Parveen Banu of 9, Eskaton garden, Dhaka, P. 46-47.

২২. Dr. Sirajul Islam, The permanent settlement in Bengal, A study of its operation 1790-1829, Bangla Academy, Dacca, 1979, P.258.

২৩. রশীদ উদ্দিন আহমদ, কদম রছুলের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

www.pathagar.com

২৪. A. B. M. Hussain, Editor, Sonargaon-Panam, Asiatic Society of Bangladesh, 1997 P.95, 164.

২৫. নাজির হোসেন, কিংবদন্তির ঢাকা, প্রকাশক: খ্রিস্টার কো অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লি. তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ৩৭৪।

২৬. Dr. Syed Mahmudul Hasan, Dacca : The City of Mosques, Islamic Foundation Bangladesh, 1981, P. 83.

২৭. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সংকলিত কোরআন সূত্র (পবিত্র কোরআনের বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনমুদ্রণ-১৯৯৪, পৃ. ৭৮৬ [দ্র. অবশ্য বইটিতে সূরার নাম সূরা আনআম' লেখা রয়েছে যা ভুল। সত্যিকার অর্থে হবে সূরা আনফাল-লেখক]

২৮. [পবিত্র কোরআনুল করীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর, মূল: তফসীর মারেফুল ক্বোরআন, হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.), অনুবাদ ও সম্পাদনা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, খাদেমুল হারামাইন, বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি., পৃ. ২২৫।

২৯. নাজির হোসেন, কিংবদন্তীর ঢাকা, প্রকাশক আজাদ মুসলিম ক্লাব, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮১, পৃ. ৬৬

৩০. Azimusshan Haider, Dacca : History and Romance in Place Names, 1967, P. 53.

৩১. ১১/১১/১৯৫৭ ইং জেলা ঢাকা সদর জয়েন্ট সাব রেজি: অফিসে সম্পাদিত ৮৮৫৪ নং দলিলেও শ্রী বীরেন্দ্রভূষণ রণ্ড সরকার পিতা মৃত দেবেন্দ্রচন্দ্র রণ্ড সরকার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। রণ্ডদের দলিলে এলাকাটি পাইক পাড়া নামে উল্লেখ আছে।

৩২. জনাব মো: ছালেম উদ্দিন মাদবর (জ. ১৯২১), পিতা– বশির উদ্দিন মাদবর, জনাব মো: শামছুল আলম (জ. ১৯৪৯), পিতা– মরহুম আকরাম আলী, মো: সিরাজুল ইসলাম (জ. ১৯৪৮) পিতা মৃত মো: জোবেদ আলী, তফাজুল হোসেন (৭৫), পিতা– মো: ইদরিছ ঢালী (এলাকার নামকরণের মিটিং-এর নোটিশকারী) সর্ব সাং আহমদ নগর-এর সাথে ১৪/১১/২০০১ তারিখে লেখকের সাক্ষাৎকার।

৩৩. খোদাদাদ আহমদ (চেয়ারম্যান, হলি ড্রাগস ল্যাবরেটরী), ৩৭ আল আমীন রোড, কাঠাল বাগান, ঢাকা-এর সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার।

৩৪. জসীম উদ্‌দীন, সুচয়নী, প্রকাশক: আমিন আনোয়ার, ১০ কবি জসীম উদ্‌দীন রোড, ঢাকা, ষষ্ঠ প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ২২৩।

৩৫. জনাব কামরুল ইসলাম হুমায়ুন, পিতা- মৃত মৌলভী আবুল হাশেম, পশ্চিম রসূলপুর, ডাকঘর– আশরাফাবাদ, থানা-কামরাঙ্গীর চর, জেলা- ঢাকা-এর সাথে ২৫/০৯/২০০২ তারিখে লেখকের সাক্ষাৎকার।

৩৬. Dhaka City Guide map, published by Graphosman, 3/3-C, Purana Paltan, Dhaka.

www.pathagar.com

সীরাত চর্চায় ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

নাসির হেলাল

বাংলাদেশের সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র একটি পরিচিত নাম। ১৯৮৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাহিত্য সভা, আলোচনা সভা, সেমিনার, নাটক, আবৃত্তি, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাসহ জাতীয় দিবসসমূহও নিয়মিত পালন করে আসছে। এ ছাড়া কেন্দ্র প্রতি বছর বিশেষভাবে সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন করে থাকে। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল হামদ, নাত, কবিতা আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা।

১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষে কেরাত, ইসলামী গান, আবৃত্তি, প্রবন্ধ রচনা ও স্বরচিত কবিতা এই পাঁচটি বিষয়ে ক, খ, গ ও ঘ বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রবন্ধ রচনার বিষয় ছিল 'আমার প্রিয় নবী', 'বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা.)' এবং 'সমস্যা সংকুল বিশ্ব ও মাহনবী (সা.)'।

১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ২ দিনব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করে। প্রথম দিন ছিল ১২ আগস্ট ৪৪৭, গ্রীণওয়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উন্মুক্ত ক্বেরাত ও না'তে রাসূল (সা.) প্রতিযোগিতা এবং দ্বিতীয় দিন ১৩ আগস্ট আল ফালাহ মিলনায়তনে নিবেদিত কবিতা পাঠ, আলোচনা সভা, পুরষ্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ বছর কেন্দ্র থেকে কবি আসাদ বিন হাফিজের সম্পাদনায় 'সাহিত্য সংস্কৃতি' নামে একটি সমৃদ্ধ বিশ্বনবী (সা.) সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ সংকলনে ১৮ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, ৫টি গল্প ও ৩২ টি উত্তীর্ণ কবিতা প্রকাশিত হয়। রাসূল (সা.)-এর জীবনের সত্য ঘটনার আলোকে রচিত ৫টি গল্প বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোন সীরাত সংকলনে এই প্রথম।

www.pathagar.com

সংকলনটির সূচীক্রম নিম্নরূপঃ

প্রবন্ধ: মর্যাদা ও গৌরবের উৎস মহানবী / আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মানবাধিকার / ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সংস্কারক মহানবী (সা.) / কাজী দীন মুহাম্মদ, বনি কোরায়শ: বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি / সৈয়দ আলী আহসান, গদ্যে রসূল (সা.) চরিত / আবদুল মান্নান সৈয়দ, হযরত নবী করীম (সা.) প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনের শরীয়ত সম্মত শাস্তি / মুহিউদ্দীন খান, আধ্যাত্মিক সাধনায় সংগীত / মোবারক হোসেন খান, ইসলামের গতিশীলতা ও ইত্তেহাদ / জুলফিকার আহমদ কিসমতী, হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিশ্ব শান্তি / জুবাইদা গুলশান আরা, আমাদের আদর্শ হযরত মুহম্মদ (সা.) / নয়ন রহমান, মহানবীর সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা / মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, বদরের যুদ্ধ: হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কতিপয় জীবন্ত মুজিযা / আ. ন. ম. আবদুশ শাকুর, পৃথিবী দেখেছে বহুমুখী বিচিত্র এক জীবন / খন্দকার আবদুল মোমেন, ইসলাম: তত্ত্বে ও প্রয়োগে আজকের প্রেক্ষাপটে / মুহাম্মদ আবদুল হান্নান, ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি: উৎস ও প্রকাশ / মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, সিলেটী নাগরী সাহিত্য: প্রসঙ্গ সীরাতুন্নবী (সা.) / মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, রাসূল (সা.)-এর সাহিত্য প্রীতি / বদরুল ইসলাম মুনীর ও শিশু-কিশোরদের প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদ (সা.)/ আরিফুল ইসলাম সোহেল।

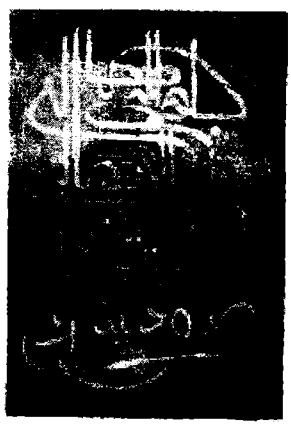

কবিতা: আপনি যেদিন এলেন পৃথিবীতে / ফজল শাহাবুদ্দীন, হে প্রিয় রাসূল আমার / জাহানারা আরজু, মদিনাতুন্নবী (সা.) / আফজাল চৌধুরী, জ্যোৎস্নার দরুদ পাঠে / আসাদ চৌধুরী, হে বিদ্যুৎকণা / মুহম্মদ নূরুল হুদা, আলোর রাসূলের কদম মুবারকে / আবদুল মুকীত চৌধুরী, রাহমাতুল্লিল আলামীন / রূহুল আমীন খান, প্রশান্তির ছায়া / মসউদ-উশ-শহীদ, নির্মম পুরুষ/হামিদুল ইসলাম, সেরা মানুষের জীবনে / মতিউর রহমান মল্লিক, অমিয়তম / আবদুল হাই শিকদার।

আরো কবিতা লিখেছেন: না'তে রসূল / ইসমাঈল হোসেন দিনাজী, অপূর্ব ক্ষমা / মোহাম্মদ সাদাত হোসাইন, শাদা পাগড়ির শিষ / মোশাররফ হোসেন খান, আশেকে ইলাহী তিনি / আসাদ বিন হাফিজ, রাত্রি হবে শেষ / আহমদ আখতার, নাত / কাজী আবদুল হালিম, অচ্ছুত দিগাঞ্চলে লোকাতীত / মহসিন হোসাইন, যদি পাই

www.pathagar.com

নূরানী হাওয়া / সুজাউদ্দীন কায়সার, সুঘ্রাণের ঘ্রাণ / গোলাম মোহাম্মদ, খোদার রহম / গাজী এনামুল হক, অনুকৃত / নাসির হেলাল, হায় কৃষ্ণ ঘৃণার পাথর / সায়ীদ আবুবকর, প্রশ্ন / ফাহিম ফিরোজ, দোলা / তারিক মনোয়ার, না'ত / আমিন ইবনে করিম, মুক্তির চাঁদ / ওমর বিশ্বাস, কোন আলোকে / এম. সোহরাব আসাদ, না'ত / আবু তাহের বেলাল, প্রিয় লোক / মানসুর মুজাম্মিল, রাসূল (সা.) স্মরণে / আর. কে. সাব্বীর আহমদ ও হে রসূল (সা.) / ফজলুল হক তুহিন।

গল্প: নাশুকীর দরবার / মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, যে প্রেম করেনি কেউ / হাসান আলীম, ভিন্ন এক ভালবাসা / সোলায়মান আহসান, অবাক সেনাপতি / কায়েস মাহমুদ এবং পাহাড় ভেঙ্গে গেল / সাবিন মল্লিক।

১৯৯৭ সালে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে কেন্দ্র জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আয়োজন করে। এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের তৎকালীন বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আবদুল কাদের মোল্লা, এরশাদ মজুমদার, ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, ড: হাসানুজ্জামান, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও কবি মতিউর রহমান মল্লিক। কবিতা পাঠের আসরে সভাপতিত্ব করেন বর্তমান বাংলা সাহিত্যের নন্দিত কবি আল মাহমুদ।

১৯৯৮ সালে কেন্দ্র সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচী হাতে নেয়। এর মধ্যে ছিল সপ্তাহব্যাপী ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, প্রদর্শনীটি ২৬ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত জাতীয় জাদুঘরের লবীতে অনুষ্ঠিত হয়। ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)। প্রদর্শনীতে অংশ নেন শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী, আবু তাহের, সাইফুল ইসলাম, ইব্রাহীম মন্ডল এবং আরিফুর রহমান। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে এটিই প্রথম ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী।

এ ছাড়া আলোচনা সভা, প্রকাশনা উৎসব, কবিতা পাঠের আসর, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও ভিডিও প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কবি গোলাম মোহাম্মদ (বর্তমানে মরহুম, মৃ. ২২ আগস্ট, ২০০২) এর সম্পাদনায় 'সীরাতুন্নবী (সা.) ৯৮ স্মারক' প্রকাশিত হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ স্মারকে কবি গোলাম মোহাম্মদ যে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন তার মূল অংশটুকু উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন :

www.pathagar.com

'আলিফ হে মীম দাল এই চার অক্ষরে যে নাম।

সে নামই তো আসমানী তারিফের পবিত্র কালাম।

সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, শ্রেষ্ঠতম নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাতিল চিন্তা, মত ও পথের বিরুদ্ধে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, বিজয় এবং প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর আগমন। তিনি বিশ্বের রহমত স্বরূপ রাহমাতুল্লিল আলামীন। কী অন্ধকার ছিল আমাদের এই পৃথিবীতে। পাশবিক মানুষের কদর্য আচরণ, হিংসা-বিদ্বেষ-ঘৃণার কর্দম দু:সহ ও কলঙ্কিত-শংকিত করেছিল সুস্থতাকে।

পাপের অন্ধকারে পথ পাচ্ছিল না বোধের সৌকর্য। তখনি তিনি এলেন বরকতের পরশ নিয়ে। আজো সেই শুদ্ধতার শতধারা সিক্ত করছে রিক্ত-নি:স্ব মানবতাকে। সেই আতরের সুঘ্রাণ আজো বিশ্ব মানবের চেতনায় দীপ্তি ছড়ায়। তার ধ্বনি আমাদের শ্রবণকে আন্দোলিত করে রবিউল আউয়াল মাস এলেই। আমরা সেই পরম পুরুষের কাজ, নির্দেশ পছন্দের স্মরণেই আমাদের যাবতীয় লিপ্ততাকে সংযুক্ত করতে চাই। তিনি শ্রেষ্ঠতম ভালবাসা– তাঁর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে মানবতার মুক্তি ইহ ও পরকালীন সফলতা।

গূঢ়ার্থ অন্বেষণের কৌতুহল মানুষের চিরকালের। অতি প্রাচীনকাল থেকেই তাই সৃষ্টিশীলতা, সৌন্দর্য ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রশংসা পেয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। ইসলামের শাশ্বত জীবন চেতনার মধ্যেও রয়েছে এর উৎসাহ ও বিস্ময়কর প্রেরণা। চারুবাক ও প্রকাশের কুশলতা অভিনন্দিত এখানে। পবিত্র কুরআনের বাণীভঙ্গি, ভাষা ও প্রকাশের মধ্যে যেমন আশ্চর্য সম্মোহন রয়েছে; তেমনি মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীগণ, সঙ্গী-সাথীদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় কবিতার প্রতি গভীর আগ্রহ বা কাব্যকৃতি। যেহেতু ইসলাম পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা; সেহেতু আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার যাবতীয় ক্ষেত্রেই রয়েছে তার স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও মনের মুগ্ধকর অবস্থান।

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র সুশীল সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘ বছর যাবত। রবিউল আউয়াল উপলক্ষে মাসব্যাপী নানাবিধ

www.pathagar.com

কর্মসূচীর পাশাপশি সংকলন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। আমরা আমাদের গভীর ভালবাসা নিয়ে এই ক্ষুদ্র আয়োজনকে রাসূলের (সা.) শানে তুলে ধরছি। রাসূল (সা.)-এর কাব্যদর্শন, তাঁকে নিবেদিত সাহাবায়ে কেরামের কবিতা, সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমানের একগুচ্ছ তারুণ্যদীপ্ত কাব্যকুসুম ও আলোকোজ্জল গল্প তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। রাসূল (সা.)-এর কবি হাসসান বিন সাবিত তাঁর কবিতায় বলেছেন– 'নবীর ছোঁয়াচ পেয়ে এ কবিতা অমরত্ব পাবে'। আমরাও মনে করি আমাদের আয়োজন ক্ষুদ্র হলেও সেই বরকতময় নামের আতর তাকে মহিমান্বিত করবে।'

উদ্ধৃত সম্পাদকীয় থেকে মরহুম কবি গোলাম মোহাম্মদ সম্বন্ধে আমাদের নিকট অন্তত চারটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে; (১) ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, বিজয় এবং প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ; (২) রাসূল (সা.)-এর প্রতি নি:সঙ্কোচ আনুগত্য; (৩) ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র বা সাংগঠনিক কাজের ব্যাপারে অকুণ্ঠচিত্ত এবং (৪) গদ্য লেখাতেও তিনি দক্ষ ছিলেন।

মাত্র ৪ ফর্মার এ ক্ষুদ্র সংকলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু বলা যায়। এতে আছে:

কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস, সাহাবীদের (রা.) কবিতা। এতে আছে: আশ্বাস / হযরত আবু বকর (রা.), সত্য নবী / হযরত ওমর ফারুক (রা.), পদপ্রদর্শক / হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রা.), এই তরবারি / হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.), আলোক বর্তিকা / হযরত হামজা (রা.), না'ত / হযরত ফাতেমাতুয যোহরা (রা.), হিদায়াতের আলো / হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.), তোমার তারিফ / হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.), আল্লাহর নূর / হযরত কা'ব বিন যুহাইর (রা.)।

এরপর নিবেদিত কবিতায় আছে: ফাতেহা-ই দোয়াজ্‌দহম (আবির্ভাবের অংশ বিশেষ) / কাজী নরজরুল ইসলাম, সিরাজাম মুনীরা (সা.) (অংশ বিশেষ) / ফররুখ আহমদ, আহমদ / আবদুস সাত্তার, হযরত মোহাম্মদ / আল মাহমুদ, আর এক সূর্যের গান / মতিউর রহমান মল্লিক, পূর্ণতার আলো / ইসমাঈল হোসেন দিনাজী, তোমার আবির্ভাব / হাসান আলীম, তোমার কথাই মনে পড়ে / সোলায়মান আহসান, প্রেমের নায়ক / আসাদ বিন হাফিজ, নাতিয়া / মোশাররফ হোসেন খান, তোমার পথে চলতে গেলেই / নাসির হেলাল, চোখে আমার ঐ মদীনা / আবুল হোসাইন মাহমুদ, ভালবাসার ভ্রূণটি / মুর্শিদ-উল-আলম, শব্দহীন হাতছানি / নিজাম সিদ্দিকী, হেরার গুহায় / ওমর বিশ্বাস, মহা বিস্ময় / মৃধা আলাউদ্দিন, পেলব বৃষ্টিতে / নাঈম মাহমুদ, মাহবুব / খালিদ সাইফুল্লাহ, শুধু

www.pathagar.com

আপনাকে ভুলে থেকে / নোমান মুশাররফ, শুদ্ধতম মানুষের দীপ্তি / কাজী আবদুর রহীম ও এক্সরে / আহসানুল ইসলাম বাবুল।

এরপর সূচিক্রমে রয়েছে লুৎফর রহমান ফারুকী অনূদিত ডক্টর মুহাম্মদ ইকবালের 'বিশ্বনবীর (সা.) কাব্য সমালোচনা' শীর্ষক একটি বিশেষ প্রবন্ধ। আর প্রবন্ধের তালিকায় আছে: ইসলামের দৃষ্টিতে কবি ও কবিতা– মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ ও বদলে নাও জীবনের ক্লেদ– শাহীন হাসনাত-এর দুটি চমৎকার প্রবন্ধ।

রফিক মুহাম্মদের লেখা 'সত্য তুমি সুন্দর' শিরোনামের সীরাত কেন্দ্রিক একটি গল্প এ সংকলনের বিশেষত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।

সর্বশেষে রয়েছে শরীফ বায়জীদ মাহমুদের গ্রন্থিত ও নির্দেশিত বিশেষ আলেখ্যানুষ্ঠান। কলেবরে ছোট হলেও সীরাত স্মারকের ইতিহাসে এ স্মারকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি।

১৯৯৯ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচী হাতে নেয়। যার মধ্যে ছিল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নিবেদিত কবিতা পাঠ, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণী সভা।

জাতীয় জাদুঘরের লবীতে ১৮ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে ছিল ২৪ টি জলরঙে আঁকা ও ২৮ টি তেলরঙে আঁকা মোট ৫২ টি দৃষ্টি নন্দন ক্যালিগ্রাফি। এর মধ্যে আবার ১৬ টি ছিল নিসর্গ চিত্র।

প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক দর্শক প্রদর্শনী পরিদর্শন ও উপভোগ করেন। এ উপলক্ষে প্রদর্শিত ৫২ টি ক্যালিগ্রাফির ছবি সম্বলিত একটি সুভ্যনির প্রকাশ করা হয়।

২০০০ সালেও কেন্দ্র সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষে মাসব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সেমিনার, আলোচনা সভা, কবিতা পাঠের আসর, ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে মাসটি উদযাপন করে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এ বছরের বিশেষত্ব ছিল ঢাকা মহানগরীকে ৪ টি অঞ্চলে বিভক্ত করে অঞ্চল ভিত্তিক প্রতিযোগিতা এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা। এরপর অঞ্চলভিত্তিক বিজয়ীদের নিয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান।

২০ জুলাই তারিখ সকাল ১০ টায় জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী চিত্রকলা ও ক্যালিগ্রাফীর ওপর জাতীয় সেমিনার। চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী সবিহ-উল-আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে

www.pathagar.com

প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পকলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক ড: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর শাহাবুদ্দীন দারাঈ। আলোচনা করেন শিল্পী আবদুস সাত্তার, ড: নাজমা খান মজলিস, নাট্যকার আরিফুল হক, শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল ও কবি গোলাম মোহাম্মদ (মৃ. ২২ জুলাই,২০০২)।

২০ জুন থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী জাতীয় জাদুঘরের লবীতে ক্যালিগ্রাফী প্রদর্শনীয় আয়োজন করা হয়। এতে ৬ জন প্রখ্যাত শিল্পীর শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। এরা হলেন: শিল্পী অধ্যাপক ড. আবদুস'সাত্তার, শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী আমিরুল হক ও শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ। এবারের প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন বরেণ্য শিল্প সমালোচক ড: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম।

জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে কবি আফজাল চৌধুরীর সভাপতিত্বে কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি আল মাহমুদ। কবিতা পাঠের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন কবি গোলাম মোহাম্মদ (মরহুম)। সারাদেশ থেকে আগত শতাধিক কবি রাসূল (সা.) কে নিবেদন করে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

সীরাতুন্নবী (সা.) ২০০০ উপলক্ষে কবি আসাদ বিন হাফিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য সংস্কৃতি' সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা ২০০০' শিরোনামের ২০০ পৃষ্ঠার একটি মূল্যবান সংকলন। সংকলনের সম্পাদনা পরিষদে আছেন আসাদ বিন হাফিজ, শরীফ আবদুল গোফরান, হাসান আলীম, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, নাসির হেলাল, গোলাম মোহাম্মদ, জাকির আবু জাফর, রফিক মোহাম্মদ ও কামরুল ইসলাম হুমায়ুন। যাতে ১৪ টি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ, ১ টি গল্প, ৩৭ টি কবিতা, কেন্দ্রের বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যবহুল রিপোর্ট সন্নিবেশিত হয়।

www.pathagar.com

প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ: নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সমাজ বিপ্লব / আব্বাস আলী খান, নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) / হাফেজা আসমা খাতুন, ইসলামী দাওয়াতের তামুদ্দুনিক কর্মসূচী / আবূ ফয়সল, পোস্ট মডার্নিজম: মহানবীর (সা.) আদর্শ প্রেক্ষিত সাহিত্য-সংস্কৃতি / মুহাম্মদ আবদুল হান্নান, হাদীসের আলোকে কবি ও কবিতা / মতিউর রহমান মল্লিক, ইসলামী সংস্কৃতির কালজয়ী ভূমিকা / মুহাম্মদ নূরুল হুদা, রাসূল (সা.) প্রেমে গোমরাহীতা ও আমাদের কর্তব্য / মো: আবদুর রহীম খান, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিশু প্রীতি / শরীফ আবদুল গোফরান, রবিউল আউয়াল এলে তোমারই গান গাই / শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, বিশ্বব্যাপী নারী মুক্তি / কাজী তাবাসসুম, ক্যালিগ্রাফি: ইসলামী শিল্পকলার গোড়ার কথা / ইব্রাহীম মন্ডল, রাসূলের দাওয়াত ও আজকের সমাজ / মো: এনামুল করীম, সীরাত চর্চায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনা মাধ্যম / নাসির হেলাল।

এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ছিল কবি হাসান আলীমের সীরাত কেন্দ্রিক গল্প 'ও সুগন্ধি কুসুম ও শীতলতা'।

কবিতাক্রম হল: নতুন দুনিয়া / আফজাল চৌধুরী, স্রষ্টার ও সৃষ্টির ভাষা / আল মুজাহিদী, বিশ্বাস / ফজল এ-খোদা, আনন্দ অশ্রুনীরে / সৈয়দ শামসুল হুদা, বাস্তবতা ও জিজ্ঞাসা / আবদুল মুকীত চৌধুরী, সালাম মুহাম্মদ (সা.) / জাহাঙ্গীর হাবীবুল্লাহ, চাই পবিত্র আশীষ / মসউদ-উশ-শহীদ, অন্তহীন উচ্ছ্বাসে ফোটে অনন্ত কল্যাণ / সুজাউদ্দিন কায়সার, আশ্চর্য দ্যোতনায় সম্মুখে / মহসিন হোসাইন, আমার রাসূল (সা.) / মুস্তাফা মাসুদ, শাফায়াত চাই / শেখ তোফাজ্জল হোসেন, আকুতি / সোলায়মান আহসান, মুহাম্মদ (সা.) / মোশাররফ হোসেন খান, মহানবীর স্তুতি / ফারুক নওয়াজ, সবুজের স্পর্শ / ইসমাঈল হোসেন দিনাজী, অন্তত প্রকাশ / খালেক বিন জয়েনউদ্দীন, আলোর ফুল / দেলওয়ার বিন রশিদ, পড়া হলো তারপর / গোলাম মোহাম্মদ, ফল্গুধারার মত / আহমদ আখতার, নেতা তিনিই সেরা / আসলাম সানী, আলোকের প্রত্যাশায় / মহিউদ্দিন আকবর, মিথ্যার পাশে দাঁড়ানো মানুষ / রহীম শাহ, তিনি এলেন, সাক্ষ্য দিলেন / রেজা রহমান, অস্ত্রহীন রবি / শাহাবুদ্দিন আহমদ, অনুসারী আমি / বেগম শামসুয জাহান নূর, বন্দীর কান্না / খান মুহাম্মদ শিহাব, আমার প্রিয় নবী (সা.) / সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারামিঞা, সমর্পিত শব্দরাজি / আবুল হোসাইন মাহমুদ, নাত / জাকির আবু জাফর, তোমার মহিমা / নিজাম সিদ্দিকী, রঙিন হলে সেই আলোতে / রফিক মুহাম্মদ, তুমি নাই তবু তুমি / ওমর বিশ্বাস, প্রার্থনার ব্যাস বাক্য / মৃধা আলাউদ্দনি, তোমার উপমা / আলমগীর হুসাইন, মহা সুন্দর সেই ফুল / জহীর

www.pathagar.com

হায়দার, বালির বুকে সবুজ / সিরাজ মুহাম্মদ ও রাসূল নামে / অঞ্জন শরীক।
সংকলনটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল এবং অঙ্গসজ্জা করেছেন কবি গোলাম মোহাম্মদ। সংকলনটি হাতে নিলেই কবি গোলাম মোহাম্মদের সযত্ন ছোঁয়া অনুভব করা যাবে।

২০০১ সালেও সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র মাসব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করে। এর মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতা, ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ক্যালিগ্রাফির ওপর জাতীয় সেমিনার, ১০ দিনব্যাপী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, কবিতা পাঠের আসর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক মঞ্চায়ন।

জাতীয় যাদুঘরের আর্ট গ্যালারীতে ২ জুন থেকে ১২ জুন ২০০১ পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী ১০ জন শিল্পীর দৃষ্টিনন্দন ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন: শিল্পী আবদুস সাত্তার, সাইফুল ইসলাম, ইব্রাহীম মন্ডল, আমিরুল হক, লে. কর্ণেল (অব) রুহুল ইসলাম, মাহবুব মুর্শিদ, শহিদুল্লাহ এফ বারী, মোহাম্মদ মোনাওয়ার হোসাইন, মুহাম্মদ আবদুর রহীম ও মোবাশ্বির মজুমদার। এ প্রদর্শনীতে বিচিত্র মুখী ৭৬ টি শিল্প কর্ম প্রদর্শিত হয়।

প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে জাদুঘরের শিশু মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্পী সবিহ উল আলম।

এবারে আরো সুসজ্জিত আরো সমৃদ্ধ লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা ২০০১' শিরোনামের স্মারকটি। আসাদ বিন হাফিজ সম্পাদিত ৩২২ পৃষ্ঠার এ বিশালাকার স্মারকটির কভার ডিজাইন করেন কবি গোলাম মোহাম্মদ। স্মারক সম্পাদনা পরিষদে আছেন আসাদ বিন হাফিজ, নাসির হেলাল, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, হাসান আলীম, গোলাম মোহাম্মদ, শরীফ আবদুল গোফরান, জাকির আবু জাফর, রফিক মোহাম্মদ ও কামরুল ইসলাম হুমায়ুন।

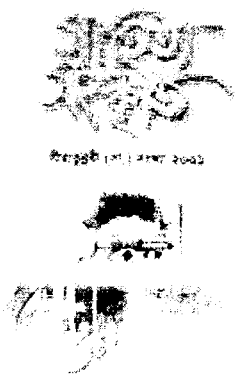

এ স্মারকের সূচীক্রমের প্রথমেই আছে- আসাদ বিন হাফিজ অনূদিত সাহাবী কবি হাস্‌সান বিন সাবিতের (রা) দীর্ঘ কবিতা। এরপর কবি তালিম হোসেনের দু'টি অপ্রকাশিত হামদ ও নাত। প্রবন্ধের

www.pathagar.com

তালিকায় আছে ১৫ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, এরপর ২ টি গল্প, ১ টি ভ্রমণ কাহিনী, ৪৫ টি কবিতা ও কেন্দ্রের ৩ টি প্রতিবেদন। কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ সম্পাদিত এ দৃষ্টিনন্দন ও তথ্যবহুল সীরাত সংখ্যাটির কভার ডিজাইন করেছেন মরহুম কবি গোলাম মোহাম্মদ। জুন ২০০১-এর প্রকাশিত সংখ্যাটি যে সব প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে: মহানবীর (সা.) ন্যায়-নীতি ও মানবতাবোধ / সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যে রাসূল জীবনী / শাহাবুদ্দীন আহ্মদ, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিনির্মাণে মহানবীর আদর্শের ঐতিহাসিক পর্যালোচনার একটি প্রস্তাবনা / মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মহানবীর আদর্শের দর্পণে দারিদ্র বিমোচন / জুলফিকার আহমদ কিসমতী, সীরাত: বিশ্লেষণ মূলক আলোকপাত / ড: আবদুল ওয়াহিদ, সাহিত্যে রাসূল (সা.)-এর অবদান / ডক্টর আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম, একুশ শতকের ক্যালিগ্রাফি শিল্প: শিল্পীদের করণীয় / ইব্রাহীম মন্ডল, বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা চর্চার মুল সীরাত সাহিত্য / মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, বিশ্বনবী (সা.) জীবনপঞ্জী / সিদ্দিক জামাল, আলোর রাসূলের (সা.) আলোর ঝলক / ইকবাল কবীর মোহন, সুদের বিরুদ্ধে মহানবীর সংগ্রাম / মুহাম্মদ নূরুল হুদা, বাংলা ভাষায় রাসূল (সা.) বিষয়ক গ্রন্থ / নাসির হেলাল, রাসূলের (সা.) অনুসরণের অন্যতম দাবী ইকামতে দ্বীনের প্রচেষ্টা / মো: আবদুর রহীম খান, চাই তোমার সাফায়াত / কাজী তাবাস্সুম ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফী: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ / মোহাম্মদ আবদুর রহীম।

গল্প দুটি হল: চুমুকে চুচুক সোনা / হাসান আলীম এবং মুক্তির শ্লোগানে / মোহাম্মদ লিয়াকত আলী। ভ্রমণ কাহিনী 'নবীর দেশের স্মৃতি' লিখেছেন সাইফুল্লাহ মানুছুর।

আর কবিতাগুলো হলো: মরুর গোলাপ / সৈয়দ শামসুল হুদা, শ্রেষ্ঠ রাসূলের জন্য / আবদুল মুকীত চৌধুরী, আয় রাসূলের পথে চলি / মতিউর রহমান মল্লিক, সনেট / মহসিন হোসাইন, আলোর ফুল / হোসেন মাহমুদ, আপনার নাম / মসউদ-উশ-শহীদ, সালাম তাঁকে / জাহাঙ্গীর হাবীবুল্লাহ, স্মরণ / আশরাফ আল দীন, যেনবা নূহের নৌকা / শেখ তোফাজ্জল হোসেন, ভাঙেনি রাসূল (সা.) / মোশাররফ হোসনে খান, না'তে রাসূল / নূরুল ইসলাম মানিক, আঁধার ধোয়া আলোয় / ইসমাইল হোসেন দিনাজী, কাওসার তাঁর হাতে / গোলাম মোহাম্মদ, হেরার দুয়ার / শরীফ আবদুল গোফরান, তোমার ফুলের সৌরভ / রেজা রহমান, তোমাকে সালাম / লিলি হক, না'ত এ রাসূল (সা.) / আহমেদ কায়সার, মন করো উজ্বালা / মহিউদ্দিন আকবর, রাসূল পাকের শানে / রহীম শাহ, মহোত্তম পুরুষ / জাকির আবু জাফর, তিনি আল্লাহর প্রিয় রাসূল / মমতাজ মহল মুক্তা,

www.pathagar.com

তুমি এলে / রফিক মুহাম্মদ, মহান পুরুষ এক / ওমর বিশ্বাস, আলোর উপর আলো চাঁদ / আল হাফিজ, সোনালী আলো চাঁদ / আমিন আল আসাদ, চাই না এ সাজ / নিজাম সিদ্দিকী, ইয়ানবী আস সালাম / আলতাফ হোসাইন রানা, জোতির্ময় / জামান সৈয়দী, গন্তেব্যের সমাপ্তি / আবু বকর মুহাম্মদ সালেহ, ছালাম ভেজে ফেরেস্তায় / শাহাবুদ্দিন আহমদ, নবী ও কবি / ওমর আল ফারুক, নাত-ই-রাসূল (সা.) / সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিঞা, তোমাকে সালাম / ইয়াকুব আলী বিশ্বাস, দরূদ / রায়হান সায়ীদ, লিমেরিক / মো: আল আমিন, সত্য, হাঁ সত্য / ফজলুল হক তুহিন, হায় উম্মত / শহীদুল্লাহ আনসারী, প্রিয় রাসূল / ইউনুস রশিদ, নাত এ রাসূল (সা.) / আরিফ নজরুল, প্রিয় নবী / ডা: শেখ অলি নেওয়াজ রেজা, সেই যে শিশু / শাহ মো: মোশাহিদুল ইসলাম, রুবাইয়াত / মুহাম্মদ রকীবুল ইসলাম, তোমার পায়ে / ওয়াসীম হক, যখন এলেন / বাবুল তালুকদার ও রাসূল (সা.) আছেন / শাহেদ হাসনাইন রাবিত।

এ ছাড়াও এ স্মারকে আছে 'চতুর্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে' শিরোনামে শরীফ বায়জীদ মাহমুদের প্রতিবেদন মূলক একটি লেখা, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং মাসব্যাপী সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন ২০০১-এর সচিত্র প্রতিবেদন।

২০০২ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র অতীত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে মাসব্যাপী সীরাত প্রোগ্রাম হাতে নেয়। এবারের অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল দেশব্যাপী স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতা, ১৮ দিনব্যাপী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, হামদ-নাত ও কবিতা সন্ধ্যা প্রভৃতি।

জাতীয় যাদুঘরের বেগম সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ব্যারিস্টার মুহাম্মদ জমিরউদ্দিন সরকার। সভাপতিত্ব করেন চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. আবদুস সাত্তার। আলোচনায় অংশ নেন শিল্পকলা একডেমীর পরিচালক মুস্তাফা জামান আব্বাসী, চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল শিল্পী সবিহ উল আলম, চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক অধ্যাপক আবদুল মতিন সরকার।

স্বাগত ভাষণ দেন প্রদর্শনী কমিটির আহবায়ক শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর। অংশগ্রহণকারী ২৪জন শিল্পী হচ্ছেন: মুর্তজা বশীর (জ. ১৯৩২), আবু তাহের (জ. ১৯৩৬), শামসুল ইসলাম নিজামী (জ. ১৯৩৭), ড. আবদুস সাত্তার (জ. ১৯৪৮), সবিহ উল আলম (জ. ১৯৪০), প্রফেসার মীর রেজাউল করীম (জ.

www.pathagar.com

১৯৪২), রাশা (জ. ১৯৫৭), ইব্রাহীম মণ্ডল (জ. ১৯৫৮), নাসির উদ্দীন আহমেদ খান (জ. ১৯৭১), আমিনুল ইসলাম আমিন (জ. ১৯৬৪), শহীদুল্লাহ এফ. বারী (জ. ১৯৫৪), মাহবুব মুর্শিদ (জ. ১৯৬৮), মোঃ আবদুল আজীজ (জ. ১৯৭৪), মুহাম্মদ আমিরুল হক (জ. ১৯৭৮), কে. এইচ. মুনিরুজ্জামান (জ. ১৯৫৭), মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন (জ. ১৯৬৬), মুবাশ্বির মজুমদার (জ. ১৯৭৮), মোহাম্মদ আবদুর রহীম (জ. ১৯৭৪), ফেরদৌস আরা আহমেদ (জ. ১৯৫৭), মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (জ. ১৯৬৭), রফিকুল্লাহ গাজালি (জ. ১৯৬৮), হামীম কিফায়েতুল্লাহ (জ. ১৯৮৩), আবু দারদা মোঃ নায়িম (জ. ১৯৮২) ও মোঃ মাসুম বিল্লাহ (জ. ১৯৮৪)। এ প্রদর্শনীতে মোট ৮৫টি ছবি প্রদর্শিত হয়। এর মধ্যে ৩১টি তেলরঙ, ২৬টি জলরঙ, ১০টি এক্রেলিক, ৪টি কাঠ খোদাই, ৫টি মিশ্র মাধ্যম, ১টি পেন্সিল স্কেচ, ২টি মেহেদী পাতার রঙ, ৩টি পোস্টার কালার, ২টি সিরামিক ও ১টি কালির।

কেন্দ্রের উদ্যোগে এবার সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ১ম হামদ-নাত ও কবিতা সন্ধ্যার আয়োজন করা হয় ১২ জুন ২০০২ হোটেল পূর্বাণীর বলরুমে। এ কবিতা সন্ধ্যায় ৪৩ জন নির্বাচিত কবি রাসূলের শানে কবিতা পড়েন। হামদ-নাত ও কবিতা সন্ধ্যার এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ধর্মপ্রতিমন্ত্রী জনাব মোশারেফ হোসেন শাজাহান। কবিতা আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট নজরুল গবেষক, সাহিত্য সমালোচক জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ।

সীরাতুন্নবী (সা.) ২০০২ উপলক্ষে প্রকাশিত হয় আসাদ বিন হাফিজের সম্পাদনায় আকর্ষণীয় সীরাত স্মারক 'সাহিত্য সংস্কৃতি' সীরাতুন্নবী (সা.) ২০০২ সংখ্যা। এ সীরাত সংকলনটির সম্পাদনা পরিষদে আছেন আসাদ বিন হাফিজ, নাসির হেলাল, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, হাসান আলীম, শরীফ আবদুল গোফরান, কামরুল ইসলাম হুমায়ুন, জাকির আবু জাফর ও রফিক মোহাম্মদ। এ সংকলনে কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদ-এর দু'টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। অনুবাদ কবিতা অংশে আছে ছয় কলেমা ও আমপারার পাঁচটি সুরার কাব্যানুবাদ। অনুবাদ

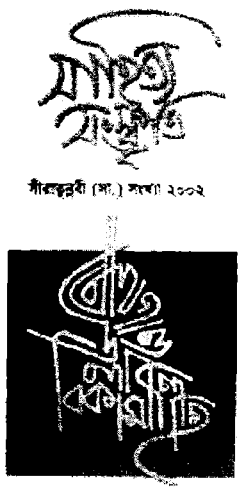

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

www.pathagar.com

করেছেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। অপ্রকাশিত রচনা অংশে মুনিরউদ্দীন ইউসুফ-এর অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ : ঈমানই মুসলমানের বিজয়ের জামিন মুদ্রিত হয়েছে। প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান-এর নবীপ্রেম ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ড: এম. শমশের আলীর হাদীসে রাসূল (সা.)-এর আলোকে বিজ্ঞান, শাহ আবদুল হান্নান-এর ইসলামের দারিদ্র বিমোচন ও জনগণের আস্থা, ড. আবদুস সাত্তার-এর ইসলামী শিল্পকলা ও বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা, সৈয়দ আশরাফ আলীর অমুসলিমদের দৃষ্টিতে হযরত মোহাম্মদ (সা.), এম, এ, রশীদ চৌধুরীর বিশ্বনবী (সা.) প্রসঙ্গ কাব্য সাহিত্য, মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন-এর মহানবীর আদর্শ ও নন্দিত জীবনের অপরিহার্য দিক নির্দেশনা, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান-এর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অর্থনৈতিক আদর্শ, মাসুদ মজুমদার-এর রাসূলে খোদার মিশন, আমাদের বিশ্বাস ও বিজ্ঞাননির্ভর আজকের প্রেক্ষিত, আবু তাহের মোহাম্মদ সালেহ-এর ইসলামী সমাজ গঠন : প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন, ইকবাল কবীর মোহন-এর আদর্শ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.), মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম-এর ঢাকার স্থান নামে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রভাব এবং নাসির হেলালের সীরাত চর্চায় ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র।

রাসূল (সা.)-এর জীবনকেন্দ্রিক গল্প রচনার ধারায় এ বছর এ স্মারকে গল্প লিখেছেন কবি হাসান আলীম। গল্পের শিরোনাম একটি হারের বিনিময়ে।

বরাবরের মতই নতুন কবিতার বর্ণাঢ্য জৌলুস উপচে পড়েছে এবারের সংকলনেও। নতুন কবিতার এ অংশে মুদ্রিত হয়েছে: তুমি যেই এলে / সৈয়দ শামসুল হুদা, তারা কি কেউ বন্ধু স্বজন / আবদুল মুকীত চৌধুরী, শুভাশিস নেবো / মসউদ-উশ-শহীদ, সোনালী শাহজাদা / আব্দুল হালীম খাঁ, জাবালে নূরে দাঁড়িয়ে / মাহবুবুল হক, শতাব্দীর এ কেমন অভিযাত্রা / জয়নুল আবেদীন আজাদ, নবীকে সালাম / জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ, শাশ্বত কথা ও বাণী / সুজাউদ্দিন কায়সার, জগতের সব উজ্জ্বলতার সমষ্টি / দেলওয়ার বিন রশিদ, আমার ভালবাসা / আশরাফ আল দীন, নবীর দুলালী তিনি / সোলায়মান আহসান, রাসূলের (সা.) কাছে পত্র / মোশাররফ হোসেন খান, কাওসার তাঁর হাতে / গোলাম মোহাম্মদ, এক যে তারার ফুল / আহমদ মতিউর রহমান, তোমায় সালাম / শরীফ আবদুল গোফরান, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ / আবদুল কুদ্দুস ফরিদী, ওয়ের্নিকা বিশ্বের জন্য / জামাল উদ্দিন বারী, হে রসূল (সা.) / আহমদ সাকী, একজন মুহম্মদই পারেন / রেজা রহমান, তোমার জন্যেই / আবুল হোসাইন মাহমুদ, হকের সুরভি / জাকির আবু জাফর, দরখাস্ত / আমিন আল আসাদ, আমারও তৃষ্ণা অনেক / ওমর বিশ্বাস, গ্লানির গজল / শাহীন হাসনাত, দরূদ

www.pathagar.com

সালাম / রফিক মুহাম্মদ, তোমার দেখানো পথে / নূরুজ্জামান ফিরোজ, উঠলো যখন হেসে / জামান সৈয়দী, বরফ বিক্রেতার ডাক / নাঈম মাহমুদ, একটি দরোজা খুল্লেই / সৈয়দ সাইফুল্লাহ্ শিহাব, কি উপমায় ডাকবো তোমায় / মাহফুজুর রহমান চৌধুরী, আঁধারে আলো / সিরাজ মুহাম্মদ, প্রিয়তম রাসূল / মুহাম্মদ ইসমাঈল, হেরার পথের সন্ধান / মনসুর আজিজ, সুরভি দুপুর / মঈন বিন শফীউদ্দিন, স্বপ্নের খোঁজে / গোলাম মোস্তফা খান, চৌদ্দশ বছর / আফসার নিজাম উদ্দিন, নাত-এ-রাসূল (সা.) / ইয়াকুব বিশ্বাস, হে সুগন্ধি গোলাপ / স্নিগ্ধা বিশ্বাস, তুমি এলে / শাহীদা আলম নূর।

এ ছাড়া কেন্দ্রের বার্ষিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনও এ সংকলনে রয়েছে। প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেছেন শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র বাংলাদেশের সীরাত চর্চার ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়ের সূচনা করেছিল কয়েক বছর আগে। তারপর থেকে বিরামহীনভাবে রাসূল প্রেমের অনন্য সাক্ষর রেখে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতি বছর তাদের কার্যক্রমের ব্যপ্তি বাড়ছে, নতুন নতুন দিগন্তে প্রসারিত হচ্ছে এ কার্যক্রমের ধারা। তাদের এ কার্যক্রমে জনগণের সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থেকে এটাই প্রতিয়মান হয়– এ দেশের বৃহত্তর গণমানুষের আশা আকাঙ্খা, স্বপ্ন ও কল্পনারই প্রতিধ্বনিত্ব করছে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র।

www.pathagar.com

লেখক অভিধানের জন্য তথ্য আহবান

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র বাংলাদেশের লেখকদের পরিচিতিসহ একটি লেখক অভিধান প্রকাশ করতে যাচ্ছে। একটি সমৃদ্ধ বোর্ড এ অভিধান সম্পাদনা করবেন। সম্মানিত লেখক হিসেবে এ অভিধানে আপনার অন্তর্ভুক্তি আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি। এ জন্য নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ যথাসময়ে সরবরাহ করার জন্য আপনার সমীপে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

১. লেখক নাম : .....
২. প্রকৃত নাম : .....
৩. পিতার নাম : .....
৪. মাতার নাম : .....
৫. বৈবাহিক অবস্থা : .....
৬. স্বামী / স্ত্রীর নাম : .....
৭. সন্তান-সন্ততি : .....
৮. জন্ম তারিখ : .....
৯. জন্মস্থান (পুরো ঠিকানা) : .....
১০. পৈত্রিক নিবাস (পুরো ঠিকানা) : .....
১১. স্থায়ী ঠিকানা : .....
১২. বর্তমান ঠিকানা ও ফোন নম্বর (যদি থাকে) : .....
১৩. কর্মস্থলের ঠিকানা ও ফোন নম্বর (যদি থাকে) : .....
১৪. শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ : .....
১৫. প্রথম প্রকাশিত লেখা (কোথায় এবং কি?) : .....
১৬. প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকা, প্রকাশকালসহ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করুণ) : ..
১৭. সম্মাননা ও পুরস্কার (পেয়ে থাকলে প্রাপ্তিকালসহ) : .....
১৮. বিবিধ (যদি কিছু থাকে) : .....

প্রকাশিত সকল বইয়ের একটি করে কপি (যদি এবং যতটুকু সম্ভব হয়) এবং সত্যায়িত ছবি জমা দিতে হবে। জমাকৃত বই কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করা হবে।

বি. দ্র. যাদের অন্তত পক্ষে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের জন্য এ ঘোষণা প্রযোজ্য। আগামী ২৫ আগস্ট ২০০১ তারিখের মধ্যে অবশ্যই চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পাঠাতে হবে।

ছবি, বই ও তথ্য পাঠাবার ঠিকানা

নাসির হেলাল, অফিস সম্পাদক

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

১৭১, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩১৯৫৪০, ৮৩২১৭৫৮, ৯৫৫১৯০২, ৯৩৪২২১৫ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৩১৯৫৪০

www.pathagar.com

এক যে তারার ফুল

আহমদ মতিউর রহমান

উষর মুরুর ধুসর বুকে
ফুটলো আলোর ফুল
সে যে আমার
মহান নবী
মোহাম্মদ রাসূল।

ফুটলো সে তো ফুল হয়ে
আনলো সুবাস- মৌ বয়ে
সেই ফুলেরই
রৌশনীতে
জাগলো যে নিখিল
আমার নবী
মহাকাশে
জ্যোতি যে ঝিলমিল।

সেই জ্যোতিতে জগত আলো
দূর করলো আঁধার কালো
সাজিয়ে ডালা
ফুলের মালা
জগত হিরন্ময়
আরব আজম
ইরান তুরান
সব করেছে জয়।

আরব মরুর উষর বুকে
সে এক তারার ফুল
সে যে আমার প্রিয় নবী
মোহাম্মদ রাসূল।

www.pathagar.com

তোমায় সালাম

শরীফ আবদুল গোফরান

পাঠালেন তোমায় ধরায় মহামহিম
কেঁপে উঠে দুনিয়ার মানব জমিন।
সাহারাতে এলে তুমি– ফুটলো যে ফুল
খোশবু ছড়ালো করে এ হৃদয় ব্যাকুল।
জিবরিল আমিন এসে জানায় খবর
আলোকিত হয়ে যায় আমিনার ঘর।
কুয়াশার চাদর ঠেলে মরুর বুকে
চাঁদের কিরণ পড়ে ধরার মুখে।

গাছে গাছে ফুটে ফুল তরতরিয়ে
ভোরের পাখিরা ডাকে সুর ছড়িয়ে।
মরুর বুকে হাসে শত বৃক্ষ লতা
নেচে ওঠে গাছে গাছে খেজুর পাতা।
শান্তির বাতায়ন খুলে খুলে যায়
শীতল বাতাস বয় নূরের হাওয়ায়।
ক্ষুধায় কাতর শিশু পায় যে আহার
তুমি হলে পিতা ওগো মা ফাতেমার।

তোমার দোহার কলি হৃদয়ে জাগে
আবেগ মথিত স্বরে নিনাদির বাজে।
অথই সাগর তুমি নেই যে কিনার
ভরে গেলো খোশবুতে গৃহ খাদিজার।
কাবের দু'চোখে তুমি খোদার তরবার
ভয়ে তাই পালায় যত পাপের সরদার।
সাবিত দেখেছে তোমার মুখের হাসি
সাগরের মতো যেন দয়া রাশি রাশি।

তোমার প্রেমে কাঁদে মুস্তরে হান্নান
প্রেমের সাগর ওগো তুমি যে মহান।
বহতা নদীর ঢেউ জীবনের ছবি
মধুময় করে তুমি দিয়েছ গো নবী।
আঁধারের রাতে তুমি এলে যে ধরায়
প্রভাত সূর্য পেলে হেরার গুহায়।
পেলে সেথা মুক্তির খোদায়ী কালাম
আমিনা দুলাল ওগো তোমায় সালাম।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

আবদুল কুদ্দুস ফরিদী

আকাশে ফোটে চাঁদ তারা রবি
বনে ফোটে বনফুল,
মরু বিয়াবানে ফুটেছিলো প্রিয়
মুহাম্মাদ রাসূল।

বর্ণিল বসন্তে হেসেছিলো মরূদ্যান,
খর্জূর বনে লু হাওয়া দুলেছিলো
চিরল পাতার শ্যামল আঁচলে।
সোবহে সাদেকের অপরূপ রঙিন বাতাবরণে
আঙুর কুঞ্জে বুলবুলির কলতানে
সুরের মূর্ছনা এনেছিলো
ফেরদৌসের সুবাসিত আবেশ।

মরুঝর্ণা বয়েছিলো সুরের ছন্দে
দূর দিগন্তে আকাশের নীলাভ দ্যুতি
মিশেছিলো ঝর্ণার শুভ্র ধারায়।
পুব দিগন্তে আলোর ঝর্ণা সাঁতরে
উদিত হলো নবারুণ।
আমিনার পবিত্র কুটিরে
আরেকটি নবারুণ উদিত হলো
নিখিল বিশ্ব হলো বিস্ময়ে কম্পমান।

আকাশে আকাশে তারা ঝিকিমিকি
পাতায় পাতায় সপ্তবর্ণ শবনম হাসে
নীহারিকা ছায়াপথ সজ্জিত
সুনীল আকাশে যে নবারুণ উদিত হলো
তার আলোর বন্যায় ভেসে যায়
পবিত্র কা'বার চত্বর।

সাড়া পড়ে খসরুর নন্দিত রাজপ্রাসাদে,
নিভে যায় ইরানের অগ্নিশিখা।
ফেরদৌস আর এ ধুলির ধরণীতে
রচিত হলো রঙধনু স্বর্ণসেতু–
লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ!

www.pathagar.com

ওয়েনিকা বিশ্বের জন্য

জামাল উদ্দিন বারী

প্রগতি এবং প্রযুক্তির বেনামে অবাধ বাণিজ্য বেশাত
এখন গ্লোবালাইজেশনের মোড়লেরা হাতের মুঠোয়
আইবিএম ক্ষেপণাস্ত্রের রিমোট সুইচ নিয়ে
দাঁত কেলিয়ে হাসে।
সায়গনের মাটিতে নাপাম বোমার তেজস্ক্রিয়তা
মিলিয়ে যাবার আগেই বাগদাদের ফুসফুস ভরে ওঠে
মাষ্টার্ড গ্যাসে, শিশুদের কালো কালো মৃত্যু দেখে
কাফনের মত সাদা বাড়ীর কর্তাদের সে কী উল্লাস!

কার্পেট বোমায় কান্দাহারের আপেল বেদানার বাগানগুলো
ছাই হয়ে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে
আর মি. কোফি আনান পরিবেশ বিষয়ক বিবৃতি দিচ্ছেন।
জনাব আনান সিদ্ধান্ত নিন আরব সাগরের শান্তজলে
সাদা বালিহাঁস, জেলেদের রূপালী স্বপ্ন অথবা
দানবীয় যুদ্ধ জাহাজের বহর নিউক্লিয়ার অস্ত্রবাহী
সাবমেরিন, কারা থাকবে? আপনি কার পক্ষে?
কাশ্মীরী তরুনীরা এখন জাফরান ক্ষেতের শিশিরে
পা ভেজানোর কথা ভাবতে পারে না
আর জেনিন রামাল্লার জনপদ
একেকটি গুর্য়েনিকার পুনরাবৃত্তি।
যারা পৃথিবীর বেনিয়া পুঁজিবাদ জায়নবাদী ষড়যন্ত্র
সন্ত্রাস বিরোধী সম্মিলিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস
কার্লভিনসেন, টমাক, ডেইজী কার্টার হেলিকপ্টার গানশিপ।

তারপরও মৃত্যুর স্বাদ নিয়ে বেঁচে থাকে
শির নত না করার কালেমা
ফিলিস্তিনের আত্মঘাতি তরুণীর জন্য
লেখা হয় কবিতা।
আর আমরা তামাম বিশ্বের জন্য আপনার
শাফায়াত কামনা করি।

www.pathagar.com

হে রসূল (সা.)

আহমদ সাকী

আল্লাহ্ বলে আরব জাতি কাউকে যখন মানতো না
কোন্‌টা ভালো, মন্দটা কি কিছুই যখন জনাতো না

৩৬০ টা মূর্তি যখন কাবা ঘরে ভরছিল
আল্লাহ্‌পাকের রাস্তা ছেড়ে সবাই দূরে সরছিল

হিংসা দ্বেষ আর অনাচারে আরব যখন ভাসছিল
জ্যান্ত শিশু কবর দিয়ে বাবা সুখে হাসছিল

ব্যভিচারের ঘোর কালিমায় সত্য ডুবে যাচ্ছিল
পাপ-সায়রে জগৎবাসী হাবুডুবু খাচ্ছিল–

ঠিক তখনি চোখ-সমুখে উঠলো ভেসে তোমার নূর
আরবসহ বিশ্ব-আঁধার সেই নূরেতে হলো দূর।

ধন্য হলো মানব জাতি সেদিন তোমার পরশে
দু:খ ভুলে উঠ্‌লো নেচে সবাই মনের হরষে।

আজকে আবার হর্ষ ভুলে দেখছি মানুষ পাচ্ছে দুখ
ভায়ের হাতের বুলেট গিয়ে করছে বিদ্ধ ভায়ের বুক।

নারী আবার হচ্ছে বলী যৌতুকেরই নর্দমায়
মাতাপিতা গুরুজনে ঠেলছে ছেলে আপন পায়।

দুষ্টু লোকে বিশ্বটাকে হর-হামেশা জ্বালাচ্ছে
দৃশ্য দেখে শুক পাখিটা বিশ্ব ছেড়ে পালাচ্ছে।

তাইতো সাকী এই সময়ে ডকাছে তোমায়: "হে রসূল,
তোমার নূরে আবার সরাও অনাচারের সকল মূল।"

www.pathagar.com

একজন মুহাম্মদই পারেন

রেজা রহমান

হ্যাঁ, শুদ্ধচারী মেষপালক একজন মুহাম্মদই
প্রতিরোধের দুর্গ গড়তে পারেন
এবং সুনিশ্চিত বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারেন।
আগ্রাসন, সাম্রাজ্যবাদ আর অনাচারের বিরুদ্ধে
তাবৎ নির্যাতিত মানুষের একমাত্র দিশারী একজন মুহাম্মদ।

আমরা ভুলিনি–
কুরাইশ ও গোত্রনেতাদের হাজরে আসওয়াদ নিয়ে
দীর্ঘ ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন আব্দুল্লহ্‌র তরুণ পুত্র।

আরবী আকাশে বেড়ে ওঠা খেজুর খোরমা বিথীতে,
হেরার গুহায় সৃষ্টি রহস্য নিয়ে ভাবেন একজন মুহাম্মদ,
একদিন সমগ্র ভূ-মন্ডল তাঁর পতাকার ছায়ায়
শান্তি ও সজীবতার ঝরণা পেল।

কী আশ্চর্য! নি:স্ব উন্মী অথচ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী একজন
মানুষের ধৈর্য্য, বিনয়, উদারতা, ছন্দময় গতির অগ্নিতে
আজো প্রজ্জ্বলিত হয় শতাব্দী শতাব্দীর অনির্বান শিখা!

একজন মুহাম্মদই সফল প্রতিরোধের দূর্গ গড়তে পারেন।
আজকের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর মজলুমরা
তারই পদরেখা ছুঁয়ে মুক্তির ভোর দেখতে পারে।
মুক্তিকামী ফিলিস্তিন, আফগান, সার্ব, চেচেন, কাশ্মীরীরা
মুহাম্মদের সূর্যালোকেই কেবল কালের প্রবাহমান স্রোতে
আনতে পারে জীবনমুখী উন্মাদনা, ঢেউ।

www.pathagar.com

তোমার জন্যেই

আবুল হোসাইন মাহমুদ

হাবীব আমার তোমার জন্যেই সৃষ্টি হলো সারা জাহান
তোমার জন্যেই আঁধার চিরে আলোয় এলো জ্বীন ইনসান।

মুক্ত হয়ে জুলমাত থেকে পেলো মানুষ নতুন দিন
শিরকের জাল ছিন্ন করে তাওহীদ-রঙে হলো রঙীন।

তোমার জন্যেই মরুর বাতাস আর গায় না শোকের গান
কাঁদে না আর শিশু কন্যা বাঁচাতে তার নিজের প্রাণ।

হলো অবসান খুন-খারাবীর নিত্য যেথায় নামাতো ঢল
অশ্লীলতা, বেহায়াপনার পথ রুখেছে শক্ত আগল।

তোমার জন্যেই মরু-বিয়াবান হলো স্নিগ্ধ মরুদ্যান
সবহারা সব দু:খ ভুলে উঠলো গেয়ে প্রভুর গান।

হলো সাহসী দুর্বলেরা তোমার জন্যেই জেহাদী, বীর
ঈমানের জোশ বুকে নিয়ে বলে, নারায়ে তাকবীর।

হাবীব আমার তোমার জন্যেই আমরা পেলাম খোদার দ্বীন
তোমার কাছে সব মানুষের তাইতো আছে হাজার ঋণ।

নেই কিছু নেই দেবার, শুধু হৃদয় ভরে দিই সালাম
খোদার কাছে আর্জি আমার সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

www.pathagar.com

দরখাস্ত

আমিন আল আসাদ

প্রাণপ্রিয় হযরত নবীজী আমার
আপনার রওজাতে হাজার সালাম
আপনার মাধ্যমে ধরনীতে এলো
সত্য ন্যায়-বাণী দ্বীনের কালাম।

আরবের পাশবিক পরিবেশে তাই
নেমে আসে শান্তির ঝর্ণা প্রপাত
ভেঙে পড়ে নশ্বর সব রীতিনীতি
মিথ্যার ভুতগুলো লাত ও মানাত।

আপনার অনুসারী হয়েছে যারাই
পেয়ে গেছে শাশ্বত হীরে জহরত
আপনার উছিলায় করে মোনাজাত
পেতে চাই আল্লাহর পাক রহমত।

আমি বড় গোনাগার এই দুনিয়ার
শংকায় দোলে তাই এই অন্তর
আপনার অনুসারী হতে পারি যদি
পেয়ে যাবো অবারিত সুখ বন্দর।

সাহস আমার নেই ভয়ভীতি বুকে
আমি দূর্বল ভীরু পাপী আর তাপী
চাইতে পারি না তাই আল্লাহর কাছে
হারিয়ে সকল ভাষা ভয়ে ভয়ে কাঁপি।

দুনিয়ায় আখেরাতে সকল বিপদ
উৎরে যেতেই হবে বালা মুসিবত
তা না হলে জীবনটা ঘোর জঙ্গলে
হারিয়ে সকল পথ হবে যে বিপথ।

www.pathagar.com

আল্লাহর রহমত যদি নাই থাকে
জীবনটা আগা গোড়া ব্যর্থ তা জানি
ওঠে যায় সৃষ্টির সব বরকত
সম্মান মাটি হয় কুয়াশার বাঁকে।

নবীজী আপনি যদি এই অধমের জন্য
খোদার কাজ করে সুপারিশ
কাংখিত আবেদন গ্রহণ করান
তবেই দূর হতে পারে সব ব্যাথা বিষ।

অন্যথা এ জীবন বিষে বিষময়
মানবিক ক্ষয়রোগে হয়ে যাবে ক্ষয়
সে জীবন কাম্য নয় কখনো আমার
সে জীবন ডেকে আনে বিপদ প্রলয়।

প্রাণপ্রিয় হযরত নবীজী আমার
আপনার রওজাতে হাজার সালাম
ছন্দে ছন্দে বাঁধা দরখাস্ত আমার
দরূদ সালাম সহ পেশ করলাম।

www.pathagar.com

আমারও তৃষ্ণা অনেক

ওমর বিশ্বাস

স্বপ্নের আকুতি নিয়ে হাত দু'টি উর্ধ্বমুখী
ঈগলের ডানা করে উঠিয়েছিলাম সেই কবে–
আজো তার কোনো
হিসেব মেলাতে পারিনি।

যখন এই কথাই ভাবনা তাড়িত হয় তখন মনে হয়
লক্ষ বছর ধরে মোনাজাতে বসে আছি
প্রার্থনা করে চলছি আর লক্ষ সমুদ্র
তসবির দানার মতো টিপে টিপে পাড়ি দিয়ে চলছি
তোমার সান্নিধ্যের খোঁজে।

আমারও তৃষ্ণা অনেক,
একটাই চূড়ান্ত প্রাপ্তির আকাঙ্খা নিয়ে
তৃষ্ণার্ত সাগরের মতো উদর পূর্তি করে চলছি
তোমার হিসেবি ছকের ছিটেফোঁটা নিয়ে।

যখন বৈষয়িক দৃষ্টির জাজ্বল্যতা নিয়ে
খেই হারিয়ে ফেলি– ভুলে যাই কৃত্রিম পারফিউমে
সপ্ত আকাশ থেকে আসা খুসবুর ঘ্রাণ
যখন ভুলে যাই ওয়াক্তের হিসেবের কথা কিংবা
পাখিদের উদর পূর্তির পর শুকরিয়া গুজার করা
শব্দের রোশনি। যখন আমার প্রতিবেশের সান্নিধ্যই
আমার কাছে সবকিছুর চেয়ে জৌলুসময় মনে হয়
মনে হয় কোনো অট্টালিকার ভিতরই গন্তব্য।
প্রভু আমার কি দোষ!

তোমার কথা মনে হয় বলেই তো
ক্ষণিকের ভুলে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে
বারবার তোমার ঘ্রাণিত সৌন্দর্যের কাছে ছুটে আসি।

www.pathagar.com

গ্লানির গজল

শাহীন হাসনাত

মুহাম্মদ (সা.) নামের এ ফুলের যে কি রঙ
ও কি সুবাস; তা আমি জানি না। অথচ
সব উদ্যানের পাখিরা তাঁরই আলোচনায় মুগ্ধ।

তাহলে নাদান আমি কি করে লিখি
তোমার রূপের কিছু কথা!
গুলাবের দোয়াতে তবু অক্ষমতার
কলম ভিজিয়ে লিখি
মুহম্মদ (তাঁর উপর দরূদ অবিরত)
আমার কবিতার রঙকাঠি।
যার কথা মনে পড়ায় সূর্যোদয়ও
লজ্জায় লাল হয়।
নিসর্গ ঝরে যায় জাফরানি ফুল তোমার
রওজার ঘ্রাণ নিরংকুশ চুম্বনের জন্য।
হে আলোর বিতান,
আমার আজন্ম সলজ্জ সাধ তোমার নামে
বিলীন করি কবিতার নক্‌শিকাঁথা।
বৃষ্টির উপমার মত ছড়িয়ে দেই তোমার
মহব্বতের আতর ভেজা হৃদয়ের রোদ্দুর।

কিন্তু আমার সাধ্যের প্রজাপতি
সীমান্তের এপার থেকে ফিরে আসে
অবিরল, পারে না ছুঁতে তোমার
প্রজ্ঞার আকাশ,
অবশেষে তাই গ্লানির গজল
দিয়ে তোমাকে আমার সালাম পাঠিয়ে দিলাম।

www.pathagar.com

হকের সুরভি

জাকির আবু জাফর

তোমার পথের দেখানো আকাশ বিনম্র ছায়াদার
পরম শীতল প্রশান্তিময় আপ্লুত সুখ সুখ
কম্পিত ছিল যখন পৃথিবী অদ্ভুত বেদনায়
কী হতো তখন যদি না দেখতো তোমার মায়াবী মুখ।

যদি না তোমার হকের সুরভি পেতো এ জগতজন
যদি না তোমার আলোর আকাশ দেখতো সুবাসী ফুল
তবে কী এসব পাখিদের ঠোঁটে বাজতো বিনয়ী গান!
তবে কী নদীরা নিজের গতিতে ভাঙতো নিজের কূল।

যেখানে পৃথিবী অবাক আঁধারে দিশেহারা বিলকুল
যেখানে মানুষ মানুষের খুনে লাল হতো বরাবর
সেখানে আলোর ভূগোল ছড়িয়ে জাগালে নূরের ঢেউ
সেখানে প্রেমের আজান হেঁকেছো প্রেমের সওদাগর।

কী আরাম পেয়ে জাগ্রত হতো তোমার পায়ের ধুলো
দৃষ্টিরা কতো নতঅবনত বিগলিত হতো জানি
কী সুবাস মেখে ছুটে যেতো সেই আরবের মরু বায়ু
কত মমতায় সুশীতল হতো দু'চোখের নোনা পানি।

তোমার নিবিড় আদর মাখানো মুখ নিঃসৃত বাণী
বাতাস বিলাতো বেদনাক্লিষ্ট মানুষের কানে কানে
কী মধু বীণায় দুঃখ যাতনা গলে যেতো নিজে নিজে
এখনো পৃথিবী প্রাণ চঞ্চলা তোমার সে অবদানে।

www.pathagar.com

দরূদ সালাম

রফিক মুহাম্মদ

আঁধারের আলো তুমি দয়ার সাগর
সে আলোতে ভাসে গ্রাম শহর নগ।

পাখীদের গানে গানে নদীদের কলতানে
তোমার জিকির শুনি চাঁদ তারা আসমানে।

প্রিয় তুমি প্রিয়তম নবীজী আমার
তোমাকে জানাই নবী হাজার সালাম
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।)

তুমি এলে দূর হলো পাপ অনাচার
শুরু হলো সত্য ও ন্যায়ের বিচার।

আলামিন উপাধীতে হলে মহিয়ান
নিয়ে এলে সুমহান বাণী– কোরআন।

প্রিয় তুমি প্রিয়তম নবীজী আমার
তোমার নামে শত দুরূদ সালাম
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।)

www.pathagar.com

তোমার দেখানো পথে

নূরুজ্জামান ফিরোজ

এইতো জীবন অচল অসাড় একদলা পোড়ামাটি
স্বপ্নের ঘোরে এতদিন পুড়ে হয়ে গেছে রক্তিম
এইতো জীবন সাজানো গোছানো আছি বেশ পরিপাটি
হিসাবের খাতা খুলে দেখি এক মস্ত ঘোড়ার ডিম।

কবে কোন দূরে ফেলে যে এসেছি স্মৃতিময় বালুবেলা
শুধু রয়ে গেছে সময়ের ভাঁজে অহেতুক জঞ্জাল
হাতছানি দেয় এখনো আমাকে যা কিছু করেছি হেলা
পোড়া মন তাই স্মৃতির অনলে পুড়ে হয়ে গেছে লাল।

অসময়ে আজ বন্দী হয়েছি বিবেকের কারাগারে
শুধু অকারণে পোড়া মাটিতেই চষে যাই জোড়া হাল
অনন্ত প্রেমে ছুটে যাই পিছে হারিয়ে ফেলেছি যারে
বিপদেই শুধু পড়েছে স্মরণ খুঁজি নাই চিরকাল।

সব সংকটে সারাটি জীবন তুমিই আলোর দিশা
তোমার দেখানো পথে চল্লেই কাটতো এ অমানিশা।

উঠলো যখন হেসে

জামান সৈয়দী

মা আমিনার কোল জুড়ে চাঁদ উঠলো যখন হেসে
সুখের বাতাস বইতে শুরু করলো আরব দেশে।
হাসলো মরুর মাঠের বালি, নীল আকাশের তারা
খুরমা-খেজুর মাঠের ফসল সবাই আত্মহারা।

www.pathagar.com

দিন চলে যায়, মাস চলে যায়, বছর ধীরে ধীরে
মরুর বুকে ওঠেন বেড়ে তাকান না পিছ ফিরে।
কৈশরে পা ফেলেই দেখেন কি যে হানাহানি
সমাজ দেহের পচন দেখে কাঁদে হৃদয়খানি।

কি করে আজ মুছিয়ে দেবেন সমাজ দেহের ক্ষত
হেরা গুহায় বসে তিনি ভাবেন অবিরত।
অবশেষে আল্লাহ্ তায়ালার পেলেন মহান বাণী
সেই বাণীতে ভরলো নবীর ব্যাকুল হৃদয়খানি।

বিশ্ববাসী পেলো এবার খোদার প্রিয় নবী
আঁধার কেটে হাসবে আলো ঘুচবে ব্যথা সবই।
ঘুম থেকে যে জাগেন তিনি সূর্য ওঠার আগে
জায়নামাযে থাকেন বসে গ্রীষ্ম কিংবা মাঘে।

ঐশী বাণীর তেলাওয়াতে কি যে মধুর মায়া
চারপাশে তার থাকে খোদার রহ্মতেরই ছায়া।
শয্যাবিহীন রাত্রি কাটান খোদার মুখোমুখি
বলেন: খোদা, বান্দা তোমার করো তাদের সুখী।

তোমার পথে চলতে তাদের দাও যে মতিগতি
পৃথিবী ও পরকালে হয় না যেনো ক্ষতি।
কিন্তু জাহেল মানুষগুলো তার কথা না শোনে
ক্ষিপ্ত হয়ে আঘাত করে নবীর হৃদয় মনে।

নিজের দেশে থাকার সকল নেয় অধিকার কেড়ে
ব্যথা নিয়ে তাই চলেছেন জন্মভূমি ছেড়ে।
তবুও তিনি রাগ না করে আল্লাহ্কে রোজ ডাকেন
সত্য-ন্যায়ের পথে চলার দাওয়াত দিতে থাকেন।

রাত ও দিনের পরিশ্রমে একদিন অবশেষে
আলোর প্রদীপ জ্বেলে দিলেন বিশ্বে বিজয় বেশে।
আজকে নবীর জন্মদিনে করছি তাকে স্মরণ
নবীর পথে চলেই যেনো হয় সকলের মরণ।

www.pathagar.com

বরফ বিক্রেতার ডাক

নাঈম মাহমুদ

রবফ কিক্রেতার ডাকে জেগে উঠে অদ্ভুত যুবক
পাশ ফেরে, ঘুম ভাঙ্গে হাজার বছর
গুহাবাসী ঘুম ছেড়ে ছুটে যায় জেনিন রাস্তায়–
গলিতে গলিতে আর পাড়ায় পাড়ায় পড়ে যায় সাড়া
তাহেরার ফটোশপ চোখে লাগে শাহাদত সুরমা কাজল
আর তরুণেরা হাতে নিয়ে অন্তহীন প্রেমের প্লাকার্ড
হয়ে যায় আবাবিল অভিশাপ জালুতের জাতির উপর।

বরফ বিক্রেতার ডাকে
জেগে উঠে শতাব্দী, দিকে দিকে যুবকের দল
শহস্রাব্দ কেঁপে উঠে, ছেড়ে দিয়ে ইবলিস আদল।

একটি দরোজা খুল্লেই

সৈয়দ সাইফুল্লাহ্ শিহাব

একটি দরোজা খুল্লেই ঐশ্বর্যের ঘ্রাণ পাই
শরৎ রাতের চাঁদ নেমে আসে নরম শয্যায়
পৃথিবীর আয়েশী উষ্ণতা
ফেটে পড়ে খিল খিল হাসির ঝর্ণায়,
বুকের ভেতর খুঁজে পাই
নেচে ওঠা সময়ের অনবদ্য খুশীর ময়ুর।

একটি দরোজা খুল্লেই
নামহীন গোত্রহীন সাদা নীল নক্ষত্রের খেলা
শুরু হয় ষ্টেডিয়াম চোখে।
একটি দরোজা খুল্লেই
মৃত বৃক্ষের দেখি সবুজের মেলা
নতুন শিশুর মত চিত্রল মুখরতা।
একটি দরোজা মানে– হেরার তোরণ
একটি দরোজা মানে– অমল জীবন।

www.pathagar.com

কি উপমায় ডাকবো তোমায়

মাহফুজুর রহমান চৌধুরী

স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাকে বলেছেন–
'রাহমাতুল্লিল আলামীন'– অর্থাৎ জগৎসমূহের জন্য রহমত,
সমগ্র পৌত্তলিক আরব তোমায় উপাধী দিয়েছিল
'আল আমীন'– অর্থাৎ সত্যের অনির্বাণ সাধক ও
বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব; যার ফলে তোমার শত্রুও গচ্ছিত রাখতো
তার সম্পদ তোমার কাছে– নির্দ্বিধায়।
–কি উপমায় ডাকাবো তোমায়!

স্বয়ং বিশ্বচরাচরের মালিক তোমায় উপাধি দিয়েছেন–
'উসওয়াতুল হাসানা'– অর্থাৎ সত্য-ন্যায়ের দেদীপ্যমান
আলোকশিখা, মহীয়সী মা আয়েশা (রা.) তোমায় বলেছেন–
'কুরআনের বাস্তব জীবনচিত্র বা প্রতিচ্ছবি';
আর তোমার মাফ করে দেয়া জীবনশত্রুরা তোমাকে বলেছে
'ক্ষমার সাগর– দয়ার অসীম দরিয়া।'
–কি উপমায় ডাকবো তোমায়!!

বিদ্রোহী কবি নজরুল কুরআনকে বলেছেন 'মাথার মুকুট'
আর তোমাকে করেছেন 'গলার হার'
The Hundreds তোমাকে স্বীকার করেছে
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শতপুরুষদের মাথার মনি রূপে,
আবার অমুসলিম দার্শনিকদের কলম থেকে অবলীলায় বের হয়–
এই সংঘাতময় শতাব্দীর শান্তি দিতে পারতে কেবলই তুমি।
–কি উপমায় ডাকবো তোমায়!

তোমার আগমনে 'আবুল হেকম'- জ্ঞানের আধার
প্রমাণিত হলো 'আবু জেহেল'- অন্ধত্বের কুপ হিসেবে,
তোমার আগমনে এক ফুঁৎকারে নিভে গেলো–
পারসিকদের কয়েক হাজার বছরের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ড,
তোমার আগমনে 'আইয়্যামে জাহেলিয়্যা' হয়ে উঠলো
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-সুশৃংখল নিয়মতান্ত্রিক জনকল্যাণ রাষ্ট্রের পটভূমি।
–কি উপমায় ডাকবো তোমায় তবে?

উপমারও যদি উপমা থাকতো সেই সে উপমা তুমি
তবে কোন সে উপমায় ডাকবো তোমায় শুনি?
তোমার উপমা কেবলই যে শুধু তুমি!

www.pathagar.com

আঁধারে আলো

সিরাজ মুহাম্মদ

আঁধারের মাঝে আলো মরুভূয়ে প্রাণ
অকপটে ছড়িয়েছে রহমত বান।
মুখে তাঁর মুক্তো, হাসি রাশি রাশি
স্বস্তির ছোঁয়া পেল দুখী দাসদাসী।

তপ্ত মরুর দেহে ফুটলো যে ফুল
তাঁর সাথে কারো কোন হয় না যে তুল।
রাসূলে রাসূল তিনি মুক্তি আলা
ধ্বংসিত মানবেরে পরালেন মালা।

আজো তাঁর বাণী আছে সব ঘরে ঘরে
মানবতা তবু কেন মাথা ঠুকে মরে।
সেই পথে আজ তবে নাও সবে ঠাঁই
অশান্তি কষ্টরা পালাবে সবাই।

প্রিয়তম রাসূল

মুহাম্মদ ইসমাঈল

ওগো রাসূল প্রিয়তম রাসূল
বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে আপনাকে অতি প্রয়োজন
কারণ, চারপাশে বিরুদ্ধ বাতাস, হিংসার দাবদাহ
তবুও সকল রক্তচক্ষু ভেদ করে
প্রতিকুলের ছাদ ফুঁড়ে
আমার বাহু দুটি স্পর্শ করেছে সীমাহীন সীমানা।

এবং দেখ বৈরী হাওয়া, দেখ পৃথিবী
সকল বিরুদ্ধতার আচ্ছাদন ছিঁড়ে
আমার বিদ্রোহী কেশরাশি
কিভাবে আকাশ ছুঁয়ে যায়
রাসূল, আপনি ব্যতীত পৃথিবীটা অচল।

www.pathagar.com

হেরার পথের সন্ধান

মনসুর আজিজ

দুখের বাণে বিদ্ধ হলাম ঘুন ধরা এই ক্ষণ
ঝাঁঝরা হল হৃদয় আমার নিকষ কালো মন
দিনের আলোয় ঝাপসা দেখি বন বীথিকা নদী
মনের ভিতর সিঁধেল চুরি হচ্ছে নিরবধি।

আসমান আজ মেঘ করেছে গভীর অমানিশা
দিক দিগন্তে ছুটছে মানুষ খেই হারিয়ে দিশা
উল্টে বুঝি যায়রে জীবন জমি-জিরাত বাড়ি
আমলনামার ছেঁড়া পাতা দিচ্ছে আকাশ পাড়ি।

হঠাৎ দেখি রশ্মী নূরের হেরার পথে ভাসে
ফুল বাগানে ফুলের কলি পাখ পাখালি হাসে
ছুটছে মানুষ দলে দলে মনে আশার আলো
থামলো ঝড়ের নিধন আবার দূর হল সব কালো।

হেরার নবীর সবক শিখে শুদ্ধ হল মন
সুখের বানে হৃদয় ভাসে পাগল করা ক্ষণ।

সুরভি দুপুর

মঈন বিন শফীউদ্দিন

আসুন আমরা পাগড়ি গুলো নতুন ভাবে বেঁধে নেই
তাকওয়ার চাদরে জড়িয়ে নেই অঙ্গ গুলো
নিশ্চিৎ প্রয়োজন হবে না হেলমেট কিংবা শক্ত ঢাল
মেঘের উচ্চারণে কেঁপে উঠা মোম গুলো
প্রসব করবে না বেওয়ারিশ স্বপ্ন
লাঠিগুলো ব্রীজ না হয়ে হতে পারে ইস্রাফীলের বাঁশি
বোধের ছোঁয়ায় আবারও জাগতে পারে তিতুমীর
বিশ্বাস তো আর বাউলের একতারা নয়
শরীয়ত উল্লাহর সাহস আবারও আনতে পারে সুরভি দুপুর।

www.pathagar.com

স্বপ্নের খোঁজে

গোলাম মোস্তফা খান

প্রতিটি প্রত্যুষের সূর্যালোক এখন
ক্রমে ক্রমে ঢেকে যায় বিবেকের অন্ধকারে।
অথচ তোমার নূরের অলৌকিক আলোয়
জেগে উঠতো ঘুমন্ত সকাল
খুলে যেত
আজন্ম আবদ্ধ সব বিবেকের খিল।
তাইতো তোমাকে ঘিরেই আবর্তিত হতো
স্বপ্নের পায়রা।

এই সময়ে
অনেকটা দিন কোন স্বপ্ন দেখা হয় না
অবচেতন মনে শুধু দু:স্বপ্নেরা ঘর বাঁধে
আলতো ঘুমে আচ্ছন্ন মন রাত্রির কুহকে
সহস্র কপোত
শভ্রতার ডানা মেলে চোখের পাতায়–
সেই ক্ষণে
ঠিক সেই ক্ষণে বয়ে চলে বিষ নীল হাওয়া
একে একে ধেয়ে আসে দু:স্বপ্নের অক্টোপাস
ধেয়ে আসে সংহারী শ্বাপদ আজদাহা
সূঁচালো নখের লুলুয়া শকুন
থাবা মেরে নিয়ে চলে স্বপ্নের সবুজাভ।

আর আমি
নাটাই ছেঁড়া ঘুরির মালিক– সেই বালকের মত
অবিরত ছুটে চলি স্বপ্নের খোঁজে
যেমন সে ছুটে চলে
সূতা কাটা ঘুড়ির সন্ধানে।
যদি পেয়ে যাই হে রাসূল
তোমার আলোর এক থোকা ফুল!

www.pathagar.com

চৌদ্দশ বছর

আফসার নিজাম উদ্দিন

শ্বেতাঙ্গ সময় কেটে
আরশী নগর ক্রমশ রাত হয়
তখন মুনহামান্নার এ্যাকজিভিশনে
প্রদর্শনীর পর্দা পড়ে গেলে
বিজ্ঞাপনী পরশীর ফেটে যায়
ললিত চোখ এবং
মধ্যবয়সী পুরুষ
পোষ্টারে আঁকে জলরঙ ট্রেন।

অহির সামান হাতে
আকাশের গিলাব গলে
প্রেরিত অহি আসে
আন্তজ গ্রামে হয় জ্যোতির্ময়
দরবেশী আবির্ভাব
আর অচিন কুড়াল ভাঙ্গে হেরার পালঙ্ক।

এবং বসন্ত গান করে ফুলের পরাগ
বাতাস আবৃত্তি করে
ইকরা বিইসমি রব্বিকাল্লাজি খালাক
আজাজিলের ঘুম টুটে
লংসেডু নিভে যায়
জাহেল পিদিম– এর পর
দৃশ্যটা চলছে চৌদ্দশ বছর।

তুমি এলে

শাহীদা আলম নূর

তুমি এলে যখন
আকাশে বাতাসে
ছড়ালো একি ধ্বনি,
চারদিকে শুধু
তোমারই নাম
তোমারই জয়ধ্বনি।

তুমি এলে যখন
দূর হলো সব অনাচার অবিচার,
সত্যের মশাল
উঠলো জ্বলে
দূর হলো পাপাচার।

তুমি এলে যখন
ধরণীতে বইলো শান্তির সুবাতাস,
পাখিরা গাইলো
ফুলেরা ফুটলো
হেসে উঠলো অনন্ত আকাশ।

তুমি এলে যখন
বিশ্ব মানব পেল পথের দিশা,
কেটে গেলো সব
আঁধার ও কালো
কেটে গেল অমানিশা।

তুমি এলে যখন
নিখিলের বুকে লেখা হলো এক নাম,
সে নাম জেনো
আর কারো নয়
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

www.pathagar.com

নাত-এ-রাসূল (সা.)

ইয়াকুব বিশ্বাস

মরু সাহারায় খুশির দোলায় গেয়ে উঠে বুলবুল
আলোর জ্যোতি ছড়িয়ে এলেন মুহাম্মদ রাসূল।

পাহাড় নদী ঝর্ণধারা
খুশিতে তাই পাগল পারা
পূষ্প বনে আজো হাসে জুঁই চাপা বকুল।

জাহেলিয়ার কালো আঁধার
যায় পালিয়ে দূর পারাবার
বিশ্ববাসী পেল এবার সব আদর্শের মূল।

পাপী তাপীর হৃদয় গুলো
খুঁজে পেলো নতুন আলো
দ্বীনের জ্যোতি ছড়িযে দিলেন রাসূলে মাকবুল।

হে সুগন্ধি গোলাপ

স্নিগ্ধা বিশ্বাস

মরুর ধুলিময় উদ্যানে প্রস্ফুটিত
এক সুগন্ধি তরতাজা গোলাপ,
পাপড়িতে পাপড়িতে ভ্রমরের গুঞ্জন
সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে আদিগন্তে,
মাশরিক থেকে মাগরিবে
শিমাল হতে জুনুবে।

সুরভী মেখে মেখে মানুষ
সহস্র বছরের পথ হাঁটে পৃথিবীর
ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, নেই হতাশা,
কেবল শান্তির স্ফুরণ, প্রশান্তির দীপ্তি
প্রশংসা যার সিদরাতুল মুনতাহারও উর্ধে
সে ঘ্রাণ পরতে পরতে ছাড়িয়ে
শাশ্বত পথ হাঁটছে মানুষ পৃথিবীর।

www.pathagar.com

বার্ষিক প্রতিবেদন

(জুলাই ২০০১- আগস্ট ২০০২)

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র সুস্থ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ধারা নির্মাণে আশার আলোকবাহী একটি সংগঠন। এর তারুণ্য-উচ্ছল একদল নিবেদিতপ্রাণ সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাহিত্যিকের নিরলস প্রচেষ্টা জাতিকে করেছে আশান্বিত। একটি পরিচালনা পরিষদ ও টীম দ্বারা এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে চলে এর সমুদয় কাজ। প্রতি মাসে পরিচালনা পরিষদ ও টীমের নিয়মিত বৈঠকে বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে গৃহীত হয় চলতি মাসের পরিকল্পনা। নিয়মিত লেখালেখি, গানে সুর দেয়া, নানা রকম প্রশিক্ষণ ছাড়াও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন ও অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রের রয়েছে পরিকল্পিত উদ্যোগ। জুলাই ২০০১ থেকে আগস্ট ২০০২ পর্যন্ত এ ধরণের কিছু বহির্মুখী অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নিচে পরিবেশিত হলো।

আগস্ট ২০০১

ইসলামী শিক্ষা সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃত শহীদ আবদুল মালেক দিবস পালিত

সত্য ও সুন্দরের সপক্ষে কথা বলার কারণে অসুন্দরের ধ্বজাধারী কতিপয় অসুর দানব নির্দয় আঘাতে খুন করেছিল ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবদুল মালেককে। ১৯৬৯ সালের ১২ আগস্ট রেসকোর্সের সবুজ জমিন লাল হয়ে উঠেছিল তাঁর পবিত্র রক্তে। ১৫ আগস্ট তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

শহীদ আবদুল মালেক স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব তাসনীম আলম

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃৎ শহীদ আবদুল মালেক-এর ৩য় শাহাদাত বার্ষিকী স্মরণে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৪ আগস্ট ২০০১ মঙ্গলবার বিকাল ৫টায় বাংলা সাহিত্য পরিষদ মিলনায়তনে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য অধ্যাপক তাসনীম আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শহীদ আবদুল মালেক-এর অন্যতম সাথী ও বন্ধু জনাব ইঞ্জিনিয়ার ইসকান্দার আলী খান। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জনাব অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, জনাব সিদ্দিক জামাল ও কবি মতিউর রহমান মল্লিক। কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের পরিচালনায় এ স্মরণ সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর।

প্রধান অতিথি শহীদ আবদুল মালেকের সাথে তার দীর্ঘদিনের সাহচর্যের স্মৃতিচারণ করে বলেন, শহীদ আবদুল মালেক ছিলেন নিরঙ্কুশ আপোষহীন এক সত্য-সৈনিক। তাঁর চরিত্রের সুবাস এবং মেধা ও পাণ্ডিত্যের কাছে পরাজিত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সভাপতির ভাষণে জনাব তাসনীম আলম বলেন, শহীদ মালেকের রক্ত বৃথা যায়নি। তাঁর রক্ত ইসলামী সমাজ গড়ার জন্য হাজারো মালেককে জন্ম দিয়েছে। আলোচকবৃন্দ তাঁকে এদেশে ইসলামী শিক্ষা সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, শহীদের রক্ত আন্দোলনকে কত দুর্বার ও বেগবান করে তাঁর শাহাদাতই তার প্রমাণ।

সভায় শহীদ আবদুল মালেকের লেখা থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করেন জনাব চৌধুরী গোলাম মওলা, নিবেদিত কবিতা পাঠে অংশ গ্রহণ করেন কবি গোলাম মোহাম্মদসহ অন্যান্য কবিবৃন্দ, গান পরিবেশন করেন শিল্পী মশিউর রহমান। অনুষ্ঠানে জনাব শরীফ বায়জীদ মাহমুদের পরিচালনায় কবি আসাদ বিন হাফিজের লেখা 'পনরই আগস্টের গল্প' অবলম্বনে আহসান হাবীব রচিত শাহাদাতের স্মৃতিবাহী শ্রুতিনাটিকা পরিবেশন করে মহানগর নাট্য সংসদ।

সভায় শহীদ আবদুল মালেকের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ রচনা, তাঁর নামে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয়ভাবে প্রতিবছর পনরই আগস্ট শহীদ আবদুল মালেক শাহাদাত বার্ষিকী পালনের জন্য বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের প্রতি উদাত্ত আহবান জানানো হয়।

অক্টোবর ২০০১

কবি ফররুখ আহমদ স্মরণ সভা

ফররুখ কাব্য কেবল বাংলা সাহিত্য নয়, বিশ্ব সাহিত্যেরও অনন্য সম্পদ, জাতীয় প্রেসক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে ১৯ অক্টোবর ২০০১ ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ফররুখের মত দুর্লভ কবি প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া উচিত। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাহিত্য গবেষক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ। স্বাগত ভাষণ দেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন কবি মোশাররফ হোসেন খান ও কবি হাসান আলীম। কবির কবিতা থেকে আবৃত্তি করেন জনাব শরীফ বায়েজীদ মাহমুদ, কবির লেখা গান পরিবেশন করেন শিল্পী মশিউর রহমান ও শিল্পী শামিমুল হক। নিবেদিত কবিতা পড়েন

www.pathagar.com

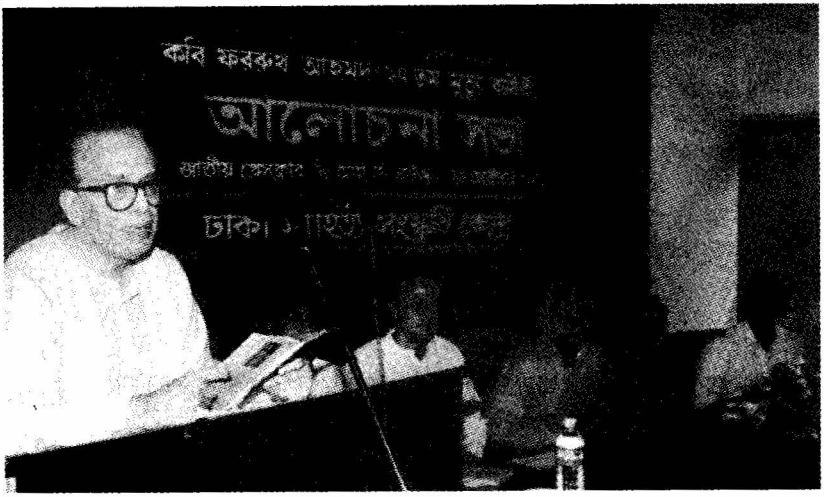

ফররুখ দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব ড. আশরাফ সিদ্দিকী

কবি জাকির আবু জাফর।

সভাপতির ভাষণে জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, ফররুখ আহমদ ছিলেন মানবতাবাদের কবি। তাঁর কাছে ইসলাম ও মানবতাবাদ ছিল অভিন্ন। নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তিনি সত্য, সততা ও মজলুম মানবতার পক্ষে কালজয়ী কাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন।

কবি মোশাররফ হোসেন ও কবি হাসান আলীম ফররুখ কাব্য বিশ্লেষণ করে বলেন, তরুণ প্রজন্মের কাছে একমাত্র ফররুখই অনুকরণীয় ও আদর্শ হতে পারেন।

কথাশিল্পী জামেদ আলী স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন কবি আল মাহমুদ

www.pathagar.com

কথাশিল্পী জামেদ আলী স্মরণে আলোচনা সভা

প্রখ্যাত কথাশিল্পী জামেদ আলীর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে ২১ অক্টোবর ২০ চারটায় বাংলা সাহিত্য পরিষদ মিলনায়তনে নাবিক সাহিত্য চক্রের উদ্যো আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠি সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কবি আল মাহমুদ। আলোচনায় অংশ নেন কবি মোশার হোসেন খান, কবি সোলায়মান আহসান, কবি হাসান আলীম, কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি নাসির হেলাল, কবি গোলাম মোহাম্মদ, কবি শরীফ আবদুল গোফরান ও কবি জাকির আবু জাফর। সভায় জামেদ আলী রচনা সমগ্র প্রকাশের দাবী জানানো হয়।

নভেম্বর ২০০১

আফগানিস্তানে শিশু হত্যা বন্ধের দাবীতে র‍্যালি

আফগানিস্তানে শিশু হত্যা, গণহত্যা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধের দাবীতে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র ৩রা নভেম্বর ২০০১ শনিবার বিকাল সাড়ে চারটায় জাতীয় প্রেসক্লাবের

আফগানিস্তানে শিশু হত্যা বন্ধের দাবীতে ঢাকার রাজপথে সাহিত্যিক শিল্পী ও শিশুদের র‍্যালি

সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও শিশু র‍্যালীর আয়োজন করে। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে এবং সাংবাদিক শাহীন হাসনাতের পরিচালনায় এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক ও কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। কবি মতিউর রহমান মল্লিক তাঁর বক্তব্যে বলেন, টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী ঘটনার অজুহাতে আফগানিস্তানের নিরীহ জনগণের ওপর হামলা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত না করে নির্বিচারে শিশু, নারী ও অসহায় মানুষের ওপর আমেরিকা যে বোমা বর্ষণ করছে সে জন্য আমেরিকাকে অবশ্যই খেসারত দিতে হবে। কবি আসাদ বিন হাফিজ বলেন, আমরা আফগানিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিন্দা জানাই। সভাপতির বক্তব্যে জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর বলেন, আমরা মনে করি লাদেন একটি উপলক্ষ মাত্র। এর মূল লক্ষ্য

www.pathagar.com

মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ইহুদীদের রক্ষা করা।
সমাবেশে নাট্যকার শাহ আলম নূর, শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল, কবি নাসির হেলাল, কবি গোলাম মোহাম্মদ, শরীফ বায়েজীদ মাহমুদ, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, কবি জাকির আবু জাফর, শিল্পী মশিউর রহমান, শিল্পী আমিনুল ইসলাম, হাসান আখতারসহ বিপুল সংখ্যক সাহিত্য সংস্কৃতিকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে 'শিশুরা আমার ভাইকে মেরো নাম্ব, 'আফগানিস্তানে শিশুহত্যা বন্ধ করম্ব ইত্যাদি ফেস্টুন বহন করে।

'আফগানিস্তান আমার ভালবাসা' শীর্ষক কবিতা পাঠের আসর

১৬ নভেম্বর শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত জাতীয় প্রেসক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে 'আফগানিস্তান আমার ভালবাসা' শীর্ষক একটি কবিতা পাঠের আসরের আয়োজন করা হয়। ড. আশরাফ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কবিতা পাঠের আসরে আলোচনায় অংশ নেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ও কবি আসাদ বিন হাফিজ।
কবি জাকির আবু জাফরের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে যুদ্ধ বিরোধী কবিতা পাঠে অংশ নেন সর্বজনাব কবি ড. আশরাফ সিদ্দিকী, সৈয়দ শামসুল হুদা, মতিউর রহমান মল্লিক, আসাদ বিন হাফিজ, আহমদ আখতার, গোলাম মোহাম্মদ, নাসির হেলাল, মহিউদ্দিন আকবর, খান মুহাম্মদ শিহাব, শরীফ আবদুল গোফরান, জাকির আবু জাফর, গোলাম নবী পান্না, জামসেদ ওয়াজেদ, রেজাউল হক হেলাল, এম. আর. মঞ্জু, রবিউল ইসলাম, ওমর বিশ্বাস, রাকিবুল ইসলাম, অঞ্জন শরীফ, মোঃ জালালউদ্দিন নলুয়া প্রমুখ। আবৃত্তিতে অংশ নেন জনাব শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।
সভাপতির ভাষণে ড. আশরাফ সিদ্দিকী নিরীহ আফগান জনগণ বিশেষ করে শিশু ও নারীদের রক্ষায় ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহবান জানান। তিনি

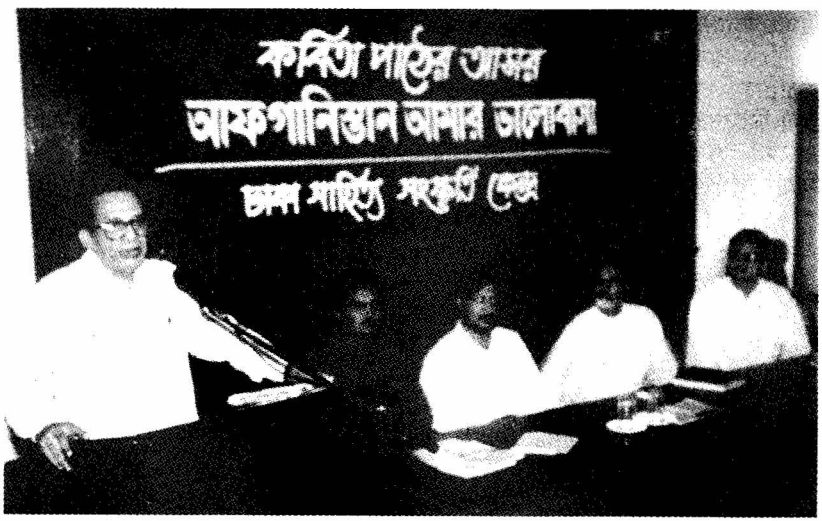

'আফগানিস্তান আমার ভালবাসা' শীর্ষক কবিতা পাঠের আসরে বক্তব্য রাখছেন
ড. আশরাফ সিদ্দিকী

www.pathagar.com

'আফগানিস্তান আমার ভালবাসা' শীর্ষক কবিতা পাঠের আসরে মুনাজাতের দৃশ্য

মানবতা বিরোধী বৃহৎ শক্তিবর্গের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ বন্ধে বিশ্বনেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। মুনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

ডিসেম্বর ২০০১

কবিতা পাঠের আসর ও ইফতার মাহফিল

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ও জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ বলেছেন, আমাদের সংস্কৃতি, জাতিসত্তা ও পরিচয়ের ভিত্তি হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুশীলনই আমাদের এই চেতনার সমৃদ্ধি ঘটাবে। ১লা ডিসেম্বর ২০০১ শনিবার রমনা রেস্তোরায় ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত কবিতা পাঠের আসর ও ইফতার মাহফিলে তিনি এ কথা বলেন।

কবি আল মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি ড. সদরুদ্দিন আহমদ, ছড়াকার রফিকুল হক দাদু ভাই, শিল্পী সবিহ উল আলম, জাসাসের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আহমদ, কমলকুঁড়ির অধ্যক্ষ আহমদ কায়সার, ওয়ার্ল্ড মুসলিম কালচারাল সোসাইটির সভাপতি আহমদ সেলিম রেজা, বিপরীত উচ্চারণের সভাপতি কবি নাঈম মাহমুদ, কেন্দ্রের

বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

www.pathagar.com

ইফতার মাহফিলে মুনাজাত পরিচালনা করছেন মাননীয় সমাজকল্যাণমন্ত্রী জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, অন্যান্যের মধ্যে মঞ্চে উপবিষ্ট কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর, জাসাসের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আহমদ, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি ড. সদরুদ্দিন আহমদ, কবি আল মাহমুদ, শিল্পী সবিহ উল আলম, রফিকুল হক দাদু ভাই ও কবি আসাদ বিন হাফিজ

সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ।

কবি আল মাহমুদ বলেন, এ দেশের স্বাধীনতা, জাতিসত্তা, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের শত্রুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সাংস্কৃতিক শক্তি না থাকলে রাজনৈতিক বিজয়ও হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ে। জাতিসত্তা ও বিশ্বাসের বিজয় ধরে রাখার জন্য সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাজ করে যেতে হবে। কেন্দ্রের সভাপতি জনাব অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর বলেন, বিশ্বাসী ও দেশপ্রেমিক সাংস্কৃতিক কর্মীদের ঐক্যের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আওয়ামী লীগ সরকার আমাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির ওপর বার বার আঘাত হেনেছে। সরকারের পরিবর্তন হলেও তাদের রেখে যাওয়া সাংস্কৃতিক পরিকল্পনার পরিবর্তন হয়নি। সরকারী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের নিয়োজিত লোকজন বসে থেকে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অপতৎপরতায় লিপ্ত। জোট সরকারকে এদিকে নজর দিতে হবে এবং জাতির প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিদের বদলে বিশ্বাসী ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিতে হবে। আলোচনা অনুষ্ঠানের আগে প্রায় অর্ধশত কবি কবিতা পাঠের আসরে অংশ গ্রহণ করে।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

সাংস্কৃতিক সীমানা অরক্ষিত থাকলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় বক্তারা বলেন, সাংস্কৃতিক সীমান্ত অরক্ষিত থাকলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বিজয়ের আনন্দ ধরে রাখতে হলে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার বিকাশ বাড়াতে হবে। ১৪ ডিসেম্বর ২০০১, শুক্রবার সকাল দশটায় বাংলা সাহিত্য পরিষদ মিলনায়তনে

www.pathagar.com

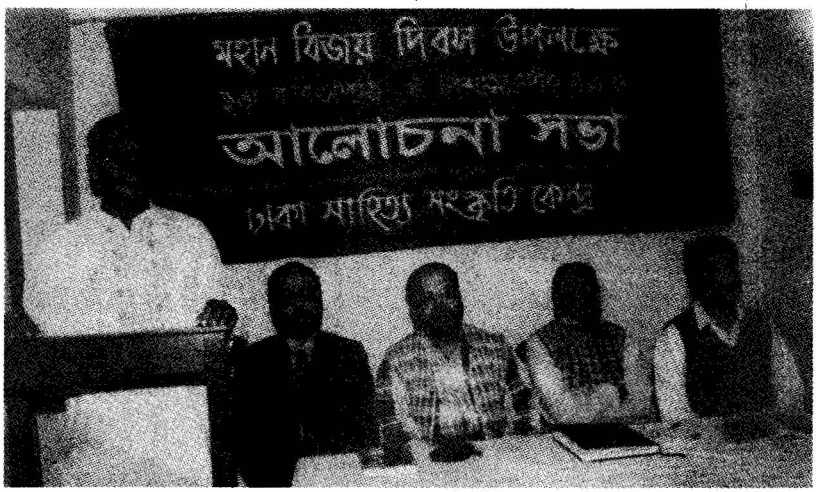

বক্তব্য রাখছেন বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব মুহাম্মদ সিরাজউদ্দিন

অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে প্রখ্যাত গবেষক, বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব মুহাম্মদ সিরাজউদ্দিন এ কথা বলেন। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল ছড়া ও কবিতা পাঠের আসর, আলোচনা সভা এবং দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনা। প্রধান অতিথি জনাব মুহাম্মদ সিরাজউদ্দিন তাঁর ভাষণে আমাদের সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পরিচয় তুলে ধরে বলেন, মানুষকে সুখ ও শান্তির ঠিকানা খুঁজে দেয়ার জন্য সাংস্কৃতিক কর্মীদের সচেষ্ট হতে হবে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ধারা তুলে ধরে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কোরআনের আয়াত তুলে দেয়া এবং পৌত্তলিক সংস্কৃতি চালু করার চেষ্টা যে এদেশের গণমানুষের সাংস্কৃতিক বোধ ও বিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল ভোটের মাধ্যমে জনগণ তা প্রমাণ করেছে। এ রাজনৈতিক বিজয় স্থিতিশীল থাকবে না যদি গণচেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুসংহত সাংস্কৃতিক ধারা ধরে রাখা না যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক নীতিমালায় অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ সংস্কৃতি কমিশন যে সাংস্কৃতিক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তাই আমাদের সাংস্কৃতিক নীতিমালা। এ নীতিমালাগুলো সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করা উচিত। কবি মতিউর রহমান মল্লিক বলেন, সমাজের মানুষ যতক্ষণ অন্যের হক আদায়ে সচেষ্ট না হবে ততক্ষণ স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ অনুভব করা সম্ভব নয়। আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতিসম্পন্ন সরকারই কেবল এর নিশ্চয়তা দিতে পারে। সভায় কবি গোলাম মোহাম্মদ, মানসুর আজিজ, মঈন বিন শফিউদ্দিন, শফিকুর রহমান রঞ্জু, আহসান হাবীব খান, জোবায়ের আল মামুন, শহীদুল ইসলাম কিবরিয়া প্রমূখ কবিতা পাঠ ও আবৃত্তিতে অংশ নেন। গান পরিবেশন করেন শিল্পী মশিউর রহমান, সালাহউদ্দিন সুমন, মাহবুব আল হাদী প্রমূখ শিল্পীবৃন্দ।

www.pathagar.com

প্রকাশনা উৎসবে বক্তব্য রাখছেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী

মুন্‌সী মেহেরউল্লা : জীবন ও কর্ম গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব

নাসির হেলাল সম্পাদিত 'মুন্‌সী মেহেরউল্লা জীবন ও কর্ম' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষে ২৫ ডিসেম্বর ২০০১ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সোনারগাঁও রোডস্থ হামদর্দ মিলনায়তনে কেন্দ্রের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

কবি আল মাহমুদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক ড. আফতাব আহমদ। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জনাব আবদুল খালেক মজুমদার, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ডা. মকবুলার রহমান, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, কবি আসাদ বিন হাফিজ ও কবি নাসির হেলাল।

প্রধান অতিথি সৈয়দ আশরাফ আলী বলেন, একশ বছর আগে মুনশী মেহেরুল্লাহ যে কাজের দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন আজ আমাদের তা সম্পন্ন করতে হবে। আড়াই লক্ষ মসজিদের পাঁচ লক্ষ ইমাম মুয়াজ্জিনকে কাজে লাগিয়ে গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতিকে নিরক্ষরমুক্ত করা সম্ভব। ড. আফতাব আহমদ মুনশী মেহেরুল্লাহকে যুগের সিংহ পুরুষ আখ্যা দিয়ে তাকে পৌত্তলিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদী বীর বলে উল্লেখ করেন। কবি আল মাহমুদ মুনশী মেহেরুল্লাহকে সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের প্রতীক বলে উল্লেখ করেন।

আলোচনা পর্বের পর শরীফ বায়জীদ মাহমুদের পরিচালনায় মুনশী মেহেরুল্লাহ শীর্ষক শ্রুতি নাটিকা ও সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন আহসান হাবীব, শোয়েব আহমদ, শাহজাহান কবীর, মশিউর রহমান ও শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

www.pathagar.com

ভাষা শহীদ দিবসের ৫০ বছরপূর্তি উৎসবে শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব মোস্তফা জামান আব্বাসী প্রধান অতিথির ভাষণ রাখছেন

ফেব্রুয়ারী ২০০২

ভাষা শহীদ দিবসের ৫০ বছরপূর্তি উদযাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও ভাষা শহীদ স্মৃতির ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে ১৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার বিকেল চারটায় হামদর্দ মিলনায়তনে কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি ও গানের আসর। কবি আল মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব মোস্তাফা জামান আব্বাসী। আলোচনায় অংশ নেন সর্বজনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি মুকুল চৌধুরী, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, কবি নাসির হেলাল প্রমূখ।

আবৃত্তিতে অংশ নেন আহসান হাবীব খান, ভাষার গান পরিবেশন করেন শিল্পী সালাহউদ্দিন সুমন, শিল্পী শামিমুল হক।

মার্চ ২০০২

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে বাংলা সাহিত্য পরিষদ মিলনায়তনে প্রবীণ সাহিত্য সমালোচক ও সাংবাদিক জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রাণপুরুষ কবি আল মাহমুদ। আলোচনায় অংশ নেন গবেষক জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, কবি হাসান আলীম, কবি মোশাররফ হোসেন খান ও কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ।

www.pathagar.com

কবি আল মাহমুদ তার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে বলেন, কারো আধিপত্য গ্রহণ করার জন্য বা পৌত্তলিকতা গ্রহণের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ করিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য করে যারা হালুয়া-রুটি খেয়েছে এমন অনেকেই আজ তথাকথিত প্রগতিশীল ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি সেজে স্বাধীনতার চেতনা বিনষ্ট করছে। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল অন্যয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আজো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগ্রত রাখতে হবে। আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার এ চেতনা আমরা লাভ করেছি উত্তরাধিকার সুত্রে আমাদের ধর্ম থেকে।
সভাপতির ভাষণে জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ বলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা প্রবল সাংস্কৃতিক হামলার শিকার।
সভার শুরুতে বহু নবীন ও প্রবীণ কবি কবিতা পাঠের আসরে অংশ গ্রহণ করে।

গাঙচিল মন নৌভ্রমণ

নগর জীবনের যান্ত্রিকতা কাটিয়ে আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র উপভোগের লক্ষ্যে বার্ষিক বনভোজনের পরিবর্তে কেন্দ্র এবার আয়োজন করে বৈচিত্রময় নৌভ্রমণের। ২২ মার্চ ২০০২ প্রত্যুষে সদরঘাট নৌটার্মিনাল থেকে এমভি বোগদাদিয়া যোগে শুরু হয় নৌবিহারের। কেন্দ্রের সদস্য, সুধী এবং শুভাকাঙ্খীরা সপরিবারে অংশ নেন এ নৌবিহারে।
দুই শতাধিক শিল্পী সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কর্মীকে নিয়ে এমভি বোগদাদিয়া রওনা করে মেঘনা ঘাটের দিকে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হারিয়ে যায় নাগরিক কোলাহল। দুই পারের অবারিত সবুজ, সুনীল জলরাশি আর উন্মুক্ত আকাশের বিশালতায় সব কটি হৃদয়ে জমা হয় মুগ্ধতার সম্ভার।
আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন কবি আল মাহমুদ, কেন্দ্রের উপদেষ্টা ডা. রেদওয়ান উল্লাহ শাহেদী, কেন্দ্রের সাবেক সভাপতি জনাব হাসান আবদুল কাইউম, ড. হুমায়ুন কবীরসহ

গাঙচিল মন নৌভ্রমণে মরহুম কবি গোলাম মোহাম্মদ ও তাঁর সংগীরা।

www.pathagar.com

আরো অনেকে।

নৌভ্রমণকে সফল সার্থক ও স্মরণীয় করে রাখার জন্য কবি আসাদ বিন হাফিজকে আহবায়ক করে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য সচিব ছিলেন মোঃ আবেদুর রহমান। এ উপলক্ষে প্রকাশিত হয় গাঙচিল মন নৌভ্রমণ স্মারক ২০০২। সম্পাদনা করেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। সহকারী সম্পাদক ছিলেন কবি জাকির আবু জাফর। সম্পাদনা কমিটিতে ছিলেন কবি গোলাম মোহাম্মদ, কবি নাসির হেলাল, কবি শরীফ আবদুল গোফরান। স্মারকটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল। অভ্যর্থনা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। টার্মিনাল গেটে ব্যানার টানিয়ে অভ্যাগতদের সুদৃশ্য ব্যাজ পরিয়ে ত্রিতল লঞ্চে নিয়ে যায় অভ্যর্থনা কমিটি। ডেকোরেশন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন কবি নাসির হেলাল। মেহমান বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন জনাব শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। নাট্যকার শাহ আলম নূর ছিলেন সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বে, তাঁর সহকারী ছিলেন নাট্যকার আহসান হাবীব খান। অর্থ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন রফিকুল ইসলাম সরদার, তাঁকে সহযোগিতা করেন শিল্পী মশিউর রহমান। মোঃ আবদুর রহীম খান ছিলেন খাদ্য বিভাগের দায়িত্বে। তাঁকে সহযোগিতা দেন তৌহিদুর রহমান, শাহজাহান কবীর ও আবদুল লতিফ। আর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্তাবধানের দায়িত্বে ছিলেন কেন্দ্রের সভাপতি জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর।

স্মারকে আছে আসাদ বিন হাফিজের নৌবিহারের গান, গোলাম মোহাম্মদের গাঙচিল মন, শরীফ আবদুল গোফরানের চৈতি হাওয়া, নাসির হেলালের সবার সেরা, জাকির আবু জাফরের গাঙচিল মন, এম.আর.পাঠানের আহা-জারি, ওমর বিশ্বাসের বুড়িগঙ্গার পানি, সিরাজ মুহাম্মদের নৌবিহারে যাব, আজাদ ওবায়েদুল্লাহর হাটটিমাটিম হাট্টা, আফসার নিজামউদ্দিনের নৌবিহার, ইয়াকুব আলী বিশ্বাস, রায়হান সায়ীদের ইচ্ছে করে, উম্মে ফারহানা খুশির নতুন অভিজ্ঞতা, রেজওয়ান মাহমুদের ভোলার পিকনিক, জেসমিন আরা স্নিগ্ধার অপরূপ সৃষ্টি কবিতা। প্রবন্ধ ছিল মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলামের চড় ইভাতির মেলায়, রুম্মান বায়জীদের নৌভ্রমণ ও কিছু স্মৃতি, তৌহিদুর রহমানের লঞ্চে আসুন গাল ভরে হাসুন। প্রচ্ছদ আঁকেন শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল।

নাস্তা শেষে এখানে ওখানে জটলা ও আড্ডায় মেতে ওঠে শিশু-কিশোরসহ অনেকে। শুরু হয় নানা রকম খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতা। একটি ফ্লোর ছেড়ে দেয়া হয় মেয়েদের জন্য। ওখানেও চলে খেলার আয়োজন। মেঘনা ঘাটের কাছে লঞ্চ ভিড়িয়ে আদায় করা হয় জুমার নামাজ। তার আগে মেঘনায় ডুব-সাতার ও গোসল।

নামাজের পর সুস্বাদু খাবার খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে সবাই যখন বিশ্রামে ব্যস্ত তখনি ফিরতি পথ ধরে এমভি বোগদাদী। বিকেলে এক চরে লঞ্চ ভিড়িয়ে ফুটবল খেলা আর বাগানঘেরা মসজিদে আসরের নামাজের স্মৃতি অনেক দিন মনে থাকবে সকলের।

www.pathagar.com

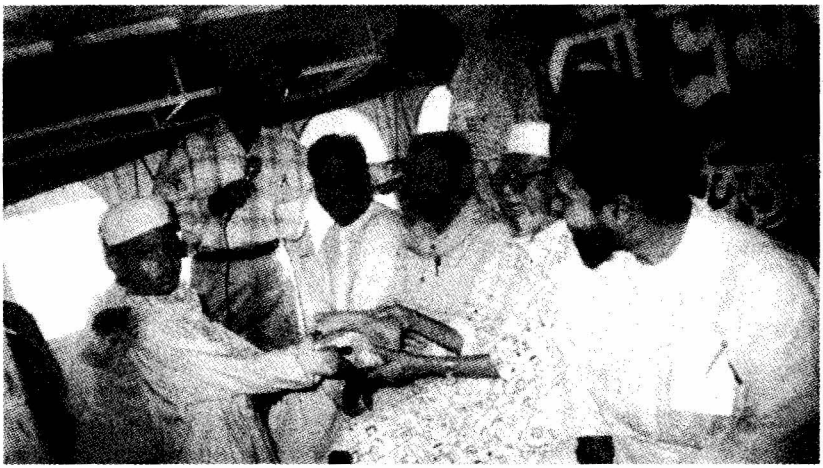

গাঙচিল মন নৌভ্রমণে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করছেন কবি আল মাহমুদ, কেন্দ্রের উপদেষ্টা ডা. রেদওয়ান উল্লাহ শাহেদী ও ড. হুমায়ূন কবীর।

সমাপনী অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই উপভোগ্য। পুরস্কার বিতরণ করেন কবি আল মাহমুদসহ মেহমানবৃন্দ। সন্ধ্যার অন্ধকারে বেজে উঠে বিদায়ের ভেপু। এক বুক স্মৃতি নিয়ে ঘরে ফেরার জন্য পা বাড়ায় সকলে।

এপ্রিল ২০০২

১লা এপ্রিল আন্তর্জাতিক শোক দিবস পালিত

অন্যান্য বারের মত এবারও ১লা এপ্রিল ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র রাজধানীর মুক্তাঙ্গন থেকে বের করে এক ব্যতিক্রমী শোকর‍্যালি। ১৪৯২ সালে স্পেনের গ্রানাডা শহরে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও প্রতারণার মাধ্যমে সাত লক্ষ মুসলমানকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ট্রাজেডি স্মরণে শুরু হয় এই র‍্যালি। খৃস্টানরা হত্যার আনন্দে দিবসটি পালন করে 'এপ্রিল ফুল' হিসাবে আর হত্যার শিকার মুসলমানরা তা পালন করে আন্তর্জাতিক শোক দিবস হিসাবে। বিশ্ব মানবতা তথা মুসলমানদের কাছে কারবালার মতই চরম শোকের স্মৃতিবাহী এ দিনে শিশু-কিশোরসহ শিল্পী সাহিত্যিকরা ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে নেমে আসে রাজপথে। বুকে তাদের জাতিকে জাগ্রত ও সচেতন করার প্রেরণা।

র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সম্মানিত উপদেষ্টা ডা. রেদওয়ান উল্লাহ শাহেদী, বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্য সচিব কবি মতিউর রহমান মল্লিক, কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ও সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ।

এ ছাড়া রাজধানীর মসজিদে মসজিদে এই বিয়োগান্তক কাহিনী তুলে ধরে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় লক্ষাধিক লিফলেট। এর আলোকে মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেবানগণ তাদের খোতবায় তুলে ধরেন সেই বেদনাঘন করুণ চিত্র। পত্রিকায় লেখা হয় ফিচার। এভাবে বিগত চার-পাঁচ বছর ধরে কেন্দ্র জাতিকে সচেতন করার লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

ক্যালিগ্রাফি ওয়ার্কশপ ২০০২

বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্পকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে কেন্দ্র নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। এ লক্ষ্যে কাজ করছে কেন্দ্রের সহযোগী সংগঠন 'ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি অব বাংলাদেশ'। ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০২-কে সামনে রেখে এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হয় মাসব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স। কোর্স কো-অডিনেটর ছিলেন শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল। প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. আবদুস সাত্তার, চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল শিল্পী সবিহ উল আলম, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ বারী ও শিল্পী অধ্যাপক রেজাউল করীম।

বাংলা নববর্ষ উদযাপন : স্মারক প্রকাশ, পথনাটক ও আলোচনা অনুষ্ঠান

বাংলা নববর্ষে কবি ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে গোলাম মোহাম্মদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'এলো বৈশাখ' নামে একটি আকর্ষণীয় স্মারক। সম্পাদনা কমিটিতে ছিলেন শরীফ আবদুল গোফরান, সরদার ফরিদ আহমদ, জাকির আবু জাফর, রফিক মুহাম্মদ ও ওমর বিশ্বাস। প্রচ্ছদ আঁকেন শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল।

১৪০৯ বাংলা নববর্ষের আগমনকে স্বাগত জানিয়ে কেন্দ্রের সহযোগী সংগঠন 'মহানগর সংস্কৃতি সংসদ' ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। বাদ ফজর প্রীতি প্রকাশনের সামনে থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক কর্মীদের র‍্যালি। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ, নাট্যকার শাহ আলম নূর, কবি শরীফ আবদুল গোফরান,

www.pathagar.com

কবি নাসির হেলাল, কবি জাকির আবু জাফর ও 'মহানগর সংস্কৃতি সংসদ'-এর সভাপতি শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

র‍্যালি রমনার বকুল তলায় পৌঁছলে বিপুল সংখ্যক দর্শক শ্রোতার সমাবেশ ঘটে। শুরু হয় পথনাটক ও আলোচনা। বক্তব্য রাখেন কবি আসাদ বিন হাফিজ ও নাট্যকার শাহ আলম নূর। এরপর শুরু হয় মীর মোশাররফ হোসেন রাজু নির্দেশিত ও হাবীব আহসান রচিত বিনোদন পথনাটক 'বিবৃতি প্রদান ছাউনি'। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে মোল্লা তৌহিদুল ইসলাম, মীর মোশাররফ হোসেন রাজু, আবদুল আহাদ শোয়েব, মোঃ হেমায়েত উদ্দিন ও সালাহউদ্দিন সুমন।

মে ২০০২

৫ম ক্যালিগ্রাফির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও স্যুভেনীর প্রকাশ

পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র দেশের ২৪জন বিশিষ্ট ক্যালিগ্রাফি শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ১৭ মে

২০০২ শুক্রবার বিকাল পাঁচটায় জাতীয় জাদুঘরের বেগম সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের তৎকালীন স্পীকার ব্যারিস্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার। আলোচনায় অংশ নেন শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব মুস্তাফা জামান আব্বাসী, চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক জনাব আবদুল মতিন সরকার, শিল্পী সবিহ উল আলম। শরীফ বায়জীদ মাহমুদের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রদর্শনী কমিটির আহবায়ক শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি

www.pathagar.com

এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। আলোচকবৃন্দ বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফিকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবী জানান। এ উপলক্ষে শিল্পীদের ছবি ও শিল্পকর্মের নমুনা ছবিসহ একটি আকর্ষণীয় স্যুভেনীর প্রকাশ করা হয়।

মে ২০০২

মহানগর সংস্কৃতি সংসদ-এর চা-চক্র

মহানগর সংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত চা-চক্র ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের মিলনায়তনে। কবি গোলাম মোহাম্মদ-এর হাতে করা ব্যানারটি সবার দৃষ্টি কাড়ে। ইয়াকুব আলী বিশ্বাসরে উপস্থাপনায় আব্দুর রহীম-এর কোরআন তেলাওয়াত ও মিনহাজুল করীম সুমনের কণ্ঠে নজরুল সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মহানগর সংস্কৃতি সংসদ-এর চা-চক্র ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। নবীন প্রবীণ-এর এক অপূর্ব মিলন ঘটে এ সন্ধ্যায়। আবুল হোসাইন মাহমুদ, কুতুবউদ্দিন, মহিউদ্দীন মনির-এর মত অনেকেই একত্রে মিলিত হন দীর্ঘদিন পর। আলোচনায় আসেন ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেক্রেটারী জনাব আসাদ বিন হাফিজ, সাইমুমের সাবেক পরিচালক মানারত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভারসিটির অধ্যাপক সালমান আল আযামী। প্রাক্তন ভাইদের অভিব্যক্তি বর্ণনার সময় সকলেই তাদের দায়িত্ব পালন কালের অম্ল-মধুর স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে আবেগে কেঁদে ফেলেন। নতুন করে শপথ ও সংকল্প দানা বাঁধে তাদের অন্তরে। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সভাপতি জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর। তিনি প্রাক্তন ভাইদের স্বাগত জানান এবং একসাথে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে সংগঠনকে উজ্জীবিত করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে শিল্পী সালাউদ্দীন সুমন ও আবদুল লতীফ সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং স্ব-রচিত কবিতা আবৃত্তি করেন মাহফুজুর রহমান কচি। সবশেষে মহানগর সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি শরীফ বায়জীদ মাহমুদ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন।

জুন ২০০২

১ম হামদ-নাত ও কবিতা সন্ধ্যা

পবিত্র সীরাতুন্নবী [সা.] উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র ১২ জুন ২০০২ সন্ধ্যায় হোটেল পূর্বানী বলরুমে আয়োজন করে ১ম হামদ-নাত ও কবিতা সন্ধ্যা। ৪৪ জন কবি এতে রাসূলের শানে কবিতা পাঠে অংশ নেন। কবিতা পাঠের আগে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর। বক্তব্য রাখেন ড. আশরাফ সিদ্দিকী। সভাপতিত্ব করেন কবি আল মাহমুদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট উপস্থাপক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। শিল্পী জুবায়ের

www.pathagar.com

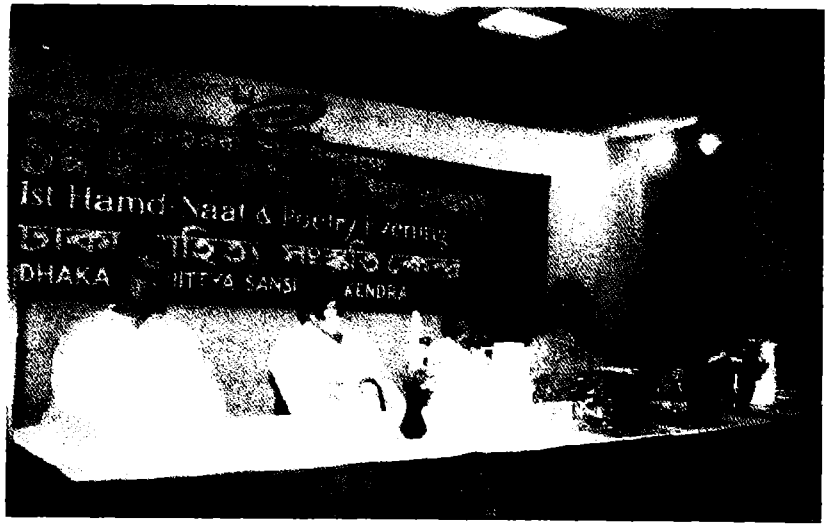

মঞ্চে উপবিষ্ট কবি জাহানারা আরজু, সাবির আহমদ চৌধুরী, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, কবি আল মাহমুদ, আবদুর রশীদ খান ও কেন্দ্রের সভাপতি জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর

হোসাইনের তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। হামদ-নাত পরিবেশন করেন শিল্পী মশিউর রহমান, আবদুল্লাহ আল মাসুদ ও শিল্পী জুবায়ের হোসাইন। আবৃত্তিতে অংশ নেন জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ। অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার জন্য জনাব সাইফুল্লাহ মানছুরকে আহবায়ক ও কবি গোলাম মোহাম্মদকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি নাসির হেলাল,

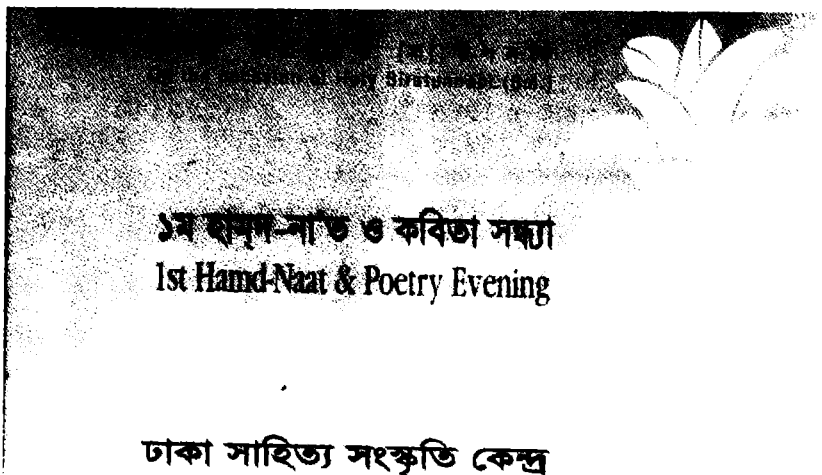

www.pathagar.com

কবি শরীফ আবদুল গোফরান, কবি জাকির আবু জাফর ও কবি ওমর বিশ্বাস।
কবিতা পাঠে অংশ নেন সর্বজনাব কবি সাবির আহমদ চৌধুরী, আবদুর রশীদ খান, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, জাহানারা আরজু, সৈয়দ শামসুল হুদা, আবদুল মুকীত চৌধুরী, মসউদ উশ শহীদ, শাহাদাত বুলবুল, মাহবুবুল হক, সাজজাদ হোসাইন খান, জয়নুল আবেদীন আজাদ, সুজাউদ্দিন কায়সার, মতিউর রহমান মল্লিক, দেলওয়ার বিন রশীদ, শরীফ আবদুল গোফরান, মহিউদ্দিন আকবর, হাসান আলীম, সোলায়মান আহসান, আসাদ বিন হাফিজ, মুকুল চৌধুরী, আবদুল কুদ্দুস ফরিদী, ইসমাঈল হোসেন দিনাজী, গোলাম মোহাম্মদ, আহমদ সেলিম রেজা, আহমদ সাকী, নাসির হেলাল, গোলাম নবী পান্না, কামারুজ্জামান, শাহীন হাসনাত, সোহরাব আসাদ, জামালুদ্দিন বারী, জাকির আবু জাফর, নূরুজ্জামান ফিরোজ, জামান সৈয়দী, আল হাফিজ, আবুল হোসাইন মাহমুদ, নাঈম মাহমুদ, ওমর বিশ্বাস, খাতুনে জান্নাত কণা, সৈয়দ সাইফুল্লাহ শিহাব, আরিফ নজরুল, মনসুর আজিজ, আফসার নিজামুদ্দিন ও কবি মঈন বিন শফিউদ্দিন।
এ উপলক্ষে কবি গোলাম মোহাম্মদের সম্পাদনায় কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত ও ছবিসহ একটি আকর্ষণীয় স্যুভেনীর প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে দেশব্যাপী কবিতা রচনায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মানিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, এটিএম আজহারুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম খান, এডভোকেট জসীম উদ্দিন সরকার, সাইফুল আলম খানসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

জুলাই ২০০২

ভাষা শহীদের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে স্মারক প্রকাশ

জুলাই ২০০২ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয় ভাষা শহীদের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে একটি আকর্ষণীয় স্মারক। স্মারকটি সম্পাদনা করেন কেন্দ্রের প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। সম্পাদনা পরিষদে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন জনাব আসাদ বিন হাফিজ, নাসির হেলাল, শফিকুর রহমান রঞ্জু, গোলাম মোহাম্মদ ও জাকির আবু জাফর। সাড়ে তিন শতাধিক পৃষ্ঠার এ বিশাল স্মারকে স্থান পেয়েছে অনেক দুর্লভ ও মূল্যবান লেখা। সম্পাদকীয়তে ভাষার ক্ষেত্রে বিগত ৫০ বছরের অর্জনের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। যাঁদের প্রাণের বিনিময়ে মহান একুশ অধ্যায়ে ছাপা হয় ভাষা সৈনিদের পরিচিতি ও ছবি। ইতিহাসের দুর্লভ সংগ্রহ অধ্যায়ে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ডডকদণ ীটভথলটথণ রেমঠফণব্র মত টেপর্ধ্রটভ, কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর রেসকোর্সে প্রদত্ত মূল ইংরেজী ভাষণ ও তার বাংলা অনুবাদ, ২৪ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কনভোকেশনে প্রদত্ত

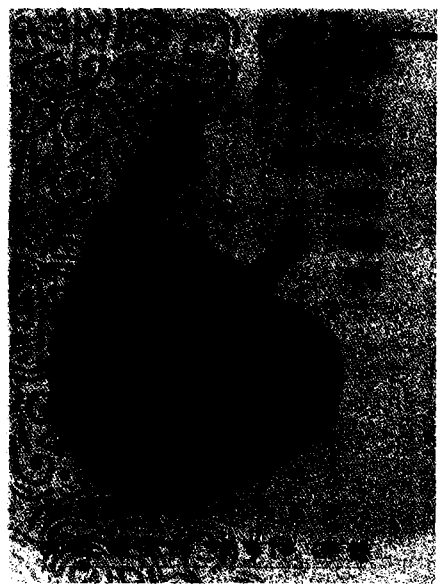

www.pathagar.com

কায়েদে আযমের ভাষণ, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে তমদ্দুন মজলিস প্রকাশিত প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু', পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত মেমোরেণ্ডামের মূল ইংরেজী ও তার বাংলা অনুবাদ, কবি ফররুখ আহমদ লিখিত প্রবন্ধ 'পাকিস্তানঃরাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' স্থান পায়।

বাংলা ভাষার মূল্যায়নমূলক প্রবন্ধ ছাপা হয় সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, শাহাবুদ্দীন আহমদ, ড. এস. এম. লুৎফর রহমান, শাহ আব্দুল হান্নান, অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, ড. মুহাম্মদ আবদুল হক, ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলামের।

এতে ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে প্রবন্ধ লেখেন প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, এ.জেড.এম শামসুল আলম ও মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। স্মৃতিচারণ করেন ড. আশরাফ সিদ্দিকী, মুহম্মদ তকীয়ুল্লাহ, মাহবুবুল হক ও সিদ্দিক জামাল। ছাপা হয় বাংলা ভাষার ওপর ফররুখ আহমদ, আবদুল লতিফ, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, ফজল শাহাবুদ্দিন, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আল মুজাহিদী, মুহম্মদ নূরুল হুদা, আবিদ আজাদসহ ৩৩জন কবির কবিতা। সংগৃহীত সাক্ষাৎকার ছাপা হয় মরহুম ড. এনামুল হক, প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেম ও আতাউর রহমান খানের। সাক্ষাৎকার ছাপা হয় ভাষা সৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম, অধ্যাপক আবদুল গফুর, হাসান ইকবাল, প্রিন্সিপ্যাল আশরাফ ফারুকী ও কবি আল মাহমুদের।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত ইউনেস্কোর রেজুলেশান, প্রস্তাবনা, প্রেস রিলিজ, আবেদন, জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বানী, ঢাকা থেকে প্রেরিত এ সংক্রান্ত চিঠির জবাব এবং ইয়ার বুকে অন্তর্ভুক্তির মূল কপির ফটোকপি ছাপা হয়। এ ছাড়া ছাপা হয় খান মোঃ মীজানুল ইসলাম সেলিমের 'সাতক্ষীরা থেকে নিউইয়র্ক: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আদায়ে দীর্ঘ পদযাত্রা' শীর্ষক মূল্যবান দলিল এবং ড. আলতাফ হোসেন-এর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প: কিছু কথা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। স্মারকে একুশের গল্পের ওপর প্রবন্ধ লেখেন হোসেন মাহমুদ, একুশের কবিতার ওপর প্রবন্ধ লেখেন হাসান আলীম এবং একুশের কার্টুনের ওপর আলোকপাত করেন শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল। রম্য রচনা লেখেন লুৎফুল খবীর, গল্প লেখেন খাতুনে জান্নাত কণা। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত জাতীয় গ্রন্থবর্ষ নিয়ে লেখেন আসাদ বিন হাফিজ এবং ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়ন প্রকল্প নিয়ে লেখেন মুকুল চৌধুরী। নাসির হেলাল তুলে ধরেন ভাষা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহ: সাতচল্লিশ থেকে ছাপ্পান্ন। এ ছাড়াও স্মারকে আছে কেন্দ্রের ভাষা দিবস পালনের রিপোর্ট ও ভাষা আন্দোলনের এলবাম।

আগস্ট ২০০২

সৈয়দ আলী আহসান স্মরণসভা

১৫ আগস্ট ২০০২ বিকেলে জাতীয় জাদুঘর নভেরা মিলনায়তনে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজন করে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান স্মরণে এক আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিল। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান। সভাপতিত্ব করেন কবি আল মাহমুদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর।

স্মরণ সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জনাব আখতারুল আলম, আবুল আসাদ, কবি আল মুজাহিদী, জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, জনাব মোশাররফ করীম ও কবি

www.pathagar.com

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান

আবদুল হাই শিকদার। বক্তারা সৈয়দ আলী আহসানের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে তাঁর প্রণীত জাতীয় সাংস্কৃতিক কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের আহবান জানান। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান তাঁর বক্তব্যে এ রিপোর্ট বাস্তবায়নে তাঁর প্রচেষ্টার আশ্বাস দিলে হল-উপচেপড়া দর্শকরা করতালির মাধ্যমে তাঁকে অভিনন্দিত করে।

কবি গোলাম মোহাম্মদ স্মরণে নাগরিক শোকসভা

২৫ আগস্ট ২০০২ রোববার বাদ মাগরিব মগবাজার আল ফালাহ মিলনায়তনে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে কবি গোলাম মোহাম্মদ স্মরণে আয়োজিত নাগরিক শোকসভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তারা বলেন, এই কবির অসাধারণ কবিতা ও অতুলনীয় গান তাকে সাহিত্য অঙ্গনে স্থায়ী আসন দিয়ে দিয়েছে। বক্তারা কবি গোলাম মোহাম্মদকে একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিচালনা পরিষদের সদস্য কবি গোলাম মোহাম্মদ ২২ আগস্ট ২০০২ মাত্র ৪৩ বছর বয়সে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোকসভায় বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বিশিষ্ট গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, জনাব সিদ্দিক জামাল, কবি মতিউর রহমান মল্লিক ও কবি আসাদ বিন হাফিজ।

অধ্যাপক গোলাম আযম কবি গোলাম মোহাম্মদকে একজন বিজয়ী মানুষ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, তার এই অকাল বিদায় তার সহকর্মীদের পক্ষে সহজে ভোলার নয়। তিনি বলেন, কবি গোলাম মোহাম্মদ কবিদের জন্য আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, মরহুম এই কবি আদর্শের প্রতি ছিলেন অবিচল। শত সমস্যাতেও তিনি আদর্শের পথ থেকে কখনো একচুল পরিমাণ সরে

www.pathagar.com

মুনাজাত পরিচালনা করছেন জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম

যাননি। তার কবিতা ও গানে বিশ্বাসের যে চমৎকার উপস্থাপনা তা নি:সন্দেহে তাকে স্মরণীয় করে রাখবে। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, কবি গোলাম মোহাম্মদের জন্মই হয়েছিল মানুষের হৃদয় জয় করার জন্য। এই কবির সঙ্গে যিনিই পরিচিত হয়েছেন তার পক্ষে তাকে ভুলে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। শোকসভা শেষে কবির বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন প্রবীণ জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম।

নাগরিক শোকসভায় উপস্থিত দর্শকদের একাংশ

www.pathagar.com

বিবৃতি ও শোক প্রকাশ

প্রখ্যাত কথাশিল্পী শাহেদ আলীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ

প্রখ্যাত কথাশিল্পী শাহেদ আলীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর এবং সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, মরহুম শাহেদ আলী ছিলেন আমাদের কথাসাহিত্যের এক কালজয়ী শিল্পী। তাঁর মৃত্যুতে জাতি এক বরেণ্য অভিভাবককে হারালো। আমরা মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। আমরা প্রার্থনা করি, তাঁর সহধর্মিনী, প্রিয় সন্তান-সন্ততি, আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহীদেরকে আল্লাহ এ শোক কাটিয়ে উঠার তৌফিক দিন।' উল্লেখ্য, কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা মরহুমের নামাজে জানাযা ও দাফনে শরীক হন। এ ছাড়া কেন্দ্রের বিভিন্ন সদস্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও নিম্নোক্ত বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সাত সংগঠনের পক্ষ থেকে যুক্ত বিবৃতি

কথাশিল্পী শাহেদ আলীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ

কথাশিল্পী শাহেদ আলীর মৃত্যুতে রাজধানী ঢাকার সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতি সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ করে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, আমরা আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীকে হারিয়ে আজ শোকাবিভূত। তারা মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, মনন সাংস্কৃতিক সংসদের সভাপতি হাসান মুর্তাজা, মুক্তাঙ্গন সাহিত্য সংসদের সভাপতি কবি জাকির আবু জাফর ও সেক্রেটারী কবি শরীফ আবদুল গোফরান, সূচনা থিয়েটারের সভাপতি হাসান আখতার, মহানগর সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি জনাব শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, নাবিক সাহিত্য চক্রের সভাপতি কবি গোলাম মোহাম্মদ ও সেক্রেটারী কবি ওমর বিশ্বাস, চারুশিল্পী সংসদের সভাপতি শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, সুবচন সাহিত্য সংসদের সভাপতি কামরুল ইসলাম হুমায়ুন।

প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ

২৫ জুলাই ২০০২ প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ও সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, সৈয়দ আলী আহসানের মত বিরল মনীষার মৃত্যুতে জাতীয় জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়। আমরা মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

এ ছাড়া প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে আরো বিবৃতি প্রদান করেন সৃজন-এর সভাপতি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, নাবিক সাহিত্য চক্রের সভাপতি কবি গোলাম মোহাম্মদ ও সেক্রেটারী ওমর বিশ্বাস, মনন সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি হাসান মুর্তাজা ও সেক্রেটারী ডা. মুশতাক, চারুশিল্পী পরিষদের সভাপতি শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল, মহানগর সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ও সেক্রেটারী ইয়াকুব বিশ্বাস, প্রত্যয় চলচ্চিত্র সংসদের সভাপতি হাসান

www.pathagar.com

আখতার, চারণ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি তৌহিদুর রহমান, মুক্তাঙ্গন সাহিত্য সংসদের সভাপতি কবি জাকির আবু জাফর এবং সুবচন সাহিত্য সংসদের সভাপতি কামরুল ইসলাম হুমায়ুন। উল্লেখ্য, কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা মরহুমের নামাজে জানাযা ও দাফনে শরীক হন।

কবি গোলাম মোহাম্মদের ইন্তেকাল: শোক প্রকাশ, নামাযে জানাযা ও দাফন

আশির দশকের খ্যাতিমান কবি ও গীতিকার ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিচালনা পরিষদের সদস্য গোলাম মোহাম্মদ মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হয়ে ২২ আগস্ট ২০০২ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় রাজধানীর একটি ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।

কবি গোলাম মোহাম্মদ গত কয়েকমাস ধরেই শারীরিকভাবে বেশ অসুস্থ ছিলেন। গত বুধবার দুপুরের দিকে তার অবস্থার অবনতি ঘটে। পরে তাকে ধানমন্ডির একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার ভোরে তিনি মারা যান। বাদ জোহর মগবাজার ওয়্যারলেস রেলগেট মসজিদে মরহুমের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামাজে ইমামতি করেন বর্ষিয়ান জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম।

কবির মৃত্যু সংবাদ শোনার সাথে সাথে ঢাকাসহ সারাদেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুর কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে জানাযার নামাজে শরীক হন বহু বরেন্য কবি সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ। ছুটে আসেন দৈনিক আল মোজাদ্দেদ সম্পাদক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ, দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ, বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক জনাব আবদুল মান্নান তালিব, কবি আবদুল হাই শিকদার, ছড়াকার সাজজাদ হোসাইন খান, গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, কবি সৈয়দ রফিক, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ ড. হুমায়ুন কবীর, জনাব সিদ্দিক জামাল, শিল্পী হামিদুল ইসলাম, শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল, নাট্যকার শাহ আলম নূর, কবি মুকুল চৌধুরী, কবি মোশাররফ হোসেন খান, কবি সোলায়মান আহসান,কবি হাসান আলীম, শিল্পী মোমিনউদ্দিন খালেদ, ছড়াকার মানছুর মোজাম্মিল, কবি শরীফ আবদুল গোফরান, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, কবি জাকির আবু জাফর, শিল্পী আবদুর রহীম, কবি নিজাম সিদ্দিকী, জনাব হাসান আখতার, জনাব এস.এম রাজ্জাক, কবি কামরুল ইসলাম হুমায়ুন, কবি আলতাফ হোসাইন রানা, কবি আবুল হোসাইন মাহমুদ, নেছারউদ্দিন আইয়ুব, কবি জাকির ইবনে সোলায়মান, রফিক মোহাম্মদ, ওমর বিশ্বাস, শাহীন হাসনাত, এটিএন বাংলার ইসলামী অনুষ্ঠানের পরিচালক জনাব আরকান উল্লাহ হারুনী, ফুলকুঁড়ি সম্পাদক জয়নুল আবেদীন আজাদ। জানাযায় শরীক হন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ, ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতৃবৃন্দ, সাপ্তাহিক বিক্রম সম্পাদক মাসুদ মজুমদার, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর, সেক্রেটারী আসাদ বিন হাফিজ, অন্যান্য কর্মীবৃন্দসহ সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠী, বিপরীত উচ্চারণ, কমলকুঁড়িসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীবৃন্দ।

পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ ও দুটি ছড়াগ্রন্থের লেখক কবি গোলাম মোহাম্মদের কবিতায় আধ্যাত্মিকতা ও রোমান্টিকতা অত্যন্ত শৈল্পিক এবং নান্দনিকভাবে উপস্থাপিত হয়। তার কবিতায় যেমন বিশ্বাসী চেতনার পরিস্ফুটন ঘটেছে, তেমনি মানুষের হৃদয়বৃত্তি এবং প্রকৃতির নিপুন সৌন্দর্যকেও তিনি কবিতায় ধারন করেছেন। মূলত কবি হিসেবে খ্যাতি পেলেও অসংখ্য নন্দিত গান লিখে গীতিকার হিসেবেও তিনি দারুণ জনপ্রিয় ছিলেন।

www.pathagar.com

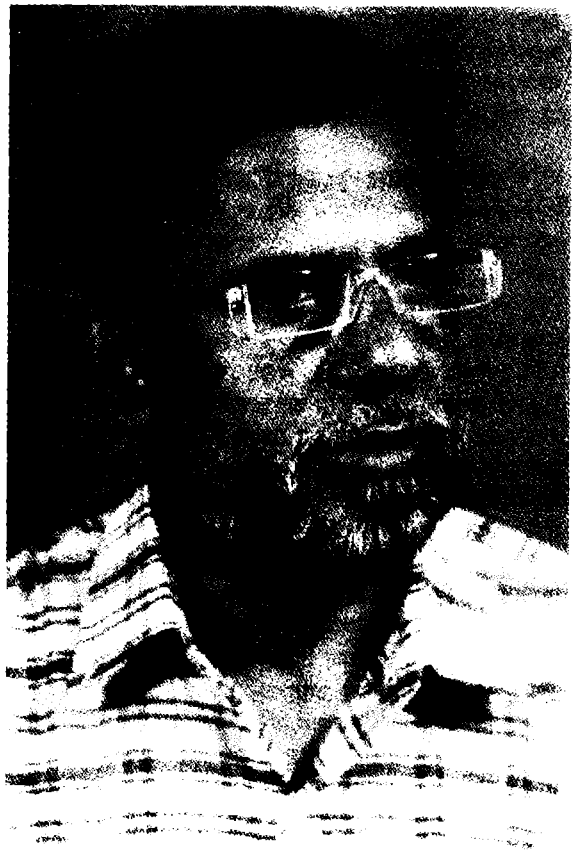

কবি গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৯ সালের ২৩ এপ্রিল মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর থানার গোপালনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

কবি গোলাম মোহাম্মদের অকাল মৃত্যুতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন, কবি আল মাহমুদ, জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের আহ্বায়ক মীর কাসেম আলী, বাংলা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি আবুল আসাদ ও পরিচালক আব্দুল মান্নান তালিব, স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি জোবাইদা গুলশান আরা ও প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান, বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্য সচিব কবি মতিউর রহমান মল্লিক, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর ও সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ, মুক্তাঙ্গন সাহিত্য ফোরামের সভাপতি কবি জাকির আবু জাফর, নাবিক সাহিত্য চক্রের সেক্রেটারী কবি ওমর বিশ্বাস, পেন ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী রফিক মুহাম্মদ। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে শাহাবুদ্দিন আহমদ, কবি সাজজাদ হোসাইন খান, কবি আব্দুল হাই শিকদার, কবি হাসান আলীম, কবি সোলায়মান আহসান, কবি মোশাররফ হোসেন খান, কবি মুকুল চৌধুরী, কবি নাসির হেলাল প্রমুখ কবি গোলাম মোহাম্মদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, জানাযার পরে তার লাশ নিজ জেলা মাগুরায় পাঠানো হয়। গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক গোরস্তানে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর লাশের সাথে ঢাকা থেকে বহু কবি সাহিত্যিক মাগুরায় গমন করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বিশিষ্ট গীতিকার কবি মতিউর রহমান মল্লিক, কেন্দ্রের সভাপতি জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর, কবি নাসির হেলাল, সাংবাদিক সাজজাদুল ইসলাম লাকী, আবুল কালাম আজাদ প্রমূখ।

পরদিন দৈনিক সংগ্রামে তাঁর ওপর পুরো দুই পাতার একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

5th Calligraphy Exhibition 2002

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

Dhaka Shahittya Sanskriti Kendra

www.pathagar.com

৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর রিপোর্ট
বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের উত্থান
মোঃ আবদুর রহীম

শিল্পী মুর্তাজা বশীর ও তাঁর ছবি

ইসলামী শিল্পকলার প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্যালিগ্রাফি। বাংলাদেশে সম্প্রতি ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক কর্মকাণ্ড দেখে এ ধারণা হয় যে, শিল্পটি জনসাধারণের মধ্যে প্রবলভাবে আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। গত দশকেও এ নিয়ে তেমন আলোড়ন দেখা যায়নি। কিন্তু মাত্র এক দশকের মধ্যে এর অগ্রগতি আমাদেরকে অবাক করেছে। বর্তমানে ক্যালিগ্রাফি এতটা জনপরিচিত যে, এর ব্যাখ্যা দেয়ার তেমন প্রয়োজন পড়ে না। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া অর্থাৎ রেডিও, টিভি; প্রিন্টিং মিডিয়া বা ছাপার কাগজ এবং নিয়মিত প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমরা এ বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ক্যালিগ্রাফির আরো যে সমস্ত ব্যবহার সম্বন্ধে জানা যায় তা হচ্ছে, আবাসস্থল, অফিস-আদালত, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সজ্জা ও অলংকরণের কাজে এর ক্রমশ: জনপ্রিয় শিল্প হিসেবে ব্যবহার।

শিল্পী আবু তাহের ও তাঁর ছবি

আমরা জানি, আন্তর্জাতিক শিল্পকলায় ক্যালিগ্রাফি একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। নান্দনিকতা, ফর্ম এবং শিল্পের অন্যান্য অনুষঙ্গ নিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চার মধ্য দিয়ে বিশ্বসভ্যতায় এটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এছাড়া ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে বিমূর্ত বা এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পের আদি রূপ। স্পেনে আন্দালুসিয়ার বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো তার ফর্মের মূল উপাদান সংগ্রহ করেন ক্যালিগ্রাফি থেকে, বিশেষ করে আরবী ক্যালিগ্রাফি থেকে। যে জন্য তার বিখ্যাত সব এ্যাবস্ট্রাক্ট কাজগুলোতে আরবী ক্যালিগ্রাফির প্রভাব দেখতে পাই। এ ছাড়া আরেক বিখ্যাত শিল্পী পলক্লীর

www.pathagar.com

শিল্পী শমিসুল ইসলাম ও তাঁর ছবি

শিল্প কর্মেও আরবী ক্যালিগ্রাফির প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়।

এছাড়া শিল্পকলায় মাত্রা বলে একটা কথা আছে। পেইন্টিং হচ্ছে দ্বিমাত্রিক। শিল্পী এখানে রেখার গতি প্রকৃতিকে চাতুর্যের সাথে ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক করে দেখান, যেটাকে আমরা দৃষ্টি বিভ্রমের মাধ্যমে দ্বিমাত্রাকে ত্রিমাত্রা হিসেবে দেখি। ক্যালিগ্রাফিতে এ বিষয়টি সহজে করা যায়, যে জন্য ক্যালিগ্রাফি শিল্প-বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে।

ক্যালিগ্রাফির গোড়ার কথা এবং শিল্পে এর অবস্থানের কথা সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়, ইসলামের আবির্ভাবই ক্যালিগ্রাফির উন্নয়ের মূল সোপান। রাসূল (সা.) ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে সর্বতো সহায়তা করেছেন। তিনি ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের ভালবাসতেন, এ শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য তিনি নিজে কাজ করেছেন। রাসূল (সা.)-এর জামাতা হযরত আলী (রা.) ছিলেন একজন ক্যালিগ্রাফি শিল্পপ্রেমী মানুষ। তিনি নিজেও একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফি শিল্পী ছিলেন। রাসূলের যমানার পরে মুসলিম শাসকগণ ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে প্রভুত অবদান রেখেছেন। উমাইয়া (৬৬১-৭৫০) শাসকগণ, আব্বাসীয় (৭৫০-১২৫৮) এবং এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসকগণও ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে যথেষ্ঠ সহায়তা প্রদান করেছেন।

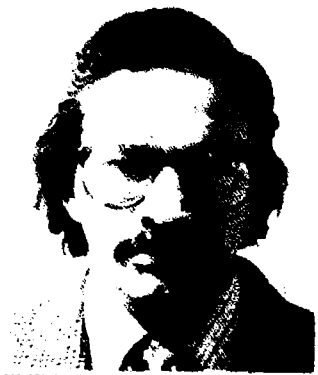

শিল্পী ড. আবদুস সাত্তার ও তাঁর ছবি

আমরা জানি, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আরবী ভাষা ও লিপিতে পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। সুতরাং কুরআনের লিপি হিসেবে আরবী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। ইসলামে মূর্তি নির্মাণ ও প্রাণীচিত্র তৈরী করা গর্হিত কাজ। যে জন্য ক্যালিগ্রাফি শিল্পে ধর্মীয় ও সৌন্দর্যবোধ একত্রে কাজ করেছে।

ঈসায়ী ৬ষ্ঠ শতক থেকে ক্যালিগ্রাফির অগ্রযাত্রা শুরু হয়। রাসূল (সা.)-এর সময়ে কুফি লিপিতে কুরআন লেখা হত এবং অন্যান্য চিঠিপত্র কুফি লিপির সামান্য

www.pathagar.com

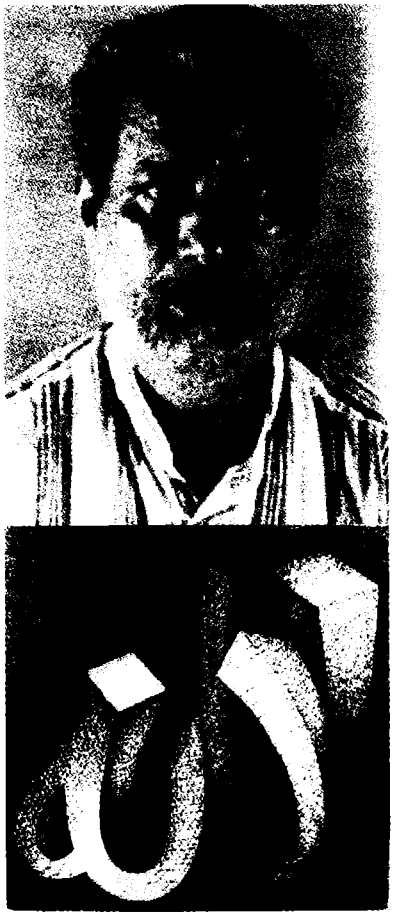

শিল্পী সবিহ উল আলম ও তাঁর ছবি

পরিবর্তিত রূপ মাসক লিপিতে লেখা হত। রাসূল (সা.) বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রদান করেন, যা কুফি লিপিতে লেখা ছিল। কুফি লিপি হচ্ছে কৌনিক ধারা লিপি। যাতে উল্লম্ব ও আনুভূমিক রেখার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কুরআনের লিপি হিসেবে এটি প্রায় তিনশত বছর ধরে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে গোলায়িত ধারার লিপি যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,বাঁকানো বা নমনীয় রেখার প্রাধান্য। সুলুস, নাশক, রায়হানী, মুহাক্কাক, তাওকী

রিকা প্রভৃতি নমনীয় ধারার লিপি সমূহ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির অঙ্গনকে সুষমামণ্ডিত করেছে। এ লিপি সমূহে ব্যাপকভাবে কুরআন সংকলন হতে থাকে। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, লেখার জন্য এটি চমৎকার স্বাচ্ছন্দ ও সাবলিল। এছাড়া এ ধারার লিপিসমূহ সহজভাবে পড়া যায়।

বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের প্রতিষ্ঠানিক কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ অত্যন্ত আনন্দের কথা হচ্ছে, সম্প্রতি এ শিল্পটি এদেশে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করেছে। ক্বাতিব,

প্রফেসর মীর মোঃ রেজাউল করীম ও তাঁর ছবি

www.pathagar.com

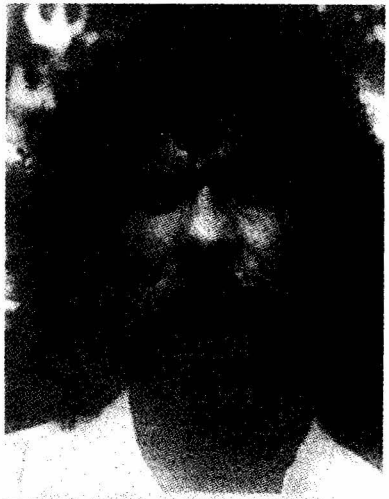

ক্যালিগ্রাফার, শিল্পী, বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান সর্বোপরি এদেশের ইসলামপ্রিয় জনগণের অশেষ আগ্রহের জন্য এটা হতে পেরেছে। গত দশকেও আমরা এটা ভাবতে পারিনি। এ দশকের গোড়া থেকেই এর উত্থান জোরদার হয়।

এ বছর জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দেশের খ্যাতনামা নবীন প্রবীণ শিল্পীদের দলগত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। ১৭মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত ১৮ দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সাবেক স্পীকার ও পরে দেশের প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র বিগত ১৯৯৮ সাল থেকে নিয়মিত এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে পবিত্র সীরাতুন্নবী

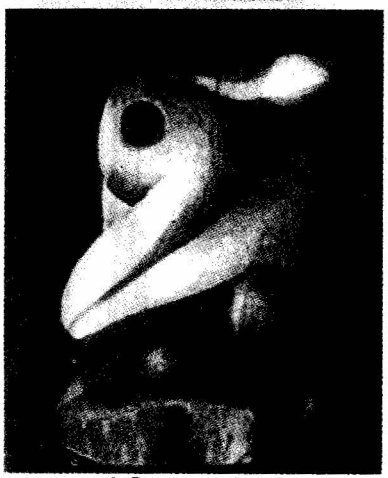

শিল্পী রাশা ও তাঁর ছবি

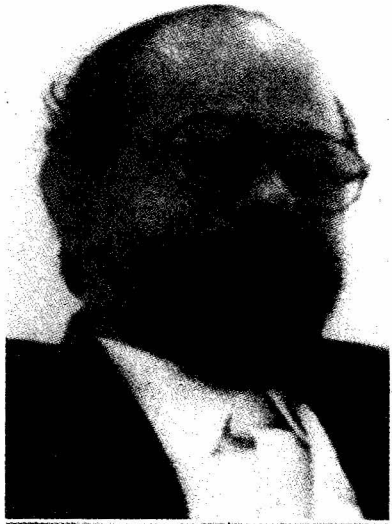

শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল ও তাঁর ছবি

(সা.) উপলক্ষে। এ বছর সর্বাধিক সংখ্যক ক্যালিগ্রাফার শিল্পী (চব্বিশজন) এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রদর্শনীতে যে ২৪ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন, তারা হচ্ছেন: শিল্পী মুর্তাজা বশীর, আবু তাহের, শামসুল ইসলাম নিজামী, ড. আবদুস সত্তার, সবিহ্ উল আলম, মো: রেজাউল করীম, রাশা, ইব্রাহীম মণ্ডল, নাসির উদ্দিন আহম্মেদ খান, আমিনুল ইসলাম আমিন, শহীদুল্লাহ

www.pathagar.com

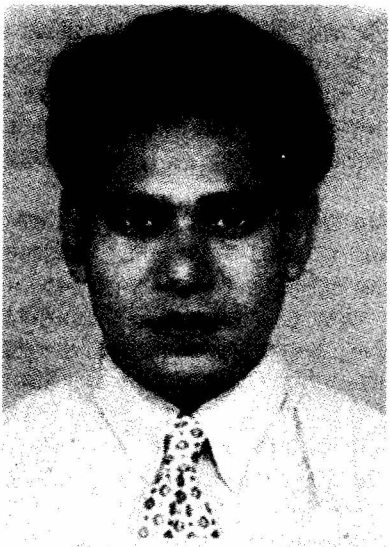

শিল্পী নাসির উদ্দিন ও তাঁর ছবি

এফ. বারী, মাহবুব মুর্শিদ. এম. এ. আজিজ, মোহাম্মদ আমীরুল হক, কে. এইচ. মুনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন, মুবাশ্বির মজুমদার, মোহাম্মদ আবদুর রহীম, ফেরদৌস আর আহমেদ, রফিকুল্লা গাজালী, হামিম কেফায়েতুল্লাহ, আবু দারদা মো: নাঈম, মো: মাসুম বিল্লাহ্। অংশগ্রহণকারী এসব শিল্পীদের মধ্যে অধিকাংশই আরবী হরফে ক্যালিগ্রাফি করেছেন। শিল্পী আবদুস সাত্তারসহ স্বল্পসংখ্যক শিল্পী বাংলা হরফের সাহায্যে শিল্পকর্ম নির্মাণ করেছেন। এবারের এই ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে ৯২টি শিল্পকর্ম স্থান

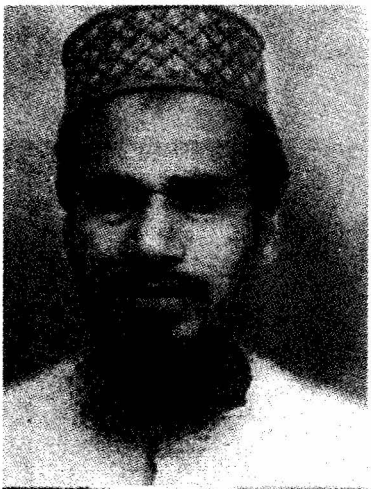

শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন ও তাঁর ছবি

পেয়েছে। তেল রং মাধ্যমে ৩২টি, মার্বেল ১টি। এক্রেলিক মাধ্যমে ১১টি, পানিরং মাধ্যমে ৩০টি, কালি-কলম মাধ্যমে ১টি, কাঠখোদাই মাধ্যমে ৪টি, পোষ্টার রং-এ ৩টি, মিশ্র মাধ্যমে ৫টি, পেন্সিল স্কেচ ১টি, মেহেদী পাতার রস দিয়ে ২টি এবং সিরামিক মাধ্যমে ২টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে ৫টি বাংলা হরফ এবং বাকী ৮৭টি আরবী হরফ দিয়ে ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে।

আরবী ক্যালিগ্রাফির শিল্পকর্ম সমূহে, কুফি, ছুলুছ, নাশখ, তুগরাসহ নঁতুন কিছু ধারা তৈরীর প্রয়াস লক্ষণীয়। এবারের প্রদর্শনীতে

www.pathagar.com

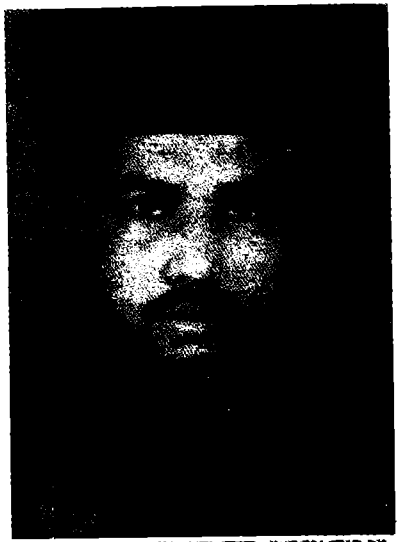

শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ বারী ও তাঁর ছবি

বিশেষভাবে যে দিকটি লক্ষণীয় তা হচ্ছে, ধারা সমূহের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রয়াস ও ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং। এছাড়া ভাস্কর্য, সিরামিক, কাঠখোদাই দিয়ে নতুন মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফির পথচলা এবার শুরু হল। বিশেষ করে সিরামিক পটারীতে রিলিফ ক্যালিগ্রাফি এদেশে এই প্রথম। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে যেমন মার্বেল, গ্রানাইট প্রভৃতি পাথরে ক্যালিগ্রাফি করা হত। এবারের ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে বেলে মার্বেল পাথর খোদাই করে বিসমিল্লাহ-এর তুগরা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শন করা হয়।

শিল্পী মুর্তজা বশীর বাংলাদেশের শিল্পকলায় একটি জ্বলজ্বলে তারকার নাম। তার পরিচয় এদেশের শিল্পরসিক সবাই জানেন। তিনি ৮০ দশকের গোড়ার দিকে ক্যালিগ্রাফি করে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। এবারের প্রদর্শনীতে তার ৩টি ক্যালিগ্রাফির বিষয় ও রং ব্যবহারের অভিনবত্ব শিল্পবোদ্ধাদের ভাবিয়ে তুলেছে। পবিত্র কুরআনের রহস্যময় আয়াত, আলিফ-লাম-মিম-ত্বহা, আলিফ-লাম-রা প্রভৃতি নিয়ে আমাদের দেশে কোন ক্যালিগ্রাফি হয়নি, সুতরাং বিষয়ের দিক দিয়ে এটির বিশেষত্ব অনস্বীকার্য। আমরা জানি, লাল রংয়ের পাশে সবুজ রং দৃষ্টি বিভ্রম ঘটায়, কিন্তু মুর্তজা বশীর আশ্চর্য দক্ষতায় এখানে রংয়ের ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই ক্যালিগ্রাফিতে সবুজ-লালের খেলা আমাদের দৃষ্টিকে রহস্যময় আবর্তে নিয়ে যায়, কিন্তু দৃষ্টি বিভ্রমে আটকে যায় না। শিল্পী

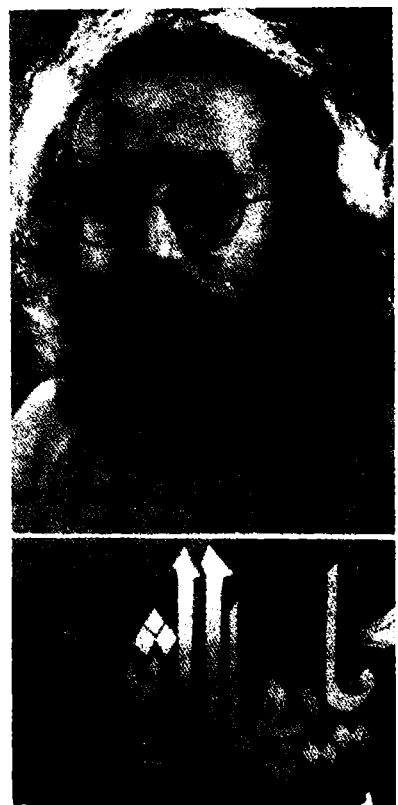

শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ ও তাঁর ছবি

www.pathagar.com

শিল্পী আবদুল আজীজ ও তাঁর ছবি

আবু তাহের প্রথিতযশা প্রবীণ শিল্পী। তার পরিচয় এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পী হিসেবে। ইতিপূর্বে আরবী হরফের অপূর্ব কম্পোজিশনে করা একটি শিল্পকর্ম আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করেছে। এবার তাঁর ২টি ক্যালিগ্রাফিই বিমূর্ত ঢংয়ে করা। তেল রং-এ করা এ দুটি শিল্পকর্ম ক্যালিগ্রাফির অগ্রযাত্রাকে বেগবান করেছে। শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী সাবেক চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক, তিনি এ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মে কাজ করেন। প্রথম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তার শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। এবার ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তেল রং-এ করা তিনটি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়েছে। এগুলোতে আল্লাহর গুণবাচক নাম রং ও রেখায় চমৎকার ফুটে উঠেছে। শিল্পী ড. আবদুস সাত্তার চারুকলা ইনস্টিটিউটের বর্তমান পরিচালক। তিনি বাংলা হরফ ব্যবহার করে এ্যাক্রিলিক মাধ্যমে ৪টি শিল্পকর্ম দিয়েছেন এ প্রদর্শনীতে। তার ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম একাধারে ক্যালিগ্রাফি ও ছবি। তার শিল্পকর্ম আমাদের যেমন আনন্দ দান করে, সাথে সাথে তেমনি ভাবিয়েও তোলে। শিল্পী সবিহ উল আলম ক্যালিগ্রাফির শিল্পী পরিচয়ের পূর্বে এ বিষয়ে শিশুতোষ দুইটি অসাধারণ বইয়ের লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত। 'লেখা থেকে রেখা' এবং 'কারুকাজে যাদুকর' বই দুটি ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ও ইসলামিক ডিজাইনের ওপর তথ্য সমৃদ্ধ বই। লেখক সত্ত্বার পাশাপাশি এবার তার ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম সবাইকে আকর্ষণ করেছে। কালি-কলম মাধ্যমে দ্বিমাত্রার এ ক্যালিগ্রাফিটি দৃষ্টি বিভ্রমের মাধ্যমে সহজেই ত্রিমাত্রার অবলোকনের স্বাদ

শিল্পী আমিরুল হক ও তাঁর ছবি

www.pathagar.com

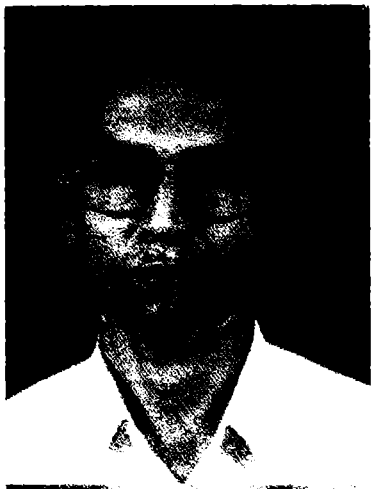

আমাদের চোখকে দিয়েছে। এখানেই শিল্পীর বিশেষত্ব। এটি নি:সন্দেহে একটি মৌলিক কাজ, যা আমাদের ক্যালিগ্রাফির অগ্রযত্রাকে রসদ জোগাবে। শিল্পী অধ্যাপক মীর মোহাম্মদ রেজাউল করীমের বিস্‌মিল্লাহ ১,২,৩ আমাদেরকে ভিন্নমাত্রার আনন্দ দিয়েছে। পানিরং মাধ্যমে করা এ শিল্পকর্মত্রয় দর্শকদের বিমোহিত করেছে। ভাস্কর শিল্পী রাসা বাংলা হরফের সাহায্যে অসাধারণ ক্যালিগ্রাফি করেছেন। শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল দীর্ঘদিন ক্যালিগ্রাফি শিল্পের সাথে জড়িত। তার ক্যালিগ্রাফির প্রতি ভালবাসা তার অসংখ্য

শিল্পী মনিরুজ্জামান ও তাঁর ছবি

ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মের মাধ্যমে দেখতে পাই। তিনি ২০০১ সালে ইরানের আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিংয়ে তিনি একটি নতুন ধারা তৈরীর প্রয়াস চালাচ্ছেন। তার শিল্পকর্মে রং ও হরফের ছন্দময় মিলিত রূপ দর্শকদের বিমোহিত করে। শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান তেলরংয়ের ক্যালিগ্রাফিতে প্রকৃতির রং রূপের সাথে আরবী হরফের নিরবিচ্ছিন্ন সমাবেশ

শিল্পী মোঃ মনির হোসাইন ও তাঁর ছবি

www.pathagar.com

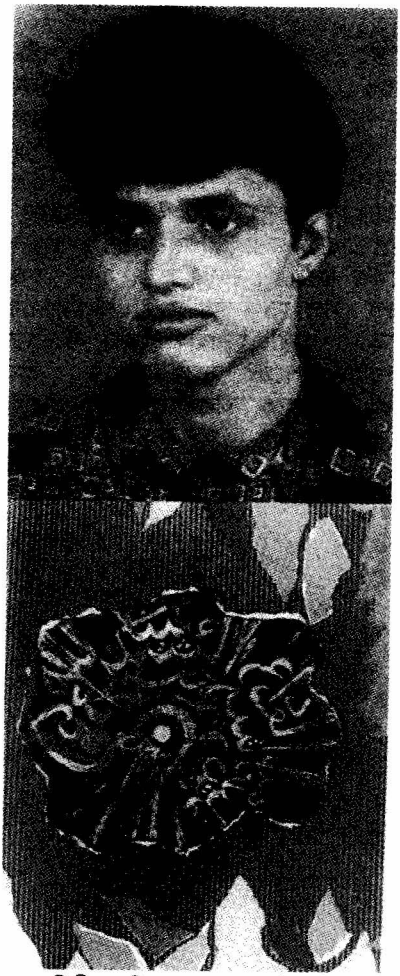

শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার ও তাঁর ছবি

ঘটিয়েছেন, যা প্রকৃতির প্রতি ভালবাসায় পবিত্র ভাব জাগিয়ে তোলে। তার পাথরে বিস্‌মিল্লাহ ক্যালিগ্রাফিটি স্বাধীন সুলতানদের তুঘরার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। মো: আমিনুল ইসলাম আমীনের ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম আমাদেরকে স্রষ্টার প্রতি বিনত করে। তিনি আরবী হরফের মাধ্যমে পবিত্র কুরানের বাণীকে বিমূর্ত দৃশ্যের সাথে সমন্বয় ঘটিয়েছেন। অসম্ভব ধৈর্য ও পরিশ্রম নিয়ে তিনি এসকল শিল্পকর্ম করেছেন, যা তার শিল্পকর্মের

শিল্পী আবদুর রহীম ও তাঁর ছবি

নিপুনতা ও সুক্ষ্মতা দেখে বোঝা যায়। তার এ চিত্রময় ক্যালিগ্রাফি আমাদের দেশে ক্যালিগ্রাফির উত্থানে সহায়ক হয়েছে এ কথা বলা যায়। শিল্পী মনিরুজ্জামান ক্যালিগ্রাফির শৈলী-নির্ভর ধারায় ক্যালিগ্রাফি করেছেন। পানি রংয়ের শিল্পীত ব্যবহার দর্শককে মুগ্ধ করেছে। শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ বারী একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ক্যালিগ্রাফির ওপর একাডেমিক সনদপ্রাপ্ত,

www.pathagar.com

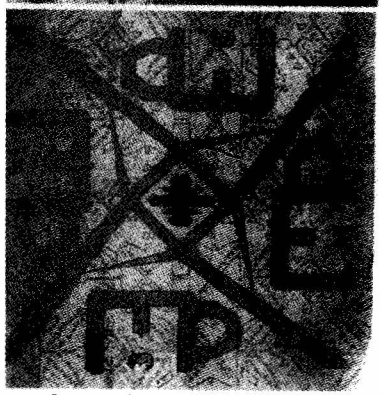

শিল্পী ফেরদৌস আরা আহমেদ ও তাঁর ছবি

এ জন্য তার ক্যালিগ্রাফিতে কলমের ছন্দময় গতি হরফের প্রকাশকে যেন জীবন্ত করে তোলে। তার শৈলী নির্ভর এবারের ক্যালিগ্রাফিগুলো এক কথায় অসাধারণ। তিনি সুলুস, নাশখ, দিওয়ানী, রুকআহ প্রভৃতি শৈলীতে নিপুনতার স্বাক্ষর রেখেছেন। শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মে আরবী হরফের সাথে বাংলা হরফ এবং বিষয়বস্তু ব্যাকগ্রাউন্ড সারফেসে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তেলরং-এ করা তার শিল্পকর্ম ক্যালিগ্রাফিতে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এম. এ আজিজ পানি রংয়ে দুটি ক্যালিগ্রাফি করেছেন। যাতে রংয়ের ব্যবহারে দক্ষতার ছাপ পাওয়া যায়। আমিরুল হক ইমরুল বিশাল ক্যানভাসে আল্লাহ এঁকেছেন।

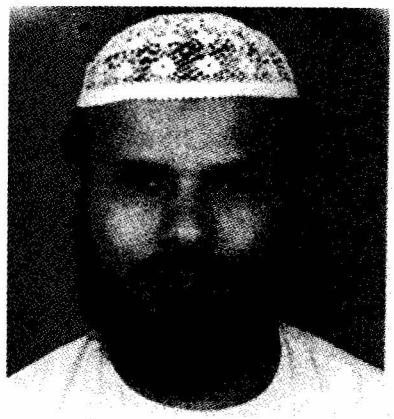

আল্লাহর মহত্বকে প্রকাশ করার এ প্রচেষ্টা আমাদেরকে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিনয়াবনত করে। শিল্পী মুহাম্মদ আবদুর রহীম দীর্ঘদিন ধরে ক্যালিগ্রাফির চর্চা ও এ বিষয়ের ওপর ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে লেখালেখি করে আসছেন। তারা ক্যালিগ্রাফির শিল্পকর্মে শৈলির ভাঙা-গড়া এবং ঐতিহ্যিক সোনালী রূপালী রং ব্যবহারের বিষয়টি দেখা যায়। তার সিরামিক পটারীতে ক্যালিগ্রাফি এদেশে প্রথম প্রয়াস। শিল্পী মনোয়ার হোসেন তুঘরা নির্ভর ক্যালিগ্রাফি করে থাকেন। এবারের ক্যালিগ্রাফিগুলোও তার ব্যতিক্রম নয়।

শিল্পী মোঃ শহীদুল্লাহ ও তাঁর ছবি

www.pathagar.com

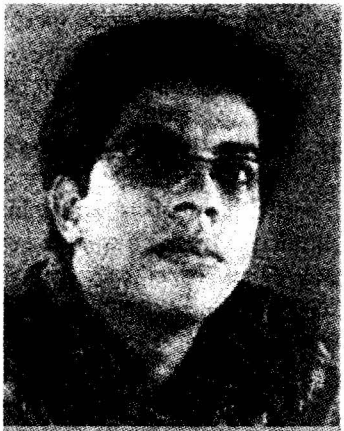

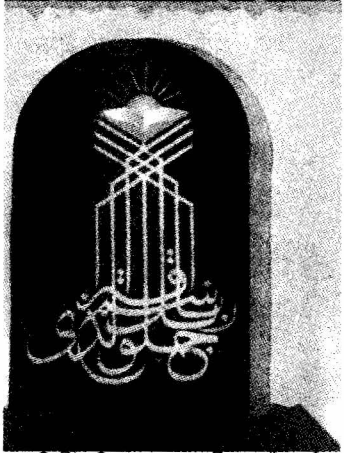

শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী ও তাঁর ছবি

শিল্পী ফেরদৌস আরা আহমেদ এই প্রদর্শনীর একমাত্র মহিলা শিল্পী। মেহেদী পাতার রসে করা তার ক্যালিগ্রাফি এক কথায় অসাধারণ। এ ক্যালিগ্রাফি দুটিতে তিনি দেশীয় জামদানী ও ফুল-লতার নকশা এঁকেছেন, যা আমাদের দেশের মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেবে এবং ক্যালিগ্রাফির উত্থানে অবদান রাখবে। শিল্পী মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ক্যালিগ্রাফি ধর্মীয় বোধকে শানিত করে। শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার নিজস্ব ধারা উদ্ভাবনে প্রয়াস চালাচ্ছেন, এবারের ক্যালিগ্রাফিসমূহ সেই ধারণাকে আরো দৃঢ় করে। শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালীর কাজ পরিচ্ছন্ন ও সুচিন্তিত। তার মধ্যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে এটা বোঝা যায়। শিল্পী হা-মীম কেফায়েতুল্লাহর ক্যালিগ্রাফিতে রং ও হরফের সমন্বিত ব্যবহার দর্শককে মুগ্ধ করে। তার কাজে সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। আবু দারদা মো: নাঈমের শৈলী ও কম্পোজিশন বেশ ভাল। তার মাঝেও প্রবল সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। তার ক্যালিগ্রাফি আমাদের দেশের ক্যালিগ্রাফির চলমান ধারাকে পরিপুষ্ট করবে একথা বলা যায়। মাসুম বিল্লাহ নবীন শিল্পীদের অন্যতম। তার কাজে

শিল্পী হামীম কেফায়েতুল্লাহ ও তাঁর ছবি

www.pathagar.com

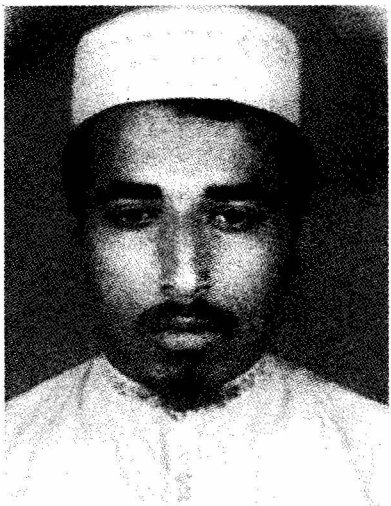

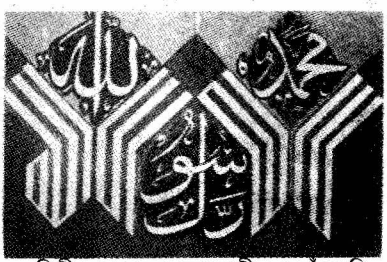

শিল্পী আবু দারদা মোঃ নায়ীম ও তাঁর ছবি

মেধার ছাপ রয়েছে, ভবিষ্যতে এ দেশের ক্যালিগ্রাফিতে তার অবস্থান উজ্জল হবে, এ আশা করা যায়, যদি তার এ প্রয়াস অব্যাহত থাকে।

এবারের ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এদেশের এযাবত কালের সবচেয়ে বড় ও বৈচিত্রময় শিল্প সম্ভারে সমৃদ্ধ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। দেশের প্রথিতযশা প্রধান শিল্পীর সাথে নবীন শিল্পীদের অংশগ্রহণ এবং তাদের বিপুল সংখ্যক শিল্পকর্মের সমাহার একথাই প্রমাণ করে, এদেশে ক্যালিগ্রাফির এক জোরদার উত্থান ঘটেছে। যা গত কয়েক বছর ধরে নিয়মিত প্রদর্শনীকে আলোকিত করেছে। এই প্রদর্শনী বিপুল সংখ্যক দর্শক ও শিল্পবোদ্ধাদের আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলেছে। ইসলামী সংস্কৃতির এই

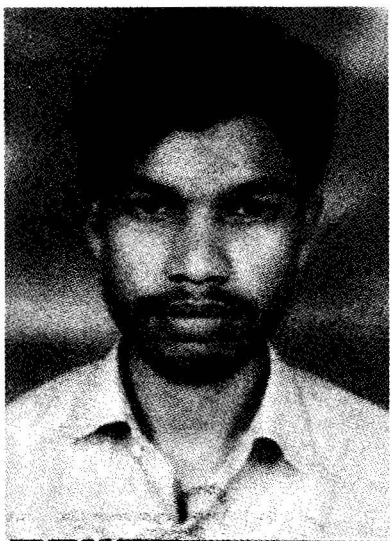

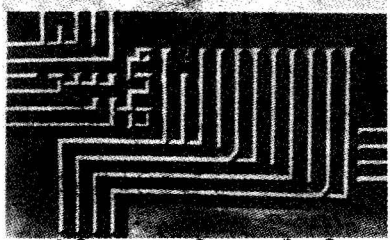

শিল্পী মোঃ মাসুম বিল্লাহ ও তাঁর ছবি

উপাদানকে লালন, চর্চা ও সুদূরপ্রসারী করতে একাডেমিক শিক্ষার প্রয়োজন, যা এখনই শুরু হওয়া দরকার। ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা, শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করা, সর্বোপরি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা খুবই প্রয়োজন। ক্যালিগ্রাফি শুধু সৌন্দর্য চর্চার কথা বলে না, এর সাথে সত্য উপলব্ধি, নীতিবোধের চর্চাসহ সুস্থ একটি সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে দেয়। আর স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির যে সম্পর্ক, তাও অনুভব করা যায়। সুতরাং ক্যালিগ্রাফির এই উত্থানকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, এর ক্রমোন্নতিতে সবার সক্রিয় সহায়তা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের
সার্বিক কার্যক্রমের সফলতা
কামনা করছি।

কৃষিবিপ্লব

পাক্ষিক কৃষি বিপ্লব

২৭৯, পূর্ব হাজীপাড়া, ঢাকা-১২১৯

ফোন ঃ ৯৩৪২১৬২, e-mail : mahin@bttb.net

www.pathagar.com

প্রীতির বই প্রীতিময় সবার মন করলো জয়# নিজে পড়ুন উপহার দিন জীবন হবে স্বপ্ন-রঙিন

কোরআন / হাদীস / ইসলাম বিষয়ক

ড: মরিস বুকাইলির বাইবেল কোরআন বিজ্ঞান ১২০/-আবদুল করীম পারেখের লোগাতুল কোরআন ২০০/- আসাদ বিন হাফিজের আল কোরআনের বিষয় অভিধান ১৩৫/- ইসলামী সংস্কৃতি ৫০/- এ.এস.এম শাহ্ আলমের বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষাপদ্ধতি ৫/- মাও: ইউসুফ ইসলাহীর তাফহীমুল হাদীস ৪৫/- এ.এন.এম সিরাজুল ইসলামের রমজানের তিরিশ শিক্ষা ১০০/-

বিশ্ব সাহিত্যের সেরা উপন্যাস

নসীম হিজাযীর সীমান্ত ঈগল ১৫০/- হেজাযের কাফেলা ১৬০/- আঁধার রাতের মুসাফির ১০০/- কায়সার ও কিসরা ১৬০/- শেষ বিকালের কান্না ১০০/- কিং সায়মনের রাজত্ব ১০০/- ইউসুফ বিন তাশপীন ১৫০/- ভগবান এস গিদওয়ানীর দি সোর্ড অব টিপু সুলতান ৭০/-

গল্প-উপন্যাস সাহিত্য / গবেষণা / ভ্রমণ

আল মাহমুদের মরু মুষিকের উপত্যকা ১১০/-, কবিতার জন্য সাত সমুদ্র ৪০/- নারী নিগ্রহ ৬০/-, রাজিয়া মজিদের যুদ্ধ ও ভালবাসা ১৫০/- শাহাবুদ্দীন আহমদের লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায়নাক নুড়ি ৬০/- নসীম হিজাযীর ইরান তুরান কাবার পথে ৩০/- আতা সরকারের তিতুর লেঠেল ৩০/- আপন লড়াই ৫০/- সুন্দর তুমি পবিত্রতম ৪০/- আসাদ বিন হাফিজের পনরই আগস্টের গল্প ৩০/-, ছন্দের আসর ৫০/- নাম তাঁর ফররুখ ৫৪/- ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ৬০/-, হাসান আলীমের সোনার খাঁচা ৩০/- কাব্যচিন্তা ৫০/-

শিশু কিশোর সাহিত্য

আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিনের গাছগাছালি পাখপাখালি ২৫/- চিং পাহাড়ের হাতি ৩০/- অপারেশন স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার ৩০/- জাবেদ হুসেইনের মহেশখালীর খুনী জ্বীন ৪০/- ফারজানা মাহবুবার পলাতক জীবন ৪০/- নূরুল আলম রইসী SWEET RHYMES ২০/- সরদার জয়নুল আবেদীনের মিথ্যাবাদীর প্রতিজ্ঞা ২৫/- আসাদ বিন হাফিজের ইয়াগো মিয়াগো ২০/- হরফ নিয়ে ছড়া ২০/- আলোর হাসি ফুলের গান ৩০/- নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন ২০/- কুক কুরু কু ৩০/- কারবালা কাহিনী ৩০/- আল্লাহ মহান ২০/- আলোর পথে এসো ৩০/-

জনপ্রিয় রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

আসাদ বিন হাফিজের গাজী সালাহউদ্দীনের দু"সাহসিক অভিযান ৩০/- সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমান্ডো অভিযান ৩০/- সুবাক দূর্গে আক্রমণ ৩০/- ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ৩০/- ভয়াল রজনী ৩০/- আবারো সংঘাত ৩০/- দূর্গ পতন ৩০/- ফেরাউনের গুপ্তধন ৩০/- উপকূলে সংঘর্ষ ৩০/-

ইসলামী গান, কাব্য সমগ্র, কাব্য ও ছড়া গ্রন্থ

কবি গোলাম মোস্তফার গীতি সঞ্চয়ন ৮০/- কাব্য সমগ্র ৪০০/- তালিম হোসেনের কবিতা সমগ্র ৩০০/- সাবির আহমেদ চৌধুরীর শত হামদ শত নাত ২০০/- ইসলামী উপলক্ষের গান ১০০/- আসাদ বিন হাফিজ সম্পাদিত নির্বাচিত হামদ ১৫০/- নির্বাচিত না'ত ১৫০/- নির্বাচিত ইসলামী গান ৫০/- নির্বাচিত ইসলামী গান-(১ থেকে ৪ খণ্ড, প্রতি খণ্ড ৫০/-) আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত রাসূলের শানে কবিতা ২০০/- হাসান আলীমের ডানাঅলা অট্টালিকা ৪০/- নূরুল মোস্তফা রইসীর সুন্দর উজানে কাঁদে ৫০/- মালেক ইমতিয়াজের বৃষ্টি পড়ে সৃষ্টি নড়ে ৩০/- আসাদ বিন হাফিজের কি দেখো দাঁড়িয়ে একা সুহাসিনী ভোর ৩০/- অনিবার্য বিপ্লবের ইশতেহার ৩০/-

প্রীতি প্রকাশন ৪৩৫/ক বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩১৯৫৪০, ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৩১৯৫৪০

www.pathagar.com

লেখক অভিধানের জন্য তথ্য আহবান

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র বাংলাদেশের লেখকদের পরিচিতিসহ একটি লেখক অভিধান প্রকাশ করতে যাচ্ছে। একটি সমৃদ্ধ বোর্ড এ অভিধান সম্পাদনা করবেন। সম্মানিত লেখক হিসেবে এ অভিধানে আপনার অন্তর্ভুক্তি আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি। এ জন্য নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ যথাসময়ে সরবরাহ করার জন্য আপনার সমীপে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

১. লেখক নাম : .....
২. প্রকৃত নাম : .....
৩. পিতার নাম : .....
৪. মাতার নাম : .....
৫. বৈবাহিক অবস্থা : .....
৬. স্বামী / স্ত্রীর নাম : .....
৭. সন্তান-সন্ততি : .....
৮. জন্ম তারিখ : .....
৯. জন্মস্থান (পুরো ঠিকানা) : .....
১০. পৈত্রিক নিবাস (পুরো ঠিকানা) : .....
১১. স্থায়ী ঠিকানা : .....
১২. বর্তমান ঠিকানা ও ফোন নম্বর (যদি থাকে) : .....
১৩. কর্মস্থলের ঠিকানা ও ফোন নম্বর (যদি থাকে) : .....
১৪. শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ : .....
১৫. প্রথম প্রকাশিত লেখা (কোথায় এবং কি?) : .....
১৬. প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকা, প্রকাশকালসহ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করুণ) : ..
১৭. সম্মাননা ও পুরস্কার (পেয়ে থাকলে প্রাপ্তিকালসহ) : .....
১৮. বিবিধ (যদি কিছু থাকে) : .....

প্রকাশিত সকল বইয়ের একটি করে কপি (যদি এবং যতটুকু সম্ভব হয়) এবং সত্যায়িত ছবি জমা দিতে হবে। জমাকৃত বই কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করা হবে।

বি. দ্র. যাদের অন্ততপক্ষে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের জন্য এ ঘোষণা প্রযোজ্য।

ছবি, বই ও তথ্য পাঠাবার ঠিকানা

নাসির হেলাল, অফিস সম্পাদক

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

১৭১, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩১৯৫৪০, ৮৩২১৭৫৮, ৯৫৫১৯০২, ৯৩৪২২১৫ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৩১৯৫৪০

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

বাংলাদেশে শরীয়াহ্ ভিত্তিক প্রথম ইসলামী জীবন বীমা (তাকাফুল)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

সুদমুক্ত হালাল বীমা ব্যবস্থা

■

লাভ ও লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত

■

পরস্পরের মধ্যে দায়িত্বের অংশীদারিত্ব

■

সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণমুখী ব্যবস্থা

■

পারস্পরিক সংহতি ও সহযোগিতা

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার

হেড অফিস ঃ রূপালী বীমা ভবন, ৭ রাজউক এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৫৬৯২১৩, ৯৫৬৭৪৪১, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৭৭৩০

www.pathagar.com

সীরাত বিষয়ক প্রকাশনায় আমরা সবার শীর্ষে

আমাদের প্রকাশিত সীরাত গ্রন্থসমূহ

সীরাতুন্নবী (সাঃ)
আল্লামা শিবলী নোমানী ও সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর অমর শ্রেষ্ঠ এক সীরাত গ্রন্থ
অনুবাদ ও সম্পাদনা : মুহিউদ্দীন খান
মূল্য : ১৮০ টাকা

প্রিয় নবীজীর অন্তরঙ্গ জীবন
অনুবাদ ও সম্পাদনা : মুহিউদ্দীন খান
ইমাম মুহাম্মদ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) সংকলিত শামায়েলে তিরমিযী ও শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্দলভীর ব্যাখ্যা অবলম্বনে লিখিত
মূল্য : ৯০ টাকা

ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম (সাঃ)
মূল : ডাঃ মুহাম্মদ আবদুল হাই (রহঃ)
অনুবাদ : মুহিউদ্দীন খান ও মুহম্মদ আবদুল আজীজ
নবীজীবনের সুন্নতসমূহ ও আমলের পুংখানুপুংখ বর্ণনার এক শ্রেষ্ঠ সংকলন
মূল্য : (অফসেট কাগজে) ১২০ টাকা

স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহ (সাঃ)
মুহিউদ্দীন খান
রসূল (সাঃ)-এর রূপ শয়তান গ্রহণ করতে পারে না, তাই তাঁকে যিনি স্বপ্নে দেখেন তিনিই প্রকৃত নবী (সাঃ) কে দেখে থাকেন। এমনি অনেকগুলো স্বপ্নের বিস্ময়কর কাহিনী
মূল্য : ৭০ টাকা

সীরাত এলবাম
আহমদ বদরুদ্দীন খান
মক্কার প্রাচীন ইতিহাস, জমজমের পানির উৎস, নবী (সাঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও বস্তুসমূহের দুর্লভ ও আকর্ষণীয় চিত্রের একত্র সমাবেশ
মূল্য : ১৫০ টাকা

প্রিয় নবীজীর প্রিয় প্রসঙ্গ
চৌদ্দশ বছর ধরে যাকিছু সীরাত রচিত হয়েছে তার সবগুলো থেকে বাছাই করে নবীজীর জীবনের ঘটনাবলি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়েছে এক অনবদ্য ও সর্বাঙ্গসুন্দর সীরাত গ্রন্থ
মূল্য : ৯৫ টাকা

সীরাতে খাতামুন্নাবীঈন
মোহাম্মদ আফতাব উদ্দীন
রসূলে খোদা (সাঃ)-এর এক অনবদ্য জীবনীগ্রন্থ
মূল্য : ১৫০ টাকা

রওজা শরীফের ইতিকথা
মুহিউদ্দীন খান
রসূলে খোদা (সাঃ)-এর ইন্তেকাল, মসজিদে নববীর নির্মাণ, রওজায়ে আতহার, রওজা শরীফ ও পাক মদীনা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তথ্যের সমাহার
মূল্য : ৩৬ টাকা

হৃদয়তীর্থ মদীনার পথে
মূল : শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ)
অনুবাদ : মুহিউদ্দীন খান
প্রিয় নবীজীর (সাঃ) যাবতীয় পবিত্র মদীনা মোনাওয়ারা সম্পর্কিত অনবদ্য রচনা
মূল্য : ৭০ টাকা

সীরাতে রসূলে আকরাম (সাঃ)
মূল : মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)
অনুবাদ : মুহিউদ্দীন খান
সীরাত বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ সমন্বয়ে রচিত এক অনবদ্য গ্রন্থ
মূল্য : ৯৫ টাকা

বিশ্বনবী বিশ্বনেতা
মোহাম্মদ কবিতা সুলতানা
দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ১৭টি প্রবন্ধের এক অনবদ্য সংকলন
মূল্য : ৭৫ টাকা

হাদীসে রসূল (সাঃ)
মুহিউদ্দীন খান অনূদিত
মুসলিম শরীফ এবং সেহাহ সিত্তার কিতাবসহ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহের হাদীস অনবদ্য বর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছে
মূল্য : ৭০ টাকা

শাওয়াহেদুন নবুয়ত
মূল : আল্লামা আবদুর রহমান জামী
অনুবাদ : মুহিউদ্দীন খান
নবী (সাঃ)-এর নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে এ বইটিতে।
মূল্য : ১১০ টাকা

পরধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (সাঃ)
মোঃ আবুল কাশেম ভূঞা
বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মূল্যায়নে মহানবী (সাঃ) প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে গ্রন্থটিতে
মূল্য : ৬৫ টাকা

খাসায়েসুল কুবরা ১ম খণ্ড
মূলঃ জালালুদ্দীন সিয়ূতী/অনুঃ মুহিউদ্দীন খান
মূল্য : ১৪৫ টাকা

খাসায়েসুল কুবরা ২য় খণ্ড
মূল্য : ১১০ টাকা

আমাদের গ্রন্থগুলো আপনি সরাসরি আমাদের কাউন্টার থেকে ২০% কমিশনে এবং ডাকযোগে ২০% কমিশনে সংগ্রহ করতে পারেন। নির্দিষ্ট খরচ আমরা বহন করব।

মদীনা পাবলিকেশন্স

প্রধান অফিস : ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন-৭১১৪৫৭৭, শাখা অফিস : ৫৫ বি পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা। ফোন : ৭১১০৪৬০

www.pathagar.com

Islamic International School & College

(Play group to 'O'level)

A Home of Excellence

We are committed to provide you with

- Quality Education.
- Computer Literacy
- Moral Teaching
- Ethical Knowledge
- After Schooling Program
- Dedicated Teaching Stuff

If You Think about Quality Then We are ready to take you there

Principal
Shamsun Nahar Nizami

www.pathagar.com

বই কিনুন বই পড়ুন
প্রিয়জনকে ইসলামী বই উপহার দিন

বিশ্ববরেণ্য তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন',
সহীহ আল-বুখারী, মাসয়ালা-মাসায়েল,
ইসলামী সাহিত্যরাজি, জীবনী গ্রন্থ,
ঐতিহাসিক উপন্যাস ও আরো অসংখ্য গ্রন্থের
প্রকাশক, বিক্রেতা ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

আধুনিক প্রকাশনী

আপনার ব্যক্তিগত পাঠাগার, লাইব্রেরী ও বুকস্টলের জন্য আমাদের বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে আসুন (ভি.পি. এবং ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমেও বই পাঠানো হয়)।

আধুনিক প্রকাশনী

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৭১১৫১৯১

বিক্রয়কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ ওয়ারলেস রেলগেইট
বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ বই বিপনী
বায়তুল মোকাররম
ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংক
আন্তরিকতাপূর্ণ দক্ষ সেবায় নিয়োজিত

এক নজরে বিভিন্নমুখী সেবা ও কর্মসূচী

- প্রতি শাখায় কম্পিউটারসহ সুইফট, ই-মেইল প্রভৃতি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ সেবার নিশ্চয়তা প্রদান।
- ব্যাংকিং খাতে সর্বপ্রথম ওয়েব সাইট চালু করে ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যাবলী অবহিতকরণ।
- প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক ডিভিশনে ডিলিং রুম (Dealing Room) ও রয়টার সার্ভিস চালু করে দ্রুত আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন।
- বিশ্বব্যাপী ৭৭৫টি বিদেশী ব্যাংক ও করেসপন্ডেন্ট-এর মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনায় স্থানীয় ব্যাংকসমূহের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান।
- দৈনন্দিন ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে নিজস্ব কম্পিউটার সফটওয়্যার আইবিবিএস (IBBS) ব্যবহার।
- নির্বাচিত শাখাসমূহে এটিএম (ATM) সুবিধা চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বিভিন্ন শাখায় লকার সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে।
- আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব এবং মুদারাবা ভিত্তিক সঞ্চয়ী ও বিভিন্ন মেয়াদী হিসাব ছাড়াও অধিকতর মুনাফা ভিত্তিক মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব (হজ্জ পালনে ইচ্ছুকদের সঞ্চয় গড়ে তোলার জন্যে ১ বছর থেকে ২৫ বছর মেয়াদী), মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) হিসাব (৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদী), মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব (সঞ্চয়) ও মুদারাবা মাসিক মুনাফা সঞ্চয় হিসাব খোলার এবং মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড (৫ বছর ও ৮ বছর মেয়াদী) ক্রয়ের জন্য ব্যবস্থা বিদ্যমান।
- সীমিত আয়ের চাকুরীজীবী ও পেশাজীবীদের গৃহ সামগ্রী ক্রয় ও জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য গৃহ সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প ও কার বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করে এ ক্ষেত্রে ব্যাংকিং জগতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

  ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প, ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প ও মিরপুর সিল্ক উইভারস ইনভেস্টমেন্ট স্কীমের আওতায় সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা।
- আবাসন সমস্যা লাঘবে গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প ও রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম।
- গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আদর্শ গ্রাম গঠনে নিয়োজিত।
- এ ছাড়াও শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি, রিয়েল এস্টেটসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান।

শাখাসমূহকে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের আওতায় এনে রেমিটেন্স প্রক্রিয়া দ্রুততর করা হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকের উন্নত সেবা গ্রহণ করে অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।

কল্যাণমূখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত